মগ্ন চৈতন্যে শিস

সেলিনা হোসেন

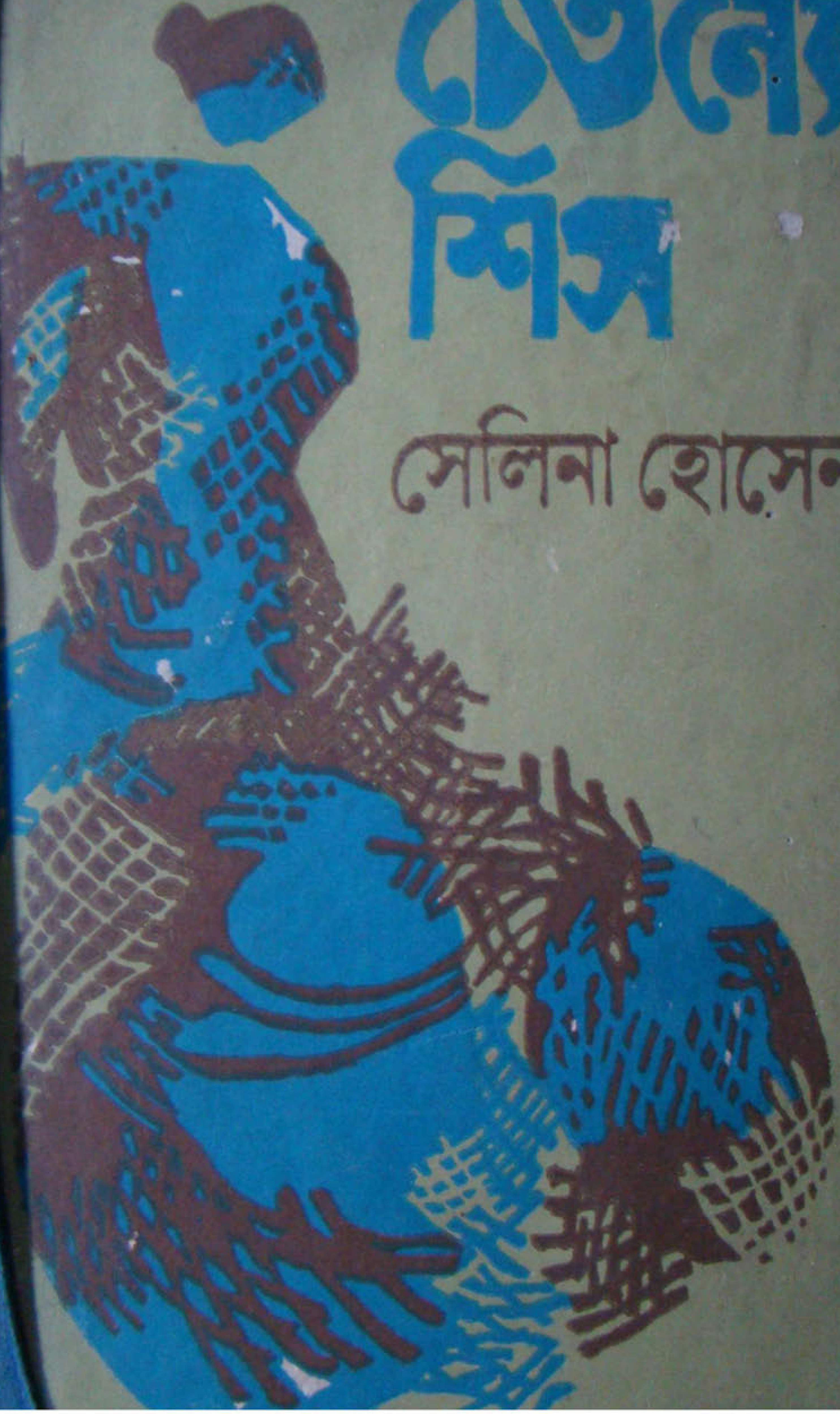

মগ্ন
চৈতন্যে
শিস

মগ্ন চৈতন্যে শিস

সেলিনা হোসেন

১১ মণিপুরী পাড়া ঢাকা ১৫

স্বত্ব ফারিয়া লারা

প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ১৯৭১

প্রচ্ছদ কাজী হাসান হাবিব

প্রকাশক শমিক প্রকাশনী
১৯ মণিপুরী পাড়া
ঢাকা ১৫

মুদ্রণ বাংলা একাডেমী প্রেস

পরিবেশক

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র
৬৭-ক, পুরানা পল্টন
ঢাকা ২

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
১০ পুরানা পল্টন
ঢাকা ২

স্টুডেন্ট ওয়েজ
৯ বাংলাবাজার
ঢাকা ১

মূল্য পঁচিশ টাকা

উৎসর্গ

মোসলেম আলী খান
আলেয়া খান

প্রকাশিত বই

গল্প

উৎস থেকে নিরন্তর
জলবতী মেঘের বাতাস

উপন্যাস

জলোচ্ছ্বাস
জ্যোৎস্নায় সূর্যজ্বালা
হাঙর নদী গ্রেনেড

রচনাকাল

১৬ এপ্রিল ১৯৭৫ থেকে
১লা আগস্ট ১৯৭৭

স্বপ্ন দেখাটা ভারি বাজে ব্যাপার। বিশেষ করে ঘুমের ভেতর। আমার একদম ভাল লাগে না। নিবিড় ঘুমে স্বপ্নটা আমার কাছে সোনাপে পোকা। কোন একটা সুন্দর অবয়বকে ইচ্ছে করে দুমড়ে মুচড়ে ফেলা যেন। অথচ ঘুমের এই আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়াটিকে কিছুতেই এড়ানো যায় না। মাঝে মাঝে স্বপ্নের কথা চিন্তা করলে আমার ঘুম আসতে চায় না। তখন বেশী কষ্ট হয়। এমন কি চমৎকার মধুর স্বপ্নও আমাকে মোহিত করে না। আমি বিরক্ত হই। ঘুম ভাঙলে জিভটা তেতো ঠেকে। বিষাদে ভরে থাকে মন।

ইদানীং কখনো কখনো যে স্বপ্নটা আমি দেখি, তা আমার সমস্ত শরীর হিম করে রাখে। ঘামে জবজবে আমার অনুভূতি নার্সিসাসের মতো একটা নির্দিষ্ট শূন্যে একাগ্র হয়ে যায়। তবুও চেতনার রদবদলে আমি নিজেকে আদিম সমুদ্রের প্রোটপ্লাজমের প্রথম বিন্দুটি বলেই ভাবি। ভাসতে ভাসতে চলেছি অজানার উদ্দেশে। তখনো বাতাসে অক্সিজেন তৈরী হয়নি। সুতরাং বায়ুমণ্ডলের ওজন পদার্থটিও নেই। সে কারণেই সূর্যের আলোর আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির স্বচ্ছন্দ, বিলাসভ্রমণ ছিল স্বাধীন ও অবাধ। এবং তা এক সময় প্রেয়সীর মত ছুঁয়েছিল সমুদ্রের জল। আলট্রা ভায়োলেট রশ্মির প্রেয়সী-স্পর্শে সমুদ্রের জল আর জৈব-পদার্থ মিলে তৈরী হয়েছিল প্রোটোপ্লাজম। সে থেকেই চলছে প্রাণের দুর্দম অভিযান। প্রাণের সে বিন্দু থেকে আমার শুরু। ভাবতে ভাল লাগে, আমার ভেতর চলছে ভাঙাগড়ার খেলা। আদিম পৃথিবীর উন্মুক্ত শরীরে এইমাত্র আমার পদার্পণ। আমার আগে কেউ আর এখানে আসেনি। আমি চিৎকার করে ঘোষণা করলাম যে, আমি এলাম। সমস্ত চরাচর অবাক হয়ে আমাকে দেখল এবং মাথা নোয়ালো। ওরা আমাকে শ্রেষ্ঠ বলে বরণ করল।

অনুভূতির কাঁটাতার ডিঙিয়ে আমি আবার সেই স্বপ্নে এসে দাঁড়াই। কারা যেন আমাকে হাতে-পায়ে শিকল দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। পৃথিবীর শেষ প্রান্তের সুউচ্চ পর্বতচূড়ো তাদের লক্ষ্য। সে পর্বতের পাশ দিয়ে উর্মিল সমুদ্র বয়ে যায়। আমাকে ওরা পাথরের সঙ্গে বেঁধে রেখে চলে আসে। আমার মুখ দিয়ে গোঙানির মতো ধ্বনি বের হয়। আমি অনেক চেষ্টা করেও কোন কথা বলতে পারি না। শান্ত সমুদ্র গর্জে ওঠে। হাজার দৈত্যের মতো ঢেউ এসে ভেঙে পড়ে পর্বতের গায়ে। আর তখনই বিরাট ডানাঅলা ঈগলের শোঁ শোঁ শব্দ পাই। রক্তমাখা ঈগলটা তীক্ষ্ণ বর্শার মতো ছুটে আসছে। আমার কালো নরম হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খুবড়ে খাবার জন্যে। ঈগলটা আমার গায়ের ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভেঙে যায়। অনুভব করি হাত-পা অবশ অবশ লাগছে। নিজের ওপর রাগ হয়। মনে-প্রাণে স্বপ্ন নামক এই ভৌতিক প্রক্রিয়াটি তাড়াবার চেষ্টা করি। চেষ্টা করে ক্লান্ত হই। ক্লান্ত হয়ে ঝুম মেরে বসে থাকি। নতুন করে কোন কিছু ভাবতে চাই না।

জানি না কেন স্বপ্নটা দেখার পর আমি নিজের ঘরের আয়তন মাপি। মনে হয় এই মুহূর্তে এটাই আমার কাজ। অন্যকিছু নয়। যে ঘরটায় থাকি, সে ঘরটা অসম্ভব ছোট। ওপরের ছাদ প্রায় মাথা ছুঁই ছুঁই অবস্থায়। আসলে এটা ঘর নয়। চিলেকোঠা জাতীয় একটা কিছু। সিঁড়ি দিয়ে উঠেই ঘরে ঢুকতে হয়। কোন বারান্দা নেই। তিন দেয়ালে তিনটে জানালা। ফলে ঘরে যতক্ষণ থাকি, ঘুরে-ফিরে আমাকে এই জানালার কাছে এসে দাঁড়াতে হয়। জানালায় দাঁড়িয়ে কলমুখর রাস্তা দেখি, মাঝরাতের রাস্তা দেখি, ভরদুপুরের রাস্তা দেখি। রাস্তা দেখতে আমার ভাল লাগে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাস্তা দেখতে আমার কোন ক্লান্তি নেই। ছুটে চলার সেই ভীষণ গতি আমাকে অনুপ্রাণিত করে। আবার মাঝরাতের রাস্তা আমাকে শান্ত সমাহিত করে। আমি তখন বুকের উত্তাপ উড়িয়ে দেই। উত্তাপটা উড়িয়ে দিলে সুতোর মত হিমপ্রবাহ বয়ে যায়।

কোনদিন মাঝরাতে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেলে আর ঘুম আসে না। তখন উঠে সিগারেট জ্বালাই। আমার এক বিদেশী বন্ধু আমাকে একটা ছোট্ট টেবিল ঘড়ি দিয়েছিল। জার্মানীর ঘড়ি। রাতে ঘুমুবার সময় আমি ওটা উপুড় করে রাখি। কেননা মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যাওয়াটা আমার

অভ্যেস হয়ে উঠেছে। তখন কিছুতেই আমার সময় জানতে ইচ্ছে করে না। রাতে সময় দেখলে আমার মাথাটা কেমন করে। মনে হয় নিজেকে সংকুচিত করে ফেলছি। অনন্ত রহস্যের কাছে আমার নীরব জিজ্ঞাসা অনুচ্চারিত থাক। নির্ঘুম ভাবনায় আমি তখন মিতুলকে আঁকড়ে ধরি। ওর চোখের ভেতর যেন পুরো আকাশটা বাঁধা পড়ে আছে। ঐ দৃষ্টি আমাকে উজ্জীবিত করে। তাই মিতুলকে আমার ভাল লাগে। মিতুলকে আমি ভালবাসি। মনে মনে ঘুমের কাছে মিতুলের ভালবাসার দোহাই দেই। কিন্তু ঘুম আসে না। ঐ স্বপ্নটা আমার সমস্ত অনুভূতি নিষ্ক্রিয় করে রাখে। উত্তেজনা বাড়তে থাকে। ইচ্ছে করে একবার নীচে যাই। ওদের ঘরের দরজা ভেঙে মিতুলকে নিয়ে আসি। ওকে বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকি। চমৎকার প্রশান্তির ঘুম। যেখানে স্বপ্নের জ্বালাতন নেই।

তবে রাতে ঘুম ভেঙে যাবার ফলে একটা জিনিস আমার খুব প্রিয় হয়ে উঠেছে। সেটা হোল রাতের তারাভরা আকাশ। আমার বুকের ভেতর তারাভরা আকাশের স্বপ্ন ভাসে। নীচের রাস্তা যখন নিঝুম থাকে, তখন ঐ আকাশ আমার আপন হয়ে ওঠে। আমি সময়ের হিসেব ভুলে তাকিয়ে থাকি। নিজের অস্তিত্বের কথা ভুলে যাই। মনে হয়, গ্যালিলিও হয়ে দূরবীন হাতে আমি এই জানালায় দাঁড়িয়ে আছি। আমি এখন ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীতে। ঈগলের মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিয়ে আমি গ্যালিলিওর প্রিয় আকাশ দেখছি। বিংশ শতাব্দীর কথা ভুলে যাই। ষোড়শ শতাব্দী আমার আপন হয়ে ওঠে। চোখের সামনে অসংখ্য তারকারাজীর মেলা। ভেনাসের মতো সৌন্দর্যের আলো ছড়ায়। গ্যালিলিওর দৃষ্টিতে ছায়াপথের রহস্য উন্মোচিত। সাধক লোকটার আর কোনদিকে খেয়াল নেই। আস্তে আস্তে পট পরিবর্তন হয়। বৃদ্ধ লোকটি জীবনের শেষপ্রান্তে উপনীত। তার কাছে পোপের সমন এসেছে। রোমে যাবার ক্ষমতা তার নেই। তবু তাকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বৃদ্ধের দেহে তখন অমিত যৌবন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে গ্যালিলিও চিৎকার করছেন, 'সত্যিই যে পৃথিবী সূর্যকে ঘিরেই ঘুরছে।'

তাঁর এই দুঃসাহসের জন্য বিচারকরা তাঁকে ক্ষমা করেননি। বন্দী জীবন কাটাতে হয়েছিল তাঁকে। আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে যে, বাকী জীবনটা কেমন করে কেটেছিল তাঁর। যে লোকটা আজীবনের সাধনায়

সভ্যতার চাকায় গতিদান করেছিলেন, ক্ষমা তাঁর জোটেনি। ধূসর একাকীত্ব হয়েছিল সঙ্গী। তারাভরা আকাশের স্বপ্ন সেই মানুষটাকে ব্যথিত করত শুধু। আমার মনে হয়, আমার বুকের ভেতরও তেমন ব্যথা। আমি ষোড়শ শতাব্দীর ইতালীতে দাঁড়িয়ে সে মানুষটার সঙ্গী হতে চাই। আমি তাঁর বুকের পর্দা খুলে দেখব কেমন করে নিজের সত্যকে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে একরোখা থাকা যায়।

শ্রাবণের বৃষ্টিমুখর আকাশ আমার ভাল লাগে। বিদ্যুৎ চমকিত আকাশও, অবশ্য সবটাই রাতে হওয়া চাই। মেঘের দাপটে বিপর্যস্ত আকাশ আমার দৃষ্টিকে ক্লান্ত করে না। বরং স্নায়ুতে অন্য ধরনের উত্তেজনা দেয়। জানালায় দাঁড়িয়ে হিমেল হাওয়ার স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অনুভূতি বদলে যায়। আমি তখন মিতুলের ভালবাসায় এসে ঠাঁই নেই। একদিন মিতুল আমার বুকে মুখ ঘঁষতে ঘঁষতে বলেছিল, জানো জামী, আমার মনে হয়, আমার জীবনে কি যেন নেই। কোথায় যেন একটা ফাঁকি আছে। আমি ঠিক বুঝতে পারি না। অথচ মাঝে মাঝে সে বোধ আমাকে পাগল করে তোলে।

মিতুল অতি সাধারণ মেয়ে। গায়ের রঙ কালো। চক্‌চকে আঁধারের ভেলভেটের মতো। দৃষ্টি পিছলে যায়। ফিগার সুন্দর। চোখে যাদু আছে। নিজেকে ঘঁষে-মেজে উজ্জ্বল করে তোলার কোন প্রয়াস নেই। গত বছর বি, এ, পাস করেছে। বিদেশী এক সাহায্য সংস্থায় ছোট্ট একটা চাকরি করে। মা মারা যাবার পর আমি পুরো বাড়ির মালিক হয়ে গেলে ওপরের এই ছোট্ট চিলেকোঠায় এসে নীচতলা ভাড়া দিয়ে দেই। মিতুলের বাবা আলী আহমদকে নিয়ে এসেছিল আমার বন্ধু রায়হান। মিতুলদের সঙ্গে ওর পরিচয় ছোটবেলা থেকেই। ওর কাছেই শুনেছিলাম মিতুলের দু'বছর বয়সে ওর মা আর একজনের সঙ্গে চলে যায়। মিতুল অনেক পরে জেনেছিল কথাটা। ওর বাবা আবার বিয়ে করেছে। নতুন মা-র সঙ্গে মিতুলের ভাল সমঝোতা আছে। তবুও পারিপার্শ্বিকের নানা কারণে মিতুল বিষণ্ণ হয়ে যায়। বুকে কষ্ট থাকে। চোখ ছলছল করে। মেঘলা মেদুর বাউল-হাওয়া দু'চোখ জুড়ে।

বাবাকে মিতুল সহ্য করতে পারে না। সব সময় এড়িয়ে চলে। যেটুকু কথা না বললে নয়, সেটুকু কেবল বলে। বাবা-র প্রতি ওর বড় অভিযোগ

যে, বাবা ওকে মা-র মতো ভালবাসতে চায়। বাবা-র মতো নয়। মিতুল একদিন বিষয় হয়ে বলেছিলো, জানো জামী, ছেলেরা যখন মেয়েলী ভালবাসায় বিশ্বাসী হয়, সেটা আমার কাছে অসহ্য লাগে। জঘন্য ব্যাপার।

ঘৃণায় মুখটা কুঁচকে, ভুরু জোড়া কপালে উঠিয়েছিল ও। আসলে মিতুল টের পেয়েছিল ওর প্রতি বাবা-র একটা গোপন দুর্বলতা আছে। সেটা দু'বছর বয়সে মা কর্তৃক প্রতারিত হবার কারণেই। অন্য কোন কারণে নয়। মা-র অভাবটা বাবা মা হয়ে পুষিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তাতে নাকি মিতুলের হাসি পায়। হাসতে হাসতে বলে, তুমি বল জামী, দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে? নাকি ময়ূরপুচ্ছ পরলেই কাক ময়ূর হতে পারে? আহা বাবাকে যদি বাবা-র মতো পেতাম কি ক্ষতি হোত জামী? তাহলে আমি হয়তো অনেক কষ্টের হাত থেকে বাঁচতে পারতাম। কষ্টটা দস্যি মেয়ের মতো কেবলই বুকের ভেতর লাফালাফি করে।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয় আমি মিতুলের কষ্টের সঙ্গী। ও আমাকে যতটুকু ভালবাসে তার চেয়ে বেশী কষ্টের ভাগ দিতে চায়। আসলে ও আমার মধ্যে একটা নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। নিজের মনের কাছে ওর কোন স্বস্তি নেই। সে মন ওকে নিশ্চিত নির্ভর ভরসা দেয় না। অহরহ সেখানে ঝড় ওঠে, বৃষ্টি হয়, বান ডাকে। সে তোড়ে ভেসে যায় মিতুলের সব বিশ্বাস, সব স্বস্তির কেন্দ্রস্থল। কখনো কখনো আমি নিজেও বুঝতে পারি না যে, কি করলে মিতুলের স্বস্তি হবে। আমার সাধ্য নেই ওকে আমি আমার আশ্রয়ে চিরকালের জন্যে ধরে রাখি। প্রায়ই ও ছিটকে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে গিয়ে কষ্ট পায়। আবার নগ্নপায়ে আমার সামনে এসে নতজানু হয়। তখন আমি ওকে বুকে তুলে নেই। ওর চোখের কোনা চিক্‌চিক্ করে।

আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় না। ও আপন মনেই বলে, বাবাকে আমি বাবা-র মত চাই, জামী, মা-র মতো নয়। এর চাইতে আমার সৎমা অনেক ভাল। তাকে নিয়ে আমার কোন কষ্ট নেই। আমার জন্যে এটুকুই শান্তনা যে, তিনি আমার প্রতি কোন বিদ্বেষ পোষেন না। সোজাসুজি ভালবাসেন, সোজাসুজি রাগ করেন। তাতে কোন ঘোরপ্যাঁচ নেই। সাংঘাতিক রাগারাগি করলেও আমি কিছু মনে করি না। জানি মানুষের মেজাজ সব সময় একতালে চলে না। সেটা অনবরত ওঠানামা করে।

এই নিয়ে বাবা মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে মেয়েলী লুকোচুরি খেলে। চুপিচুপি ঘরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বলবে, তোর কি খুব খারাপ লাগছে মিতু? আমি উত্তর দেই না। মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে থাকি। বাবা কিছুতেই বুঝতে চায় না যে, তার এ ধরনের আচরণ আমার পছন্দ নয়। আমি সইতে পারি না। বরং মা-র রাগারাগি সইবার ক্ষমতা আমার অনেক বেশী। আমার তখন বাবাকে দু'টুকরো করে ফেলতে ইচ্ছে করে। আমি চাই বাবা কষ্ট পাক। আরো কষ্ট পাক। কষ্ট পেতে পেতে মরে যাক।

আমি ওকে কাছে টেনে বলি, মিতুল এসব কথা থাক। দেখবে না আমি আজ কি লিখেছি? এই দেখ নতুন উপন্যাস শুরু করেছি।

মিতুলের সেদিকে কোন খেয়ালই থাকে না। আস্তে আস্তে বলে, তুমি বলতে পার জামী, আমার মা কেন বাবাকে ছেড়ে চলে গেল?

আঃ মিতুল এসব কথা থাক।

মিতুল আমার দিকে একদম তাকায় না। আমি বুঝতে পারি ও এখন আমার বুকের ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেছে। ও শিকারী কুকুরের মত দৌড়ুচ্ছে। হাজার চেষ্টা করেও আমি এখন ওর নাগাল পাব না।

আমি জানি, মা কেন চলে গেছে? আমি ভেবে ভেবে খুঁজে বের করেছি। বাবার এই মেয়েলীপনার জন্যই মা বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে। বল আমি ঠিক বলেছি কিনা জামী? ওর এসব কথা শুনলে আমার শরীরে একটা শিরশিরে অনুভূতি হয়। ভয় পাই। বুকটা খালি হয়ে যায়। মনে হয় মিতুল আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।

আমি একদিন আমার মা'কে খুঁজে বের করব। জিজ্ঞেস করব কেন বাবাকে ছেড়ে চলে গেছে?

ঠিক আছে আমরা দু'জনে তোমার মা-কে খুঁজব মিতুল।

সত্যি খুঁজবে?

হ্যাঁ, সত্যি।

তুমি আমাকে বাঁচালে জামী।

মিতুল আবার আমার মধ্যে ফিরে আসে। এই ফিরে আসাতে ওর কোন সময় লাগে না। তখন ওর বিশ্বাস ও আমার মধ্যে চারিয়ে দেয়।

আজ কি লিখেছ দেখি?

মিতুল আমার হাত থেকে কাগজপত্র টেনে নেয়।

মিতুল যখন আমার ভেতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে যায় তখন আমার ভীষণ কষ্ট হয়। আমার ভেতর ওর আত্মস্থ ধ্যানমগ্ন মূর্তিটি সামনে রেখে স্বস্তিতে দিন কাটাতে পারি। নইলে জ্বালা বাড়ে; তবুও অস্থির খেয়ালী মিতুলকেই আমি পাগলের মতো ভালবাসি। আমার মাঝ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ও যখন কষ্ট পেয়ে আবার ফিরে আসে তখনকার সেই শ্যামল স্নিগ্ধ সৌন্দর্য আমাকে অভিভূত করে। আস্তে আস্তে ওকে ঘুম পাড়িয়ে দেই। মিতুল শান্ত হয়ে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাকে। আমি জানালার কাছে এসে দাঁড়াই। তখন কোনকিছুই আমার ইন্দ্রিয়ের কাছে গ্রাহ্য হয় না। ধীর ধীরে মাথার ভেতরে উপন্যাসের ছক শঙ্খ চিরে বেরিয়ে আসা ভেনাসের মূর্তির মতো অবয়ব পেতে চায়। আমি টেবিলে গিয়ে বসি। নগ্ন ভেনাসের সৌন্দর্য আমার মস্তিষ্ক আলোকিত করে রাখে। কিন্তু আমি এগুতে পারি না। কাগজের বুকে আঁকিবুঁকি কাটি। দু'লাইন লিখি। আবার ছিঁড়ে ফেলি। আবার লিখি। আবার ছিঁড়ি। না হচ্ছে না। আমি পারছি না। অথচ নগ্ন ভেনাস তখনও আমার স্নায়ুতে। আলো তার এতটুকু ম্লান হয়নি। আমি উঠে পানি খাই। গ্লাসে ঢালারও ইচ্ছে হয় না। জগের মুখে মুখ রেখে চক্ চক্ করে গিলি। মনে হয় আকণ্ঠ পিপাসা। কিন্তু কিছুতেই তার নিবৃত্তি হয় না। সারাঘরে পায়চারী করি। টেবিলের ধারে এসে দাঁড়াই। চেষ্টা করেও মনের মতো লিখতে পারি না। মাথার মধ্যে পুরো জিনিসটা পরিষ্কার। অথচ আরম্ভ করতে পারছি না। কি যে যন্ত্রণা। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়। বাথরুম থেকে জগ ভর্তি পানি আনি। আবার খাই। ছুটে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে করে রাস্তায়। আমি তখন ঘুমন্ত মিতুলের পাশে এসে বসি। চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেই ওকে। মিতুল অবাক হয়েও হয় না। মমতাময়ী মায়ের মতো আমার মাথাটা বুকের ওপর ধরে রাখে। আস্তে আস্তে বলে, তোমার কি হয়েছে জামী?

জানি না। জানি না।

আমি নিশ্চুপ মিতুলের হৃৎপিণ্ডের ধুক্‌পুক্ শব্দ শুনি। শব্দে আমি উজ্জীবিত হই। আমার ভেতর সেই শক্তি কাজ করে যে আমি প্রোটপ্লাজমের

প্রথম বিন্দু। আমার থেকেই জীবনের শুরু। আমি আবার লেখার টেবিলে ফিরে আসি। আমার লেখনীতে হাজার ঘোড়ার গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। মিতুল তখন একান্তই আমার হয়ে শুয়ে শুয়ে পত্রিকার পাতা ওল্টায়।

মিতুল আমাকে সবচেয়ে বেশী বোঝে। আমার যে-কোন উত্তেজনার মুহূর্ত ও নিজের করে নিতে পারে। প্রকাশকদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেও যখন বই ছাপাবার ব্যবস্থা করতে পারি না তখন মিতুলের মুখটা আমার শান্ত্বনার কারণ। সংবাদপত্রের কাজ সেরে যখন অনেক রাতে বাড়ি ফিরে আসি তখন মিতুলের ঘরের আলো আমার ভাল লাগে। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় জানালায় টোকা দিলে ও আলো নেভায়। ও আমার জন্যে জেগে বসে থাকে। একদিন রাতে বাড়ি ফিরতে পারিনি। রায়হানের সঙ্গে চলে গিয়েছিলাম ওর মেসে। তারপর সাতদিন মিতুল আমার সঙ্গে কথা বলেনি। পরে অবশ্য অনেক সাধ্যি সাধনায় ব্যাপারটা মিটমাট করেছি। আমি জানি মিতুলের ভেতর ভাল মানুষীসুলভ একটা চমৎকার গুণাগুণ আছে।

মিতুলকে আমি এখনো আমার স্বপ্নের কথা বলিনি। যে কষ্টটা আমি একা পাচ্ছি, তার ভাগ আমি আর ওকে দিতে চাই না। স্বপ্নের কথা শুনলে ও হাজার রকম চিন্তা করবে। অজস্র ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সারাক্ষণ আমাকে মাতিয়ে রাখবে। তার চেয়ে স্বপ্নটা আমার বুকের ভেতরই থাক। ওটাকে আমি অস্বীকার করব। ওটা আমার চেতনায় কোন ছায়া ফেলবে না। বাজে একটা ব্যাপার নিয়ে ভেবে ভেবে শক্তি নষ্ট করার মতো দুর্বল স্নায়ু আমার নয়। আমার একটা নিজস্ব জগৎ আছে। সে জগতের স্রষ্টা আমি। সেখানে আমি অনবরত ভাঙাগড়ার খেলায় মেতে থাকি। এমন ভুবন' ফেলে আমি আর কোথায় গিয়ে ঠাঁই নেব? আর কোন ঠাঁইয়ে আমার প্রয়োজন নেই। রায়হান বলে, আমার লেখা নাকি কেউ পড়ে না। আমি জানি, সাহিত্যে ওর কোন আগ্রহ নেই। ও কোন খোঁজ খবর রাখে না। আমাকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এমন কথা বলে। তবুও মাঝে মাঝে ভাবি, সত্যি কি তেমন কিছু করতে পারিনি? আবার ঝেড়ে ফেলি সব ভাবনা। বিশ্বাস করি সাধনায় নিষ্ঠাবান এবং সৎ থাকলে কেউ আমার পথ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। শিল্পের জগৎ বড় নির্মম।

শিল্পীর কাছ থেকে শিল্প সুদেআসলে মাশুল উঠিয়ে নেয়।

শিল্প হোল সেই ক্রীট দ্বীপের ক্রূর হৃদয়হীন নিষ্ঠুর বাদশাহ মিনোস। শিল্পীকে সে গোলকধাঁধার ভেতর মিনোটওরের সামনে ঠেলে দেয়। শিংওয়ালা ষাঁড়ের মাথা আর মানুষের শরীর নিয়ে সে জন্তু খাবার জন্যে হাঁ করে থাকে। সে এক বিচিত্র জগৎ। সে ধাঁধায় ঢুকলে পথ খুঁজে বেরিয়ে আসা অসম্ভব। শক্তিমানরা পারে মিনোটওরকে হত্যা করতে। আরিআদনির মতো অনির্বাণ প্রজ্ঞা রেশমী সুতো হয়ে পথ দেখায়। কিন্তু দুর্বলেরা মরে। ব্যর্থতার জ্বালা নিয়ে পথ হাতড়ায়। কোনদিন সে পথ খুঁজে পায় না। তারপর মিনোটওরের খোরাক হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শিল্পের যে গোলকধাঁধায় আমি নেমেছি, তা আমি অতিক্রম করবই। অফুরাণ শক্তির খনি আমার পায়ের নিচে জমে আছে। মিনোটওরকে হত্যা করব। হৃদয়ের আলো আরিআদনি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেশমী সুতো ধরে। আমি বেরিয়ে আসবই।

আমার একটা নির্দিষ্ট আয় আছে। বাড়ি ভাড়া পাই। আমার বাবা অনেক কষ্টে এ বাড়িটা বানিয়েছিলেন। বাস করতে পারেননি। তার আগেই মারা গেলেন। আমার মা বাবার মৃত্যুর পর সাত বছর শোক করেছেন। মা-র শব্দহীন বৈধব্যে আমি প্রতি মুহূর্তে উপলব্ধি করেছি দুর্লভ সঙ্গী ছাড়া বেঁচে থাকাটা কঠিন। অন্য অর্থে নির্মম। মা'র মৃত্যুর পর এখন আমার আর কেউ নেই। আরো এক ভাই এক বোন ছিল। দু'জনেই ছোট বেলায় মারা যায়। ফলে এখন আমি দায়িত্বমুক্ত এবং বন্ধনমুক্ত। সে কারণেই শিল্পের গোলকধাঁধায় আমার অনন্তকালের যাত্রা। কোন পিছুটানে পথচলা থমকে যাবে না। রায়হান এ নিয়ে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে। ওর মতে আমার সবকিছুই পাগলামি। শিল্পের সঙ্গে ওর কোন খাতির নেই। এসব প্যানপ্যানানি নাকি জীবনকে গুরুভার করে তোলে। এসব অনুভূতি-টুতি জীবন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করা দরকার। ও সোজা সরল পথ বোঝে। টাকা উপার্জন এবং ফুর্তি করা ছাড়া আর কিছু ওর ভাল লাগে না। তবে ও খুব জেদী ছেলে। কোনকিছু মনে উঠলে সেটা করে ছাড়ে। দরকার হলে তার জন্যে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করতে রাজী। তখন ও ডানে-বামে তাকায় না। মাঝে মাঝে ওর এ ধরনের আচরণে আমি ভয় পাই। তবে আমার ওকে ভালই লাগে। যদিও মিতুল ওর ওপর ভয়ানক

খাপ্পা। রায়হানও মিতুলকে পছন্দ করে না। আমার চরিত্রের বিপরীতধর্মী লোকজন আমার সবসময় ভাল লাগে। আমি ওদের মধ্যে লেখার উপাদান খুঁজে পাই। সে জন্যে অনেক বিরুদ্ধ পরিবেশেও আমি ওদের সঙ্গ ত্যাগ করি না। রায়হান আমার সে ধরনের বন্ধু। কলেজে পড়ার সময় থেকেই ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। এখন পর্যন্ত কোন কারণে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বে ফাটল ধরেনি। যদিও মিতুলকে ও সহ্য করতে পারে না। ওর মতে মিতুলের চরিত্রে অনেক খামখেয়ালিপনা আছে। সেসবের কোন মানে হয় না। আমিও রায়হানকে কখনো বোঝাতে চেষ্টা করিনি যে, মিতুলের সবকিছু মিলিয়েই মিতুল আমার কাছে অসাধারণ। রায়হানকে বোঝানোর দরকারই বা কি!

একদিন মাঝরাতে সেই স্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভেঙে গেল। হিংস্র ঈগলটা আমার কলজে টেনে বের করেছে। ঘুম ভেঙে যাবার পর কোন ভয় বা অবসাদ আমাকে আচ্ছন্ন করলো না। মনে হলো বিরাট একটা সমুদ্র আমার মাথার মধ্যে গর্জন করে বয়ে যাচ্ছে। প্রোটোপ্লাজমের বিন্দুটি একা একা ভাসছে। ভেসে যাচ্ছে। ওর গায়ে এখন আমার আলট্রাভায়োলেট রশ্মি স্পর্শ করানো প্রয়োজন। ভেতরে ভীষণ আলোড়ন। আমি উঠে জানালার কাছে দাঁড়ালাম। ঘুরে এসে আলো জ্বালালাম। আমি তো সেই অমিত তেজের অধিকারী। আলোর রশ্মি ছুঁড়ে ফেলতে হবে। উত্তেজনা আমাকে পাগল করে তোলে। আমি টেবিলের ধারে এসে দাঁড়াই। এ তিনটে মাস হাজার কষ্ট করেও যে উপন্যাসটা আমি শুরু করতে পারছিলাম না, সেটা এখন একদম তৈরি বলে মনে হচ্ছে। আমার মাথায় হাজার জলপ্রপাতের শব্দ।

দুই

সেদিন অনেক রাতে সংবাদপত্র অফিসের কাজ সেরে বাড়ি ফিরলাম। দেখলাম মিতুলের ঘরে আলো নেই। এমনটি হবার কথা নয়। হয়তো ক্লান্ত ছিল, ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত তো কম হয়নি। এই বলে মনকে

শান্ত্বনা দিতে চাইলাম। তবুও খুঁতখুঁতি কাটলো না। ঘরে ঢুকে মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেলো। সমস্ত ঘরটা এলোমেলো। এতক্ষণ ইঁদুরেরা অবাধ রাজত্ব চালাচ্ছিল। আমার সাড়া পেয়ে পালালো। দুপুরবেলার এঁটো বাসন তেমনি রয়েছে। স্টোভের ওপর ভাতের হাঁড়ি উল্টে আছে। জগে পানি নেই। মেঝের ওপর আলু, ডিমের খোসা ছড়ানো। বিরক্তির মাঝেও হাসি পেলো। বুঝলাম ইঁদুরের কাণ্ড। আমার ঘরটা স্টেডিয়াম বানিয়ে ওরা হয়তো ডিমের খোসা দিয়ে ফুটবল খেলছিল। ওদের আর দোষ কি। সুযোগ পেলে আমরা সবাই বেশ একটা রামরাজত্ব গড়ে তুলতে চাই।

বাথরুমে ঢুকে বেশ করে হাত-মুখ ধুয়ে নিলাম। ক্লান্তি ঝরে যাচ্ছে। অতিরিক্ত মেদ কমে গেলে শরীর যেমন হালকা লাগে, তেমন লাগছে নিজেকে। আসার পথে পাউরুটি, মাখন কিনে এনেছিলাম। তাই খেলাম। বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়ার পরও আমার মনে হলো শরীরে কোন অবসাদ নেই। আমি এখনো অনেক কাজ করতে পারি। ঝিরঝির বাতাস ঢুকছে জানালা দিয়ে। মশারি কাঁপছে। মিতুলের ওপর থেকে রাগ পড়ে যাচ্ছে। মিতুলের ওপর রাগ করে থাকা খুব কষ্টের। পায়ের দিকের জানালার কাছের ইউক্যালিপটাস গাছের আড়ালে চাঁদটা ঢাকা পড়েছে। দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে ইচ্ছেও করছে না। মাঝে মাঝে না দেখে কেবল উপলব্ধিতেই আলো পাই। বিজ্ঞানীরা বলেন পৃথিবীর জন্মের পর চাঁদের দূরত্ব ছিল আট হাজার মাইল। তারপর কয়েকশো কোটি বছরে চাঁদ পৃথিবীর কাছ থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে গেছে। এখনকার দূরত্ব প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল। আসলে এমনি হয়। একটু একটু করে আকর্ষণ কমতে থাকে। তখন অনেকদূরে সরে যায় মানুষও। জীবনের আরম্ভটা যেমন, শেষটা তেমন নয়। তবে চাঁদের দূরে সরে যাবার একটা সীমানা আছে, সে পর্যন্ত পৌঁছে আবার সে কাছে আসতে শুরু করবে। আবার টানবে পৃথিবীকে, পৃথিবীও টানবে চাঁদকে। আমার মনে হয় এটাই সত্য। দূরে সরে যাবার সীমানা না থাকলে জীবনের প্রাপ্তি ফুরিয়ে যেতো। ঐ নতুন করে আবার কাছে আসার নিয়ম আছে বলেই তো আমরা আছি। এই টানাটানির মধ্যে জীবনটা বেশ বয়ে যায়। মিতুল যখন আমার ভেতরে এসে ঠাঁই নেয়, তখন মনে করি আছি।

যখন ছিটকে বেরিয়ে যায় তখন এ চাঁদের দূরত্বের সমান মনে হয়। তখন অবসাদের বরফ জমে। জীবনের প্রাপ্তি মিথ্যে হয়ে যায়।

ঘরের মেঝেয় ইউক্যালিপটাসের ছায়া পড়েছে। চাঁদটা হেলে আছে আর একটু এদিকে। গাছের ফাঁক দিয়ে আমি তার এককণা দেখতে পাচ্ছি। মনটা কেমন উদাস লাগে। মাঝে মাঝে এ ধরনের বৈষ্ণবীয় আনচানে ব্যাকুল হই। কি করব বুঝে উঠতে পারি না। উঠে ঘরে আলো জ্বালাই। টেবিলে, র‍্যাকে, মেঝেতে স্তূপ করে রাখা বইয়ের দঙ্গল থেকে বালজাকের জীবনীটা টেনে বের করি। বালজাকের কথা মনে পড়লে আমার কেবল দু'টো কথা মনে হয়। এক. তিনি প্রতিদিন আঠারো ঘণ্টা লিখতেন। দুই. তিনি কোন কুমারী মেয়ের সঙ্গে প্রেম করেননি। তার চাইতে বয়সে বড় তিনজন বিবাহিত, সন্তানের জননীর সঙ্গে তাঁর প্রেম ছিল জমজমাট। শেষের একজনকে তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে গিয়ে বিয়ে করেছিলেন। তখন তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন। ফলে বউ-র কাছ থেকে পেয়েছেন অবজ্ঞা, অবহেলা আর ঘৃণা। কত বিচিত্র নেশা তার, কত বিচিত্র খেয়াল। দেনায় জর্জরিত ব্যক্তিটি ছিল সমকালের শ্রেষ্ঠ মানুষ। মনে হয় বালজাকের পুরো জীবনটাই এক উপন্যাস। পড়তে পড়তে সময়ের কথা আমার খেয়াল থাকে না। রাতের হিসেব ভুলে যাই। এতদিন বইটা পড়িনি বলে আমার আফসোস হলো। এ আমার এক অভ্যাস। কিনে ফেলে রাখি। তারপর দু-চার মাস পরে সে বইয়ের কথা মনে হয়। তখন সারারাত পার করে দেই সে বইয়ের পেছনে। বইটা শেষ হয়ে যাবার পর চোখটা বুঁজেছি এমনসময় দরজায় টুকটুক শব্দ হোল। বুকটা ধক্ করে উঠলো। মিতুল এলে দরজায় এ ধরনের শব্দ হয়। মৃদু অথচ সঙ্গীতমুখর। আমি লাফ দিয়ে উঠে দরজা খুলে দেই।

মিতুল তুমি? এত ভোরে?

মিতুল কথা না বলে ঘরে ঢোকে। বাতিটা বন্ধ করে দেয়। তখনো ভালো করে ভোর হয়নি। ফ্যাকাশে আলো ছড়ানো। ইউক্যালিপটাস গাছের জন্যে আমার ঘরে আঁধার আঁধার ভাব। মিতুল সোজাসুজি আমার চোখের দিকে তাকায়।

কাল রাতে আমি একটুও ঘুমোইনি জামী।

আমি ওকে হাত ধরে এনে বিছানায় বসালাম। ওর ঘুমহীন চোখজোড়া ছলছল করছে। ক্লান্তির বদলে উত্তেজিত হয়ে মিতুল আমার হাত চেপে ধরল।

জামী, তুমি না বলেছিলে আমার মাকে খুঁজবে?

হ্যাঁ, খুঁজবো তো।

কিন্তু কেমন করে? আমরা তো কেউ তাকে চিনি না? একথা আমি কাল সারারাত ধরে ভেবেছি জামী। তুমি যখন ঘরে ফিরেছ, তখনো আমি জেগেই ছিলাম। ইচ্ছে করে বাতি বন্ধ করে রেখেছিলাম।

মিতুল তুমি একটু ঘুমোবে?

না জামী, ওকথা বোল না। চল, আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। ঘুরে ঘুরে খুঁজে দেখি কোথায় মাকে পাওয়া যাবে। মা কিসের তাড়নায় বাবা থেকে দূরে চলে গেলো। আচ্ছা জামী, মা যখন চলে যায়, আমার কথা তার কি একবারও মনে হয়নি?

নিশ্চয় হয়েছে। তবে তোমার আকর্ষণ তাঁর কাছে কম ছিল মিতুল, তুমি তাঁকে তেমন করে টানতে পারনি।

ঠিক বলেছ। আমি কি বোকা। সহজ সত্যটা বুঝতে চাই না। না, ঠিক তা নয়। বুঝতেই পারি না।

মিতুল আর কোন কথা না বলে আমার বিছানায় শুয়ে পড়ে। আমি বাথরুমে যাই। মুখ হাত ধুয়ে নিয়ে ঘরটাকে গোছগাছ করার চেষ্টা করি। আড়চোখে মিতুলকে দেখি। বুঝতে পারি, ও ঘুমোচ্ছে না। শুয়ে শুয়ে পায়ের পাতা নাচাচ্ছে। যদিও ডান হাত দিয়ে চোখ ঢাকা। আমাকে কাজ করতে দেখে একটু পরে ও উঠে আসে।

তুমি বড্ড নোংরা থাক জামী? সর, আমি ঠিক করে দেই। আমি ওর তিরস্কার নীরবে হজম করে সরে আসি। মিতুল কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘরটা গুছিয়ে ছিমছাম করে ফেলে। স্টোভ জ্বালিয়ে চা বানায়। ঠাণ্ডা পানিতে হাত-মুখ ধুয়ে নেয়ার পর ওকে বেশ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে। ও টিন থেকে বিস্কুট বের করে আমাকে টেবিলে দেয়। তারপর দু'পেয়ালা চা নিয়ে আসে।

এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মতো দেখাচ্ছে তোমাকে!

বুঝেছি। মিতুল হাসে।

কি ? কি বুঝেছ ?

প্রশংসা করার পেছনে তোমার একটা মতলব আছে।

আমি হো হো করে হেসে উঠি।

নাও, চা খাও ।

না।

তবে ?

মতলবের কথা বল ?

একদম সোজা। আগে একটা চুমু খেতে চাও।

মিতুল চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরে। আমি ওকে টেনে সামনে নিয়ে আসি। মিতুলের চোখের শান্ত আকাশে ঝড়। সে দৃষ্টি আমাকে বাউরা করে। ভোরের আঁধার ভাব কেটে গেছে। ইউক্যালিপটাসের গাছে এখনো আলো। রোদ নেই। মিতুল আমার বুকে। চা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা। সে চা আমাদের কারো আর খাওয়া হয় না। মিতুলের লম্বা বেণী আমি খুলে দিয়েছি। ও হাতে জড়িয়ে একটা এলো খোঁপা বেঁধে রোদ ওঠার আগেই চলে যায়। আমি আরামে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকি। আমার মনে হয় আমার কোনকিছু করার নেই। কোন কাজ নেই। পড়া নেই। লেখালেখি নেই। আমি অনন্তকাল ধরে এমন চোখ বুঁজে শুয়ে থাকতে পারি। মিতুলের সান্নিধ্যে বড় দ্রুত সব দুঃখের কথা ভুলে যাই। ভুলে যাই মা–র কথা, বাবা-র কথা, একলা জীবনের অসীম শূন্যতার কথা। নিঃসঙ্গতা আমার স্নায়ুর পরতে পরতে জড়িয়ে আছে। নিঃসঙ্গতা আমাকে বড় কষ্ট দেয়। বিশেষ করে দুপুরবেলা। তখন অকারণ শূন্যতায় বুকটা ফেটে যেতে চায়। লিখতে ইচ্ছে করে না। পড়তে ইচ্ছে করে না। মাঝে মাঝে ঐ অবস্থায় ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এলোমেলো হাঁটি। রিক্শা নিয়ে ঘুরি। এ রাস্তা ও রাস্তা। তারপর কোন রেঁস্তোরায় বসে বসে চা খাই। কখনো হাসপাতালে রেজার কাছে যাই। রেজা আমার বন্ধু। ডাক্তার। ঔষধের গন্ধে আমার নেশা ধরে। হাসপাতালে আমার বেশ লাগে। প্রতিটি রুগীর দৃষ্টিতে আমি জীবনের এক ভিন্নতর অর্থ পাই। প্রত্যেকের দৃষ্টি আলাদা। কেউ মৃত্যুর সঙ্গে তীব্রভাবে যোঝে। কেউ হতাশ হয়ে যায়। বিষণ্ন কাতর। তবে সবার একটা আলাদা চাউনি থাকে। ঐ চাউনিটুকু আমার ভাল

লাগে। আমি অনেক সময় ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলি। রেজা মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করে।

তোর মতো লোক আমি একটাও দেখিনি জামেরী! লোকে হাসপাতালের নাম শুনলে নাকে কাপড় দেয়। আর তুই নাক লাগিয়ে এর গন্ধ নিস।

ঔষধের গন্ধ আর রুগীর ঐ নিস্পৃহ নিরাসক্ত দৃষ্টি আমার ভাল লাগে রেজা।

পাগল! রেজা হাসতে থাকে। নিশ্চয় কোন নার্সকে তোর মনে ধরেছে। বল কাকে? ফ্রি থাকলে আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

আমি ওর কথার উত্তর না দিয়ে হাসি। তখন এম্বুলেন্সের নীল আলো আর তির্যক ভেঁপুটা আমার মাথায় এক নিরাসক্ত বোধের জন্ম দেয়। আমি সেই নীল আলোর ছায়ায় ভেঁপুর শব্দ বুকে নিয়ে হাঁটতে থাকি। জানি না কেন ঐ শব্দ আমাকে এত টানে। রায়হান এম্বুলেন্সের ভেঁপুর শব্দ সহ্য করতে পারে না। ও বলে, মনে হয় মৃত্যু যেন আমার দিকে দাঁত খিঁচিয়ে ছুটে আসছে। অথচ ঐ ভেঁপুর শব্দটা আমার প্রিয় সঙ্গীত। ঘরে থাকলে এ শব্দে আমি সবসময় জানালায় এসে দাঁড়াই। দেখি নীল আলোটা কেমন জ্বলছে আর নিভছে। শব্দ মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত আমি দাঁড়িয়েই থাকি। নড়তে ইচ্ছে করে না। একদিন গভীর রাতে সে শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। জানালার ধারে আসতে না আসতে ঐ শব্দটা মিলিয়ে গিয়েছিল। তারপর সারারাত আমি জানালায় বসে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। সেদিন আমার বাবার কথা মনে হয়েছিল। বাবার জন্যে আমি স্কুলে পড়া ছেলের মতো কেঁদেছিলাম। মনে হচ্ছিল বুকের তলায় কোথায় কি যেন আটকে আছে।

চোখ বুঁজে থাকতে থাকতেই কখন ঘুম এসেছিল টের পাইনি। রাতজাগা শরীর আর কোন নিষেধ শোনেনি। ঘুম ভাঙলো দরজায় খটখট শব্দে। হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে গেলে আমার বুকের ভেতর কেমন একটা ঝাঁকুনি হয়। কিছুক্ষণ সময় চুপ করে বসে থাকতে হয় সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্যে। ডাক্তার দেখানো দরকার। অথচ আলসেমির জন্যে হয়ে ওঠে না। দরজায় খট্ খট্ শব্দ জোর বাড়তে থাকে। হঠাৎ মনে হলো নিশ্চয় রায়হান। ও রেগে গেলে এমন শব্দ করে।

দরজা খুলতেই হাঁড়িমুখো রায়হান চেঁচিয়ে উঠলো, উঃ, বেলা এগারোটা

পর্যন্ত ঘুম? তোকে দিয়ে হবে কিরে চাঁদ?

দেখ রায়হান, ছাই ফেলতে কিন্তু ভাঙা কুলোরও দরকার হয়।

হুঁ কথা শিখেছিস বড় বড়। তা শিখবিই না বা কেন? কথার ব্যবসা করেই তো খাচ্ছিস। তা রাত জেগেছিলি বুঝি?

হ্যাঁ। সারারাত।

কি করলি?

বই পড়লাম।

ওঃ, এই করেই স্বাস্থ্যটা শেষ করবি বুঝতে পারছি।

বোস রায়হান, আমি হাত-মুখ ধুয়ে নিই।

বাথরুমে ঢুকে ঠাণ্ডা পানিতে অনেকক্ষণ ধরে হাত-মুখ ধুয়ে মেজাজ ঠাণ্ডা করলাম। রায়হানের সঙ্গে আমি রাগ করি না। ওর কথাবার্তা একটু ত্যাড়া। এমনি চেঁচিয়েই কথা বলে। চেঁচিয়ে নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। অন্যদিকটা বিবেচনা করে না। ওর মতের বাইরেও যে আর কারো মত থাকতে পারে সেটা সহ্য করা ওর পক্ষে অসম্ভব। বাথরুমে টোকা পড়ল, হেই জামেরী, তুই কি সারাদিন বাথরুমে কাটাবি? নাকি আমাকে তাড়াতে চাইছিস? সোজাসুজি বলে ফেল। কেটে পড়ি।

অগত্যা বেরিয়ে আসতে হলো।

তোর টেবিলে দুই কাপ চা কেনরে জামেরী?

মিতুল এসেছিল, ও বানিয়ে রেখে গেছে।

খাসনি কেন?

কি জানি, খাওয়া হয়নি। আমার ঘুম এল, ঘুমিয়ে পড়লাম।

হুঁ, বুঝেছি।

রায়হান হা হা হাসতে লাগল। আমি ওর দিকে বিশেষ মনোযোগী না হয়ে চা বানাতে লাগলাম। রায়হান হাসি থামিয়ে আমার ছোট্ট ঘরে পায়চারী করতে লাগল।

আমি একটা সমস্যায় পড়েছি জামেরী।

আগে তো চা খেয়ে নেই, তারপর শুনব। পেট চোঁ চোঁ করছে।

রায়হানের সঙ্গে কথা বলতে আমার ভাল লাগছে না। তবু আমি নিজেকে সংযত রাখলাম। ওর সমস্যা মানেই তো ব্যবসা-সংক্রান্ত। ওতে আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। শুনতে ভাল লাগে না। কিভাবে

কেমন করে টাকা বানাবে, এই চিন্তায় থাকে কেবল। স্বার্থ-সম্পর্কিত কি একটা ব্যাপার নিয়ে ও যেন কাকে খুন করেছিল। আমি এইটুকু জানি মাত্র। এর বেশি কিছু ও আমাকে বলেনি। আমিও জানতে চাইনি। মেলা টাকা পয়সা খরচ করে নাকি ও ব্যাপারটা চাপা দিয়ে ফেলেছে। মাঝে মাঝে এ নিয়ে ভাবলে আমি হোঁচট খাই। কিন্তু রায়হানের বিবেক ওকে তেমন আলোড়িত করে না। ও দিব্যি দিন কাটায়।

চা বানিয়ে ওকে এক কাপ দিলাম। টেবিলের ওপর থেকে বিস্কুট নিয়ে খেতে খেতে বললো, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যেতে পারবি জামেরী?

কোথায়?

বল না যাবি কিনা?

না শুনলে কি করে বলব?

কাফে রেঁস্তোরায়।

ওখানে কি?

ছন্দাকে আসতে বলেছি।

ও তাই বল। তা তোদের মধুগুঞ্জনে আমি গিয়ে কি করব?

মধুগুঞ্জন? ছোঃ ছন্দার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হবে।

প্রেম জমে উঠতে না উঠতেই বোঝাপড়া। কি ব্যাপার বলতো?

সমস্যাটা তো ওখানে।

রায়হান হাতের বিস্কুট জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমি চুমুকে চুমুকে চা খাই। ও চা না খেয়েই আবার পায়চারী শুরু করে। ওর সামনে কাপটা এগিয়ে দেই। ও এক ঢোক খেয়েই মুখটা বিকৃত করে। কাপটা ঠক্ করে টেবিলের ওপর রেখেই বলে, কি তেতো চা বানিয়েছিস? ও কি মানুষে খেতে পারে। আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়েই বলে, আচ্ছা জামেরী, তুই মেয়েদের বিশ্বাস করিস?

আমি ওর চোখে চোখ রেখে বললাম, করি।

ও আমার মুখের ওপর ঝটকা দিয়ে বলল, আমি করি না।

সেটা তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার। তুই ভীষণ উত্তেজিত। একটু শান্ত হয়ে বোস দেখি রায়হান। রায়হান হঠাৎ শান্ত ছেলের মতো চেয়ার টেনে আমার মুখোমুখি বসলো।

তুই তো জানিস জামেরী একটা বুলেটের বিনিময়ে আমি একটা

জীবন হরণ করেছিলাম। ঐ খুনে আমার প্রয়োজন ছিল। জামিল আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও ওকে আমি খুন করেছি। এর প্রধান কারণ আমাদের মত পার্থক্য। আমি মনে করি ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। সে অপরাধের জন্যে ওকে শাস্তি পেতে হবে। ইচ্ছে করলে জামিলও আমাকে খুন করতে পারত। কিন্তু সে সুযোগ ও পায়নি। পেলেও ওর তেমন সাহস ছিল না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছি আমি। আমার বুকের ভেতর সাহস নামক বস্তুটা সমুদ্রের মতো গর গর করে। ওকে মারতে আমার একটুও হাত কাঁপেনি। এজন্যে আমার কোন গ্লানি নেই। অপরাধবোধও নেই। যাকে আমি অপ্রয়োজনীয় মনে করেছি, তাকে নিদ্বিধায় নর্দমায় নিক্ষেপ করেছি। ব্যস্। ঝামেলা চুকে গেছে।

রায়হান জগ থেকে পানি ঢেলে খেল। ওর কথা শুনতে আমার ভালই লাগছিল। আমি লেখার উপাদান পাচ্ছিলাম। এতক্ষণ ওর ওপর আমার যে রাগ ছিল, সেটা উবে গেছে। ওকে এখন সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করছি। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি দেখে আমি নিজের ওপর খুশী হলাম। অবশ্য যে-কোন লোকের সঙ্গে আচরণে আমি অধিকাংশ সময়ই ঠাণ্ডা মাথায় এগোই। তারপর অন্তরটা হাতড়ে ফিরি। অবয়বে লালিত্য থাকলে পরে অবশ্যই সেটা উপন্যাসের চরিত্রে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কাউকে মনে ধরে গেলে তাকে আমি অসাধারণ সৃষ্টি হিসেবে দাঁড় করাতে পারি। রায়হানকে কোন প্রশ্ন করলাম না। আমার ইচ্ছে ও নিজে থেকেই সবকথা বলুক। ওর ভেতরের উৎসমুখ খুলে গেছে। নিজেকে হালকা করার জন্যে আমার এখানে এসেছে। এখন অনর্গল কথা বলবে। শুধু কথা বলতেই চায়।

জানিস জামেরী, মাস তিন চার আগে একদিন হাসতে হাসতে এ ঘটনার কথা ছন্দাকে বলেছিলাম। ব্যস্, সেই থেকে ছন্দা একদম গুম হয়ে গেছে। আমার খুনের সমুদয় দায় দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে। যত সব বাজে ভাবনা। কোন মানেই হয় না এ ধরনের আচরণের। আসলে ছন্দা সমস্ত ব্যাপারটাকে পেঁচিয়ে ফেলেছে। তোর কি মনে হয় জামেরী?

আমার মনে হয় ছন্দার ব্রেনে অতিরিক্ত কতগুলো সেলের জন্ম হয়েছে। নইলে এমন অর্থহীন ভাবনায় ও সমস্ত কিছু গুলিয়ে ফেলছে কেন?

আমার সমর্থনে রায়হান উৎসাহিত হয়ে ওঠে। আমি ইচ্ছে করেই ওকে সমর্থন করলাম। আমার এখন রায়হানের কথা শোনা দরকার। পরে ঠাণ্ডা মাথায় ঘটনার বিশ্লেষণ করতে হবে।

ঠিক বলেছিস জামেরী। ছন্দাকে আমি ভালবাসতে চাই। অথচ ছন্দা আমাকে অস্বীকার করছে। বলছে, খুনীকে ভালবাসা পাপ? পাপ? ছন্দা আমাকে পাপের কথা শেখায়। ওকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারছি না যে, পাপের সংজ্ঞা বদলেছে। খুনীর সংজ্ঞা বদলেছে। আমাদের বিশ্বাসের প্রচলিত ধারণাগুলো এখন আর কোন বস্তুতে নির্দিষ্ট নেই। উঃ জামেরী, ছন্দার ব্যবহারটা এখন ধীরবিষক্রিয়ার মতো। আমার রক্তস্রোতকে দূষিত করে তুলেছে। আমার ভালবাসার বিরাট ফানুসটা যখন সমস্ত আবেগ নিয়ে ফেটে পড়তে চায়, তখন ছন্দা তার নির্লিপ্ততার ছুরি দিয়ে নির্মমভাবে কাটে। সে ক্ষতের রক্তক্ষরণ কোন পদার্থ নয় বলেই ও তা দেখে না। জানিস জামেরী, সে মিষ্টিভাষী ছন্দা এখন বড় রূঢ় এবং কঠিন স্বরে কথা বলে। ও কেমন করে এমন বদলে গেল, আমি তা ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারি না। একদিন আমাকে না দেখলে যার চোখ ছলছলিয়ে উঠত, সে এখন আমার মুখের দিকে তাকায় না। চোখে চোখ পেতে কথা বলে না। আমার আঙুল কামড়ে দেয় না। ওর অদ্ভুত অদ্ভুত ইচ্ছেগুলো আমার ঘাড়ে চাপায় না। বলে না, রায়হান তুমি পার রাত-দুপুরে আমাদের ঐ মাধবী ঝাড়ের নীচে আমার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে? শুধুমাত্র আমার জন্যে। আমি দারুণ উৎসাহে বলতাম, পারি খুব পারি।

প্রমাণ দাও?

দেব আজ রাতে।

থাক লাগবে না। আচ্ছা রায়হান, তুমি পার সাতদিন একটানা না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিতে শুধু আমার জন্যে?

জানিস জামেরী, আমি কোন উত্তর না দিয়ে পাশ কাটিয়ে বলতাম, নিজের ওপর তোমার খুব মায়া না ছন্দা?

হ্যাঁ। খুব।

তুই দেখ জামেরী ছন্দা এখন নিজের ওপর মায়া করছে না। না কি আমারই ভুল? বুঝতে পারছি না। নিজের ওপর অসম্ভব মায়া বলে ছন্দা আমার থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। মনে হয় ছন্দা এখন ঠিক

সেই নির্জন বাংকারটার মতো। স্বাধীনতার পর কামালপুরের এক অখ্যাত গ্রামে যাকে আমরা ফেলে এসেছি। সেখানে ফিরে যাবার আমার আর কোন পথ নেই। ঐ বাংকাররে মতো ছন্দা বুঝি আমার জীবন থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনিংয়ের পর সেই ব্যাংকারটাকে কত আপন মনে হোত। বাংকারের অন্ধকার আর স্যাঁতসেঁতে মাটি আমাকে ছন্দার স্পর্শের কথা মনে করিয়ে দিত। সেদিনগুলোর ছন্দাকে আমি আর কোথাও খুঁজে পাই না। ছন্দা এখন পাথুরে মাটির মতো শুকনো খট্‌খটে্‌। উঃ জামেরী, আমার কি যে খারাপ লাগছে।

রায়হান টেবিলের ওপর মাথাটা রাখে। আমি নিবিষ্ট মনে এতক্ষণ ওর কথা শুনছিলাম। গল্পের মতো মনে হচ্ছে। তবে আগেই আমি কোন পক্ষ নেব না: ছন্দাকে আমি দেখিনি। আগে ওকে দেখা দরকার। হঠাৎ মনে হলো. খুনের অজুহাত দিয়ে ছন্দা রায়হানকে এড়াতে চাইছে না তো? না কি রায়হানের আচরণে ছন্দার সরল বিশ্বাস আহত হয়েছে? হঠাৎ ধাক্কায় ও বিরূপ হয়েছে? রায়হানের প্রতি নমনীয় মনোভাব পোষণ করার আর কোন যুক্তি পাচ্ছে না? একটা যুক্তিতে ছন্দাকে আসতে হবে। রায়হানকে নিয়ে আমার ভয়। ও কোন যুক্তি মানে না। অন্ধ আবেগ তাড়িত হয়ে চলে। আমার চিন্তার ফাঁকে রায়হান মাথা তুললো। দেখলাম, উত্তেজিত দৃষ্টি শিকারী কুকুরের মতো বাতাসে গন্ধ নিতে চাইছে। আমার খারাপ লাগলো। রায়হানের জেদের সামনে আপোষ বলে শব্দ নেই।

জামেরী?

বল।

তুই যাবি না আমার সঙ্গে?

যাব।

বাঁচা গেল। তুই লেখক জামেরী। আমি জানি, তোর একটা ভিন্ন দৃষ্টি আছে। আমার বিশ্বাস সে দৃষ্টিতে তুই অন্তত ছন্দাকে বুঝতে পারবি। আমি যেটা পারছি না, তুই হয়তো সেটা পারবি জামেরী।

রায়হান নিশ্চিন্তে আমার কাঁধে হাত রাখে। ও আমার ওপর ভরসা করে সমস্যাটা পার হতে চায়। কিন্তু ছন্দার মনের ওপর কি আমার কোন জোর চলবে? ভালবাসা থেকে যে মেয়ে মুখ ফিরিয়েছে, তৃতীয় ব্যক্তির যুক্তি তার কাছে কতটুকু আবেদন নিয়ে পৌঁছবে?

ছন্দাকে আমি বারটায় আসতে বলেছি জামেরী। চল, বেরিয়ে পড়ি। যেতে যেতে আমার মনে হলো, রায়হানকে যদি এড়ানোর ইচ্ছে থাকে, তবে আসবে না। কিন্তু রেঁস্তোরায় পৌঁছে দেখলাম, আমার ধারণা ভুল। ছন্দা আমাদের আগে এসে নির্ধারিত জায়গায় বসে আছে। সাইকির কথা আমি পড়েছি। তার সৌন্দর্যের বর্ণনায় ঈর্ষান্বিত হয়েছি। কেনো কিউপিড হলাম না, একথা আমার সব সময় মনে হতো। এই মুহূর্তে ছন্দাকে দেখে সাইকির কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না আমি। মনে হলো, আমার বহুদিনের সাধ পূর্ণ হলো। শুধু আমার জন্যে গ্রীক মিথলজি থেকে ও এখানে উঠে এসেছে। আমাদের দেখে ছন্দার কোন প্রতিক্রিয়া হলো বলে মনে হলো না। ও যেমনি ছিল, তেমনি বসে রইল। রায়হান জিজ্ঞেস করলো, কখন এসেছো?

পাঁচ-সাত মিনিট আগে।

কি খাবে বল?

ফানটা।

আর কিছু?

না।

জামেরী, তোর জন্যে কি বলব?

তোর যা ইচ্ছে।

রায়হান বেয়ারাকে ডেকে একগাদা খাবারের অর্ডার দিল। আমি পথে ঠিক করেছিলাম যে ওদের ব্যাপারে খুব একটা কথা বলব না। চুপচাপ শুনে যাব কেবল। ছন্দার দিক না শুনে একতরফাভাবে রায়হানকে সমর্থন করা উচিত হবে না। তবে ছন্দাকে দেখার পর ওর জন্যে আমার ভয় হলো। বুঝলাম কোনকিছুর বিনিময়ে রায়হান ওকে ছাড়বে না। ছাড়বার কথা নয়। রেঁস্তোরাটা নিরিবিলি ছিল। যা দু'-একজন খদ্দের ছিল, তাদের মনোযোগ অন্যদিকে। তারা নিজেদের মধ্যেই কথা বলছিল। পরিবেশ দেখে আমি কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। আমরা কেউ খুব একটা কথা বলছিলাম না। রায়হানের দু'একটা কথার উত্তরে ছন্দা খুব সংক্ষিপ্ত জবাব দিল। বুঝলাম বেশি কথা বলার ইচ্ছে ওর নেই। বেয়ারা খাবার দিয়ে গেল। আমরা চুপচাপ খেলাম। কেন জানি রায়হান ছন্দার সঙ্গে আমার কোন পরিচয় করায়নি। ছন্দার সঙ্গে আমার কয়েকবার চোখাচোখি

হয়েছে। আমার মনে হয়েছে ওর সৌন্দর্যের অন্তরালে একটা চাপা বিষণ্ণতা আছে। যেটা প্রকাশ করতে না চাইলেও বেরিয়ে যায়। খাবারের পর রায়হান কোন রকম ভূমিকা না করে বলল, আমি তোমাকে কেন ডেকেছি, তুমি তা জান ছন্দা?

জানি।

আমার কাজের প্রয়োজনে আমি যা করেছি, তাকে তুমি আমার ভালবাসার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে এক করে দেখো না।

ছন্দা খুব শান্ত স্বরে বলল, যে ভালবাসার সঙ্গে কাজের যোগ নেই, সেই ভালবাসায় আমার কোন আস্থা নেই। আমি কোন কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চাইনে।

ছন্দা মুখটা নীচু করে ছিল। ওর চওড়া সিঁথিতে আমার দৃষ্টি আটকে গেলো। মনে হলো আমার বুকের মাঝেও ওরকম একটা শাদা দাগ পড়েছে। মনে হচ্ছে আফ্রোদিতের ঈর্ষার শিকার হয়ে সাইকি এখন হিংস্র ভেড়ার লোম আনতে নদীর ধারে যাচ্ছে। সেখানে সাইকির জন্যে নল খাগড়া বুদ্ধিদাতা ছিল। কিন্তু ছন্দার কেউ নেই। ও বড় একলা।

ছন্দার কথার পিঠে রায়হান একটু বিনীত ভঙ্গিতে বলল, যে হাতে মানুষ খুন করেছি, তাকে আবার ভালবাসায় রাঙিয়ে তোমার দিকে প্রসারিত করেছি ছন্দা।

না। হয় না।

ছন্দার কণ্ঠ ভারী ও তাপহীন।

কেন হয় না? রায়হানের অসহিষ্ণু কণ্ঠ। যেসব কথা সবাই ভুলে গেছে, তাকে নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন?

সবাই ভুলতে পারে কিন্তু আমি ভুলিনি।

আমার মনে হলো ছন্দা যেন এক অলৌকিক স্থান থেকে দেবদূতের বাণীর মতো উচ্চারণ করল সে কথা। আমি থমকে ওর মুখের দিকে তাকালাম। বুঝলাম, রায়হান ভুল পথে এগুচ্ছে। ওর কোন আশা নেই।

ছন্দা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে নাকি?

তুমি তা ভাবতে পার। আমার মনে হয় না। সবার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি বলতে পার যে তুমি একটা খুনী?

শান্ত স্নিগ্ধ ছন্দার দৃষ্টিতে বারুদ ফেটে পড়ে। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল

যে বলি, আঃ সাইকি তুমি একটু চুপ করে থাক।

ততক্ষণে রায়হান টেবিল চাপড়ে বলে ওঠে, আমি যা নই, তা চিৎকার করে প্রতিষ্ঠিত করার কোন প্রয়োজন আমার নেই।

জোর করে অস্বীকার করতে চাইলেই কোন সত্যকে অস্বীকার করা যায় না।

বার বার তুমি একই কথায় ফিরে যাচ্ছ ছন্দা। অর্থহীন অবাস্তব কথা। শুধু এটুকু জেনে রেখো, তুমি যদি এমনিতে রাজী না হও তবে বুলেটের বিনিময়ে আমি আমার ভালবাসা আদায় করে নেব।

পারলে তাই নিও।

ছন্দার নির্লিপ্ত কণ্ঠে রায়হান ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে।

তুমি বুঝতে পারছ না আমাকে যে আমি কত রুঢ় এবং নিষ্ঠুর হতে পারি।

জানি। তুমি তা পার।

ছন্দা একদম উদাস হয়ে গেছে। ও যেন জোর করে রায়হানের অস্তিত্বকে অস্বীকার করতে চাইছে। রায়হান তখন থমথমে জেদী জোরালো কণ্ঠে বলল, ছন্দা যে লোককে তুমি বিয়ে করবে তাকে আমি খুন করব।

ছন্দা অস্ফুট আর্তনাদ করে। রায়হানের চোখে চোখ রেখে ফুঁপিয়ে ওঠে।

তুমি সব পার। সব পার।

আমার খুব বলতে ইচ্ছে করছিল যে, তুমি কেঁদোনা সাইকি। তুমি কেঁদো না। আমি তোমার মিশ্রিত শস্যের কণা বেছে দেব। আমি ঈগল হয়ে নির্দয় ঝরণা থেকে জল এনে দেব। তবু তুমি কেঁদো না, দোহাই লাগে কেঁদো না।

আস্তে আস্তে ছন্দার ফোঁপানী থেমে যায়। রেঁস্তোরায় একজনও খদ্দের নেই। রায়হানের পরিচিত জায়গা বলে বেয়ারারা কেউ এদিকে আসে না। নইলে একটা বিশ্রী ব্যাপার হতো। হঠাৎ করে ছন্দা টেবিলের ওপর থেকে ব্যাগটা নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়। রায়হানও উঠতে যাচ্ছিল আমি বাধা দিলাম।

ওকে যেতে দে রায়হান। ওর মাথা ঠাণ্ডা হোক।

রায়হান থমকে আমার মুখের দিকে তাকাল। আমি বিব্রতভাবে হেসে বললাম, সব ব্যাপারে জোর জবরদস্তি চলে না রায়হান।

উপদেশ দিস না জামেরী। জানিস, ছন্দা চলে যাবার পর আমার মনে হলো বুলেটের একটা গুলী অন্ধকারে ছুটে গেছে। সাঁই সাঁই করে কোথায় গিয়ে লাগলো, আমি তা ঠাহর করতে পারলাম না। কিন্তু আমি জানি, আমার হাতের নিশানা কখনো মিস হয় না।

তোকে একটু ঠাণ্ডা মাথায় এগোতে হবে রায়হান।

আঃ জামেরী তুই কেবল গুরুগম্ভীর মুরুব্বীর মতো উপদেশ দিতে শুরু করলি। আমি জানতে চাই, ছন্দাকে দেখে তোর কি মনে হলো ?

আমি মৃদু হাসলাম। বললাম, ছন্দা ভাল মেয়ে।

ধুত ! বোগাস ! রায়হান আমার ওপর রেগে গেল। দেখ জামেরী আমি সোজা সোজা কথা বুঝি। ভেতরে আবেগ আছে ভালবাসি। কিন্তু ভালবাসার তত্ত্বকথা বুঝি না। কথার মারপ্যাঁচ আমার ধাতে সয় না। এ জন্যে লেখক জাতটাকে আমি দুই চোখে দেখতে পারি না। চলি আমার কাজ আছে।

রায়হান আমাকে একরকম উপেক্ষা করেই বেরিয়ে গেল। সেজন্যে আমার কোন দুঃখ নেই। কারণ রায়হানকে সত্যি কথাটা আমি বলতে পারিনি। আমি বুঝেছি, ছন্দা কোনদিনই ওর হবে না। ছন্দার বুকের ভেতর শাদা আগুনের শিখা জ্বলছে। সে আগুন দেখা যায় না কিন্তু পুড়িয়ে মারে। কিন্তু ছন্দার মুখটা আমি ভুলতে পারলাম না। সেই নরম দীপিত সৌন্দর্য আমার স্নায়ুকে মাতাল করে রাখল। ওর জন্যে আমার দুঃখ হলো। সাইকি তুমি ভুল জায়গায় পড়ছে। রায়হানের হৃদয়টা নরকের চেয়ে বেশি ভয়ানক। ও সবসময় আগুন পোষে। হ্যাঁ বিশ্বাস করো আদুরে খরগোশের বাচ্চার মতো আগুন পোষে। তাকে যত্ন করে, খেতে দেয়, কোলে নিয়ে চুমু দেয়। তারপর দরকার মতো সে আগুনে যে কাউকে পুড়িয়ে মারে। সাইকি আমি বুঝতে পারছি তুমিও বাঁচতে পারবে না। তুমি স্বর্গীয় মেয়ে। স্বচ্ছতোয়া সরোবরে তোমার অবগাহন। আমি বুঝতে পারছি না তুমি কি করে পথ ভুল করলে। সাইকি বড় দুর্গম পথে এসে পড়েছ।

স্যার, যাবেন না ?

বেয়ারার ডাকে আমার চমক ভাঙে। আমি অপ্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে আসি। বাইরে ঠা ঠা দুপুর। মাথার ওপর ঝক্‌ঝকে রোদ। একটা বড় উপন্যাসে হাত দিয়েছি। মাথার ভেতর সেই ছকটা কাজ করছে।

পাশ দিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। হর্ণ বাজছে। প্রশস্ত রাজপথে আমি নির্বিকার দাঁড়িয়ে। যাবার জায়গা ঠিক নেই। দূরে গাছের মাথায় রায়হানের দৃষ্টির মতো ঝক্‌ঝকে রোদ। কার দিকে যেন রোষের দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বড় লাল বাড়িটার মাথায় দুটো কাক একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বসে। পায়ের নীচে গরমের ঝিঁঝিঁ বাজছে। এসব দৃশ্যের সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারছি না বলে বিরক্তি ধরছিল। অথচ ঝক্‌ঝকে রোদ আমার ভাল লাগে। একতরফা পক্ষপাতিত্বের ভাললাগা আর কি। সবকিছুর মধ্যেও উপন্যাসের ছকটা আমার মাথার ভেতর ট্রেনের মতো ছুটছে। লেখার কোন একটা ছক যখন আমি গ্রহণ করি, তখন সেটা সারাক্ষণ আমার মাথার ভেতর শীতল পাটির মতো বুনট হতে থাকে। খাবার সময়, বাথরুমে, কারো সঙ্গে কথা বলতে থাকলেও একটি উপমা, একটি শব্দ, একটি বিশেষ লাইন ঠিক আমার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাবে। উপন্যাসটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার রেহাই নেই। অন্য কিছু আর ভাবতে পারি না। অথচ দ্রুত লিখে যে শেষ করব, তাও হয় না। একটু একটু করে আমাকে লিখতে হয়। একসঙ্গে একটানা লেখা আমার ধাতে নেই।

হাঁটতে হাঁটতে গুলিস্তানের সামনে এলাম। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মিতুল ফল কিনছিল। আমি ওকে দেখে ভীষণ খুশী হলাম। এতক্ষণ বড় একঘেয়ে লাগছিল। আমি চুপচাপ ওর পেছনে দাঁড়িয়ে রইলাম। ও তখনো আমাকে দেখেনি। ফল কিনে এগুতেই বেণীতে মৃদু টান দিলাম। বিরক্ত হয়ে পেছন ফিরে আমাকে দেখেই ওর মুখটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

উঃ জামী, তুমি? আমি মনে মনে তোমাকেই খুঁজছিলাম।

কেন?

জানো, অফিসে একটুও ভাল লাগছিল না, তাই ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পথে বেরিয়ে মনে হলো, তুমি যদি কাছে থাকতে, কি যে ভাল লাগত!

মনে মনে বললাম, এজন্যেই তো তুমি আমার মিতুল। তোমাকে আমার শ্রাবণের বর্ষণমুখর রাত্রির মতো ভাল লাগে। তোমাকে সারারাত বুকের মধ্যে রেখে আমি বৃষ্টির গান শুনি।

জামী, তুমি কোথায় যাবে?

তোমার সঙ্গে।

চল, আমরা একটা রেঁস্তোরায় বসি।

ঘুরে ফিরে আমি আবার কাফে রেঁস্তোরায় এলাম। রেঁস্তোরাটা আমার ভাল লেগেছিল। নির্জন পরিবেশটা মিতুলেরও উপযোগী। রায়হানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম। রেঁস্তোরাটার খবর আমার জানা ছিল না। ছিমছাম পরিবেশে মিতুল খুশী হলো।

জায়গাটা বেশ ভাল জামী।

তোমার জন্যেই তো খুঁজে রেখেছি।

মনে মনে ভাবলাম, এখানে ঘন্টা দু'য়েক আগে একটা নাটক হয়ে গেছে। সাইকি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেছে। সে নাটকের শেষ পরিণতি এখনো মঞ্চায়নের অপেক্ষায়।

কি ভাবছ জামী?

কিছু না।

আমি ওর চোখে চোখ রেখে হাসলাম। মিতুলকে আজ খুব উচ্ছল দেখাচ্ছিল। ও কথায় কথায় হাসছিল। আমার খুব ভাল লাগছিল। মনে হলো ভেতরের সব একঘেয়ে ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে। 'মস্কো মাই লাভ' ছবির জাপানী নায়িকার কথা আমার মনে হলো। ঠিক সেই উচ্ছল ইউরকোর মতো লাগছিল মিতুলকে। আমি আর মিতুল দু'জনেই কয়েকবার সে ছবিটা দেখেছি। ছবির শেষে ইউরেকার মৃত্যু মিতুল সহ্য করতে পারত না। ওর চোখে জল চিক্‌চিক্‌ করত। আমি এই মুহূর্তে ওকে বলতে যাচ্ছিলাম ইউরেকার কথা। পরক্ষণে চেপে গেলাম। ইউরেকার কথায় মিতুলের মন খারাপ হয়ে যায়। আমি একবার ওকে ইউরেকার সঙ্গে তুলনা করেছিলাম। তখন ওর কালো চক্‌চকে্‌ চোখে আঁধার ঘনিয়েছিল। বলেছিল, ইউরেকা মারা গেছে জামী। আমিও কি মারা যাব? সেদিন আমি ভীষণ অনুতপ্ত হয়েছিলাম। আর কখনো ওকে একথা বলিনি।

জানো জামী, অফিসে বসে কিছুক্ষণ আগেও সমস্ত একঘেয়েমির বিরুদ্ধে মনটা বিদ্রোহ করেছিল। এখন তোমাকে দেখে আমার সব ক্লান্তি উবে গেছে। তুমি কি করে জানলে জামী যে, আমি মনে-প্রাণে তোমাকে চাইছিলাম? আমি ওর হাতটা মুঠোয় নিয়ে বললাম, মিতুল, তুমি

নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্রের কথা কি ভুলে গেছ? ঐ যে বস্তুর প্রতিটি কণা অপর প্রতিটি কণাকে আকর্ষণ করে। পৃথিবীই শুধু গাছের আপেলকে আকর্ষণ করে না, আপেলও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। এই ক্ষেত্রে তুমি হলে পৃথিবী আর আমি আপেল। কেননা তোমার আকর্ষণ ছিল প্রবল। সেজন্যে আমি বৃন্তচ্যুত হয়ে ছুটে পড়েছি।

যাঃ ফাজিল।

মিতুল আমার হাতটা টেনে নিয়ে গালে ঘঁষে।

মিতুল তুমি যেখান থেকেই আমাকে ভাব না কেন, টেলিপ্যাথির মাধ্যমে সে খবর আমার ইন্দ্রিয়ের কাছে এসে পৌঁছয়।

সব বানিয়ে বানিয়ে বলছ?

পাগল! তোমার কাছে বানিয়ে বলা মানেই তো নিজেকে ফাঁকি দেয়া। সে কি আমি পারি? আচ্ছা মিতুল, বল তো তোমাকে আমার এত ভাল লাগে কেন?

জানি না।

মিতুল চোখ নীচু করে। এই মুহূর্তে ও সম্পূর্ণভাবে আমার আশ্রয়ে। এখন ওর আর অন্য কোন মন নেই। মিতুল হঠাৎ অকারণে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল।

জানো জামী, এই দুপুরে তোমাকে না পেলে আমি ঠিক চন্দনার ওখানে যেতাম।

গিয়ে কি করতে?

কি আর, খানিকক্ষণ বক্‌বক্ করতাম। ওর বক্‌বকানি শুনতাম। নয়তো ক্যারাম খেলতাম।

বেয়ারা খাবার দিয়ে গেলো। মিতুল ওর অর্ধেকটা আমাকে উঠিয়ে দিল। আমি গালে হাত রেখে ওর দিকে শাসনের দৃষ্টিতে তাকালাম। ও জানে, খাবার নিয়ে ওর সঙ্গে আমার প্রায়ই রাগারাগি হয়। ও হেসে বলে, সত্যি বলছি জামী, আজ আমার একটুও খিদে নেই।

কোনদিন থাকে?

রোজই থাকে।

ও জোর করে হাসল।

আজ যদি তুমি পুরোটা না খাও, তবে আমি খাব না।

প্লিজ জামী জোর কোর না।

খাবই না।

মিতুল আবার ওর অংশটা নিজের প্লেটে উঠিয়ে নিল।

এবার খুশি তো?

একদম।

তোমার মতো লোক আমি দুটো দেখিনি।

তার মানে? কতজনের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে?

যাঃ!

মিতুলের মুখে বিব্রতের হাসি। আমিও জোরে জোরে হাসলাম।

ওকে ঘাবড়ে দিতে মাঝে মাঝে আমার ভাল লাগে। ওর সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে আমি ছেলেমানুষিভরা আবদার দেখতে পাই। শাসনও নয়, অনুযোগও নয় এমন এক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে।

রেঁস্তোরায় অনেকক্ষণ কাটিয়ে আমরা যখন বেরিয়ে এলাম, তখন পড়ন্ত বিকেল। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ও এক জায়গায় থমকে দাঁড়াল। আমার হাত আঁকড়ে ধরল। দেখলাম, ওর ঠোঁট কাঁপছে। আমি অবাক।

কি হয়েছে মিতুল?

ঐ ভদ্রমহিলাকে দেখ।

কৈ, কে?

ঐ যে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলা কিনছেন? পরনে সবুজ শিফন শাড়ি। হাতে শাদা ব্যাগ।

হ্যাঁ, দেখছি তো। কিন্তু চিনতে পারছি না।

আমার মনে হচ্ছে কী জামী, ঠিক আমার মা। হয়তো আমার মা এরকমই ছিলেন।

বুকটা আমার ভার হয়ে এলো। একটা কথাও বলতে পারলাম না। মিতুল প্রাণপণে ওর ঠোঁটটা কামড়ে ধরে আছে। মিতুল এখন আমার থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়েছে। ভদ্রমহিলা ততক্ষণে কলা কিনে একটা গাড়িতে উঠেছেন। গাড়ি চলে গেছে।

তোমার কি মনে হলো জামী?

মিতুল, চল আমরা বাসায় যাই।

আঃ জামী, বল না তোমার কি মনে হলো?

মিতুল, কেন নিজে নিজে কষ্ট পাচ্ছ?

মিতুল অদ্ভুত অভিমানী চোখে আমার দিকে তাকাল। ওর চোখ থেকে চোখ সরাতে পারলাম না। ওখানেই আমার দুর্বার আকর্ষণ। ওর চোখের আলাদা ভাষা আছে।

তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি জামী?

আমি একটা রিকশা ডাকলাম। আশপাশ দিয়ে লোকজন হাঁটছে। তারা আমাদের দিকে তাকাচ্ছে। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মিতুলের সঙ্গে কথা বলা বিপজ্জনক। রিকশায় উঠে ও আমার সঙ্গে একটা কথাও বলল না। বাসায় ফিরে দেখলাম, ওর বাবা-মা কোথায় যেন বেরিয়েছে। ওকে আমি আমার ঘরে নিয়ে এলাম। মিতুল চুপচাপ আমার বিছানার ওপর বসে রইল। আমি ওকে কাছে টানলাম।

মিতুল, লক্ষ্মীটি।

তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না জামী?

ও কান্নায় ভেঙে পড়ল।

উঃ জামী, বুকটা আমার কেমন ধড়ফড় করছে। হাত-পা অবশ লাগছে। আমি ওকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। লেবুর শরবত খাওয়ালাম। কিন্তু কিছু হলো না। দেখলাম, হাঁটু দুটো থরথর করে কাঁপছে। মিতুল ঠোঁট কামড়ে, চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। নিজের সঙ্গে ওর এখন একটা ভয়ানক যুদ্ধ হচ্ছে। আমি কি করতে পারি? কেমন করে আমি ওর কষ্টের ভাগ নিতে পারি? হঠাৎ আমার নিজের ওপর খুব রাগ হলো। কেন ও এমন করে আমার মধ্য থেকে বেরিয়ে যায়? ওকে আমি এক ঝটকায় খাটের ওপর বসিয়ে দিলাম। মিতুলের চোখে এখনো সেই অভিমানী দৃষ্টি। ওর কাঁধে হাত রাখতেই এক ঝটকায় নেমে গেল।

আমি জানি, তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না।

মিতুল বেরিয়ে গেল। আমি বাধা দিলাম না। এখন ওর নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার। সেটা করেই ও শান্ত হবে। ঘড়িতে দেখলাম সাতটা বাজে। আটটায় আমার অফিস। আমি ধীরে-সুস্থে জামাকাপড় পাল্টে নিলাম। চায়ের জন্যে ভীষণ পিপাসা। কিন্তু বানানোর ইচ্ছে নেই। বাইরে কোথাও খেয়ে নেব। পড়ার টেবিলের সামনে গিয়ে

বসলাম। উপন্যাস তিরিশ পৃষ্ঠা লিখেছি। পেছনের কয়েক পাতা পড়ে নিয়ে দু'পৃষ্ঠা লিখলাম। মনে হলো, কিছু হচ্ছে না। আবার কাটলাম। আবার লিখলাম। মিতুল, রায়হান, সাইকি সবার চরিত্রই অদল-বদল হয়ে আমার উপন্যাসে ভিড় করেছে। আমার ভেতরে তীব্র বিবমিষা। পৃষ্ঠাগুলো কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলে উঠে পড়লাম। ঠিকমত হচ্ছে না। তাই এখন আর লেখা উচিত না। যখন বুঝি যে, লেখা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, তখন আর লিখি না। জোর করে লেখার পক্ষপাতী আমি নই। সেজন্যেই আমার লেখা খুব ধীরে ধীরে এগোয়। একটা উপন্যাস শেষ করতে বছর গড়িয়ে যায়। আমার বন্ধু শরাফী একটানা লিখতে পারে। ও কয়েক ঘন্টায় একটা গল্প লিখে শেষ করে। ঐ ক্ষমতায় আমি ঈর্ষান্বিত হই। আমি কোনদিনই একটা গল্প অত অল্প সময়ে লিখতে পারব না। কাটাকুটি না করলে লেখা জমে ওঠে না। কোন কিছুতেই আমার তৃপ্তি হয় না। অতৃপ্তি আমাকে পথে পথে ঘোরায়। আমি নির্বিকার সে পথে ঘুরতে পারি। এক সময় উজ্জ্বল আলোর রেখা দেখা যায়। যতক্ষণ আলো না দেখি ততক্ষণ ঝড়ে পড়া নাকিবের মতো নিজেকে অসহায় মনে হয়। তখন বুঝি, শিল্প তার মাশুল উঠিয়ে নেয় পুরোপুরি। অনেক অনেক দিন ও রাতের ক্লান্তি স্নায়ুকে অবশ করে রাখে। মনটা ন্যাড়া বট গাছের মতো ডালে ডালে ফিসফিসায়। আমি তখন তীব্র বিবমিষায় ভুগি।

লেখা ছেড়ে জানালার কাছে এসে দাঁড়ালাম। বাইরে আলো জ্বলছে। বাতাসে ওড়া ঝরা পাতার মতো মেঘের দঙ্গল উড়ছে। ঝিকিমিকি তারার মেলা দূরের আকাশে। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে মিতুলের কথা মনে হলো। মিতুল এখন কি করছে? হয়তো শুয়ে শুয়ে কাঁদছে। বুকভরা কান্না। মাঝে মাঝে মনে হয় মিতুল অকারণে কষ্ট পায়। যে জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার কোন ক্ষমতা মিতুলের ছিল না, তাকে নিয়ে ওর সব দুঃখ। ও বুকের ভেতর দুঃখের পাহাড় গড়ে তুলেছে। মিতুলের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার ভীষণ ইচ্ছে হলো আমার। ঘরে তালা দিয়ে নিচে নেমে এলাম। দরজায় শব্দ করতেই ঝর্ণা দরজা খুলে দিল। ঝর্ণা মিতুলের ছোট্ট বোন। মিতুলের চাইতে অনেক ছোট। মাঝে একটা ভাই আছে ওদের। ঝর্ণা আমাকে দেখে হাসল।

সাতদিন আসেননি কেন, আগে তার উত্তর দিতে হবে?

সাতদিন? আমি তো অবাক।

হ্যাঁ, আমি গুনে রেখেছি। ফাঁকি দিতে পারবেন না জামেরী ভাইয়া?

উঃ বাব্বা, তুমি এত মনে রাখ ঝর্ণামণি।

আমি ওর বব চুলে হাত বুলোলাম।

বাসায় বুঝি কেউ নেই?

বাবা-ও নেই। মা-ও নেই।

তোমার আপু?

আপু আছে।

আচ্ছা ঝর্ণামণি আমি তো সাতদিন আসিনি, তার জন্য আমাকে একটা শাস্তি দাও।

কি?

তোমার নিজের হাতে এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে এস।

যাঃ, এটা কি শাস্তি?

হুঁ। কঠিন শাস্তি। যাও।

ঠিক আছে, যাচ্ছি।

শোন, ঐ ফুলির মা বানালে কিন্তু চলবে না।

আচ্ছা বাবা, আচ্ছা।

ঝর্ণা মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেলো। আমি চট্ করে মিতুলের ঘরে এলাম। ও বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে আছে। শরীরে কোন নড়াচড়া নেই। আমি ওর মাথায় হাত দিয়ে ডাকলাম।

মিতুল?

জামী তুমি?

মিতুল ওঠ। এমন করলে শরীর খারাপ করবে?

আচ্ছা জামী তোমার যে বাবা-মা, ভাই-বোন কেউ নেই তাতে তোমার খারাপ লাগে না?

আমার জন্যে তো তুমি আছ মিতুল। আমি তোমার মধ্যে বাবা মা ভাইবোন সবার স্পর্শ পাই।

আমি কেন পাই না জামী? আমার জন্যে তো তুমি আছ। বল জামী আমি কেন পাই না?

মিতুল চলো আমরা বাইরে থেকে ঘুরে আসি।

না জামী থাক। আমি এখন একটু একা থাকব। তোমার অফিস আছে না? তুমি যাও।

মিতুল আবার বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে পড়ে। আমি বৈঠকখানায় ফিরে আসতেই ঝর্ণা চা নিয়ে এল। সেইসঙ্গে পাঁপড়ভাজা।

বাঃ তুমি তো বেশ লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে গেছ।

জানেন ভাইয়া, আমি এখন অনেক কিছু রাঁধতে পারি।

তাই নাকি? একদিন এসে তোমার রান্না খেতে হবে।

হ্যাঁ, মাকে বলবেন। মা বলে দেবেন কোনদিন খাবেন।

আমি হাসলাম। ঝর্ণা মিতুলের একদম উল্টো। ও একটা গৃহী মেয়ে হবে। মিতুলের মতো দুঃখ পুষে ছুটে ছুটে বেড়াবে না। অবশ্য মিতুলের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা ঝর্ণার নেই। ঝর্ণার মা আছে। ও মায়ের ভালবাসা পায়। সুস্থ স্বচ্ছন্দ জীবন। তাই ঝর্ণা ঝর্ণাধারার ছোটা হয়ে তড়বড়িয়ে বাড়ছে। আমার চা খাওয়া শেষ না হতেই মিতুলের বাবা-মা এলেন।

এই যে জামেরী এতদিন পরে যে? মাথার ওপরে থাক অথচ তোমার পাত্তাই পাওয়া যায় না?

বেশি এলে আবার বিরক্ত হবেন খালাআম্মা।

ছিঃ ছিঃ কি যে বল। তুমি আমাদের ছেলের মতো।

জামেরী এখন বড় লেখক হয়েছে গিন্নী ওর কি আর সবসময় আমাদের এখানে আসার সময় আছে।

কি যে বলেন—

আলী আহমদ সাহেবের কথায় আমি ভীষণ বিব্রত অবস্থায় পড়লাম। আমার গলায় চা আটকে গেল। কোনরকমে কাশি চাপলাম। আমি এমনিতে একটু লাজুক চরিত্রের। বেশী আন্তরিকতায় হিমশিম খাই।

মিতুলের বাবা মা দু'জনেই বসলেন। আমি ভেবেছিলাম চা শেষ করেই কাটব। কিন্তু হবে না। অন্তত কিছুক্ষণ কথা বলতে হবে। আমি বলতে না চাইলেও ওরা বলিয়ে ছাড়বেন।

তোমার কাজকর্ম কেমন চলছে বাবা?

ভালই।

এই রাতের চাকরিটা বড় বিশ্রী ব্যাপার না?

আমার তো ভালই লাগে।

হ্যাঁ আস্তে আস্তে সবকিছু ভাল লেগে যায়।

মিতুলের বাবা মস্ত এক হাই তুললেন। আড়মোড়া ভাঙলেন। একটা সিগারেট জ্বালালেন। সেই ফাঁকে ঝর্ণা কথা বলা শুরু করলো।

জানো মা, আমি না আজ জামেরী ভাইয়াকে চা করে দিয়েছি।

ঝর্ণা একদম পাকা গিন্নী হয়েছে খালাআম্মা। ও নাকি রাঁধতেও শিখেছে।

হ্যাঁ কিছু কিছু শিখেছে। কালতো রোববার তুমি দুপুরে আমাদের এখানে খাবে।

না খালাআম্মা কাল থাক। আমি কখন কোথায় থাকি, তার ঠিক নেই।

উঁহু না করা চলবে না। একা একা থাক কি রাঁধ, কি খাও আল্লাই জানে। কাল দুপুরে চলে আসবে।

মিতুলের বাবার মৃদু ধমকে আমি আর কিছু বলতে পারলাম না। মাথা নেড়ে সায় দিলাম। চা শেষ করে বেরিয়ে এলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়েই শুনলাম মিতুলের বাবার কণ্ঠ।

ঝর্ণা, মিতু কই রে? দেখছি না যে?

আপুর মাথা ধরেছে। শুয়ে আছে।

আমি আর দাঁড়ালাম না। হাঁটতে হাঁটতে আমার মিতুলের বাবার জন্যে দুঃখ হলো। ভদ্রলোক জানে না যে, তিনি নিজেই মিতুলের কাছে মাথা ধরার মতো যন্ত্রণা। এখন যদি তিনি মিতুলের কাছে গিয়ে দাঁড়ান ও বিরক্ত হবে। ঐ যন্ত্রণার ফলেই যখন তখন মিতুলের শরীরের যে-কোন একটা যন্ত্র বিগড়ে যায়। তখন ও কষ্ট পায়। ঐ কষ্টের ছটফটানির সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। মিতুল বলে আমার যখন কষ্ট হয় তখন মনে হয় জামী কে যেন আমাকে জোর করে ইলেকট্রিক শক্ দিচ্ছে। আমি প্রাণপণে চিৎকার করছি অথচ কেউ শুনতে পাচ্ছে না। আমি জানি মিতুলের মধ্যে অনেক স্বপ্নবিলাসী ভাবালুতা আছে। সে ভাবালুতা ওর ক্ষতি করে। মিতুল সেটা বুঝতে চায়না। মাঝে মাঝে আমার আশংকা হয় এ ধরনের স্নায়বিক অত্যাচারের শিকার হয়ে ও হয়তো কোনদিন বড় ধরনের অসুখে পড়তে পারে। আমি তাড়াতাড়ি অন্য চিন্তায়

চলে যাই। এ ধরনের আশংকাকে প্রশ্রয় দিতে ভাল লাগে না।

রাতের বেলা ফুটপাথ ধরে হাঁটা আমার ভীষণ পছন্দ। সাঁই সাঁই করে চলে যাওয়া যানবাহন আমার কাছে রহস্যময় যাদুকর। এই চলে যাওয়ার ভেতরে কি যেন আছে। কি যেন একটা নতুন ঢঙ। যেটা জীবনের সব ব্যর্থতার গ্লানিকে সঙ্গে নিয়ে উধাও হতে পারে। কখনো কখনো আমি আলো-আঁধারে দাঁড়িয়ে এই চলে যাওয়া দেখি। দেখে দেখে নিজের মধ্যে শক্তি সঞ্চয় করি। আমার মনে হয় আমার ভেতরে শক্তি আছে। আমি উপন্যাসের একটা দিকবদল ঘটাতে পারব। দুর্বল মুহূর্তে যখন বিশ্বাস হারাই তখন আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত তত্ত্ব আমার মাথায় ভর করে। তিনি বলেছিলেন, পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং শক্তিকে পদার্থে পরিবর্তিত করা যায়। সূর্য পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করে। এভাবে সে বহুকাল ধরে আলোক বিকিরণ করে এসেছে এবং ভবিষ্যতেও কোটি কোটি বছর ধরে তা করতে থাকবে। সূর্য যদি তার জ্বালানি পুড়িয়েই জ্বলতে থাকতো, তাহলে অনেক আগেই তা ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। আমরা যারা নিজস্ব জ্বালানিই কেবল পোড়াই তারা ব্যর্থতা আর হতাশায় ভুগি। পরিণামে ব্যর্থ সাহিত্যিক হয়ে মৃত্যুর মাঝে যন্ত্রণার জ্বালা জুড়াই। আমাদের দরকার সেই নিয়মটা শেখা যেটা পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। ক্রমাগত পরিবর্তন এবং পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে না এগুলে নিভে ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। নিজেকে ভেঙেচুরে, নিরন্তর পড়াশোনা এবং পরিশীলিত অভিজ্ঞতার পদার্থকে শক্তিতে রূপান্তরিত করতে হবে। প্রতি মুহূর্তে এ কাজটা করা চাই। নইলে ব্যর্থতা অনিবার্য। নিষ্ঠুর মাস্টারের মতো চাবুক হাতে নিজেকে শাসন করি। নিজেকে শাসন করতে আমার ভাল লাগে। আমি বিরক্ত হইনা। কেননা আমি সাহিত্যের সে ধরনের জঞ্জাল হতে চাই না যাকে ঝেঁটিয়ে দূর করার জন্যে হাজার ঝাঁটা মুখ উঁচিয়ে থাকে।

সে রাতে অফিসে পৌঁছুতে আমার দেরী হয়ে গেলো। ডেস্কে বসেও মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে পারলাম না। বারবার আনমনা হই। একবার ছুটে গেলে লাগাম টানা বড় মুশকিল। আমার তৃতীয় বইটা প্রেসে। প্রকাশক একগাদা প্রুফ পাঠিয়েছে। সময়ের অভাবে প্রুফ দেখতে পারিনি। প্রকাশক তাড়া দিয়েছে। বেশ কড়া ভাষায় চিঠি লিখে রেখে গেছে।

অফিসের কাজটা দায়সারা গোছের শেষ করে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম। আজ রাতে প্রুফগুলো দেখে শেষ করতেই হবে আমার।

তিন

আজ আমার ছুটি। কাল সারারাত জেগে প্রুফ দেখেছি। ঘুমিয়েছি প্রায় শেষ রাতের দিকে। মাথাটা টন টন করছিলো। চোখে ব্যথা। ভাল ঘুম হয়নি। সকালেই ঘুম ভেঙে গেলো। উঠতে ইচ্ছে করছে না। ইউক্যালিপটাসের পাতার ফাঁক গলিয়ে আলো এসেছে ঘরে। এই গাছটা আমার বাবা লাগিয়েছিলেন। ইউক্যালিপটাস তাঁর প্রিয় ছিল। তিনি আরো তিনটে চারা লাগিয়েছিলেন, সেগুলো বাঁচেনি। আমার মনে হয় ইউক্যালিপটাসের ঋজু দৃঢ়তা বাবার ভাল লাগতো। সেটা আমারও ভাল লাগে। মনে মনে হাসলাম। আসলে আমি নিজের ভাললাগাটা বাবার ওপর চাপাতে চাচ্ছি। অনেক সময় এ প্রক্রিয়ায় আমরা নিজেদের মধ্যে শান্ত্বনা খুঁজে বেড়াই। ইউক্যালিপটাসের যে ডালটা জানালার দিকে ঝুঁকে আছে, সেখানে একটা দোয়েল এসে বসলো। ক'দিন ধরে দেখছি দোয়েলটা প্রায় এই ডালে এসে বসে। বেশ খানিকক্ষণ নাচানাচি করে। আপন মনেই নাচে। শাদাকালো এই ছোট্ট পাখিটার আর কোন সঙ্গি নেই। কেন যে ও এই ডালটা পছন্দ করলো, সেই জানে। তবে আমার জন্যে ও একটা চমৎকার আনন্দ।

দরজায় শব্দ হলো। আওয়াজে বুঝলাম রায়হান। দরজা খুলতেই হাসলো।

আজকে জেগেই আছিস দেখছি?

তুই কি আমাকে একটা ঘুমের ডিম ভেবেছিস?

তা নয়। আসলে তুই নিশাচর পাখি কিনা। যতো কাজ তোর সব রাতে।

আমি হাসলাম। রায়হানের মেজাজটা ভাল মনে হলো।

আজ চা বানাসনি?

না। উঠলামইতো এইমাত্র। তুই না এলে স্রেফ বারটা পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে কাটাতাম। শুয়ে থাকার মতো আর কিছু আরাম নেইরে।

আমি ঠিক উল্টো। শুয়ে থাকতে বাজে লাগে। সারাক্ষণ কাজ চাই। কাজের শেষে ফুর্তি চাই। বাস। রায়হান অকারণে হো হো করে হাসলো। হাত উল্টে গা ঝাঁকালো। শিস বাজালো।

আজ খুব ফুর্তিতে আছিস মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ আমি একটা সিদ্ধান্তে এসেছি জামেরী।

কেমন?

বুলেটের বিনিময়ে ভালবাসা চাই।

কি বলছিস রায়হান?

বোস। বোস। অত ব্যস্ত হোস না। এখুনি তো আর কিছু করছি না। রায়হান পায়ের ওপর পা ওঠালো। সিগারেট জ্বালালো একটা। আমাকেও দিল। আমার হাতের আঙুল কাঁপছিলো। ভেতরে উত্তেজনা। সাইকির মুখটা বুকের সঙ্গে লেপ্টে আছে। হঠাৎ বলে ফেললাম, সাইকি কিন্তু চমৎকার মেয়ে রায়হান?

সাইকি? ও ভুরু কোঁচকালো।

নিজের ভুল বুঝে লজ্জিত হলাম। তাড়াতাড়ি বললাম, কি যেন নাম আমি ভুলে গেছি?

ছন্দা।

ও হ্যাঁ হ্যাঁ ছন্দা। ছন্দা কিন্তু--

শোন জামেরী, ও আমাকে থামিয়ে দিল। আমি বাজি ধরেছি। নিজের সঙ্গে বাজি। ছন্দাকে আমার চাই। ছন্দা ছাড়া আমার সব মিথ্যে। অনেকে যে কথা ভুলে গেছে, ছন্দা তা মনে রেখেছে। ও প্রতিদিন সে কথাগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করে। হৃদয়ের দোলনায় ঘুম পাড়ায়। বুকের মধ্যে ভীষণ অসুখ বানিয়ে রাখে। ছন্দা কেন ভুলে যেতে পারে না সবকথা? কি এমন শক্তি ওর মধ্যে কাজ করে? এখন ওর বুকের বাংকারে পড়ে আছে একটা লাশ। সে লাশের পচা দুর্গন্ধে আমার ভালবাসার সৌরভের কোন মূল্য নেই। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা ছন্দার বুকের বাংকারে শুধু আমি থাকব। শুধু আমি। আর কেউ না। কোন লাশ না। ফুলে ফুলে ঢেকে রাখব সে লাশের মাংসাশী অস্তিত্ব। যে জিনিসে আমার লোভ তার

থেকে আমি কোনদিন ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসিনি। আসব না। ছন্দা জানে না কি ভীষণ প্রতিজ্ঞা শত্রুর পুঁতে রাখা মাইনের মতো পুঁতে রেখেছি।

একটু থেমে রায়হান সিগারেটে জোর টান দিল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে আমার ঘরে পায়চারী শুরু করলো। আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। সূর্য তখন ইউক্যালিপটাসের মাথার ওপর। দোয়েলটা কখন চলে গেছে টের পাইনি। আমার বুকে চায়ের পিপাসা। কিন্তু রায়হানের মুখের দিকে তাকিয়ে চলৎশক্তির কথা ভুলে যাই আমি। কোন কালে হাঁটা-চলা করতে পারতাম কিনা সে কথা মনে পড়ে না। একটা পঙ্গু জীবের মতো মনে হচ্ছে নিজেকে। নিজের ওপর রাগ হলো। চেঁচিয়ে বললাম, জোর করে ভালবাসা পাওয়া যায় না রায়হান।

বাজে কথা। ঐ পচা কথার বুলি অনেক আগে শেষ হয়ে গেছে। বর্তমানের আণবিক যুগে আমি আণবিক ভালবাসা চাই জামেরী।

রায়হান আমার মুখের ওপর ঠা ঠা হাসতে লাগলো। ওর হাসির একটা নিজস্ব ধরণ আছে। ঐ একই ভঙ্গিতে ও সব সময় হাসে। সে হাসি অনেক সময় আমার কানে ঝিঁ ঝিঁ ধরিয়ে দেয়। আসলে সাইকির জন্যে আমার কিছু করার নেই। ওরা দু'জনেই নিশির ডাকে ধ্বংসের পথে যাচ্ছে। কে ওদের ঠেকাবে?

আমি জানি জামেরী তুই সেদিন বুঝেছিস যে ছন্দা আমার হবে না। তোকে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম এজন্যে যে, হয়তো তুই ছন্দাকে আমার হয়ে কিছু বোঝাতে পারবি। জানি তুই তাও করবি না। তোদের মতো লেখকদের আমি এজন্যে কাপুরুষ বলি। তোরা একটা কথাই বুঝিস যে, মনের ওপর জোর চলে না। যারা দুর্বল তাদের পিছু হটতে হয় বলে ও ধরনের কথা বানায়। কিন্তু আমি অতো দুর্বল নই। নিজের দাবীতে অবিচল থাকাই আমার নীতি। পিছু হটাকে আমি ঘৃণা করি।

ধ্বংসের পথে গৌরব নেই রায়হান।

তোকে উপদেশ দিতে হবে না। তোর ওপর মাঝে মাঝে আমার প্রচণ্ড ঘৃণা হয় জামেরী। তবু তোর সঙ্গ আমি ছাড়তে পারি না। তোর মধ্যে কি যেন একটা আকর্ষণ আছে।

সেটা আমার শুভবুদ্ধি রায়হান। এজন্য বিবেকতাড়িত হয়ে তুই বারবার এখানে ছুটে আসিস।

জানি না। হবে হয়তো।

রায়হান হতাশ ভঙ্গিতে হাত ওল্টালো। পরক্ষণেই আমার বিছানার ওপর বসে পড়লো। বুঝলাম ওর উত্তেজনা অনেক কমেছে। তবে সেটা বড় ক্ষণিকের।

চা খাবি রায়হান?

না। প্রচুর নাস্তা করে বেরিয়েছি। এক্ষুনি যেতে হবে। অন্যত্র একটা কাজ আছে।

রায়হান, তুই মিতুলের মা-কে চিনিস?

হঠাৎ এ প্রশ্ন?

আমার কাজ আছে। চিনিস কিনা বল?

দেখেছিলাম অনেক আগে। এতদিনে কি আর চেহারা মনে আছে?

কোথায় থাকে জানিস?

না।

ভীষণ মুশকিল। তার ঠিকানাটা আমার দরকার।

তোর মতলব কি বলতো?

জানিসতো আমি লেখক। লেখার উপাদান খুঁজে বেড়াই সব সময়।

তাই বল।

রায়হান হো হো করে হাসলো। আমি রায়হানের কাছে আসল কারণটা চেপে গেলাম। মিতুলকে ও পছন্দ করে না। মিতুলের বাবা-মার কাছে কিছু লাগালে হয়তো একটা সাংসারিক অসুবিধা হতে পারে। বিশেষ করে মিতুলের বর্তমান মা ব্যাপারটা হয়তো খুব সুনজরে দেখবে না। মিতুলকে অযথা সন্দেহ করবে। খিটিমিটি বেধে উঠবে। বুঝতে চাইবে না মিতুলের কষ্ট কোথায়।

ঠিকানা বের করার একটা উপায় আছে জামেরী?

কি?

ভদ্রমহিলা যে স্কুলে চাকরি করতেন, সেখানে গিয়ে খোঁজ করে দেখা যায়।

তুই আমার এ উপকারটা করবি রায়হান?

স্কুলটা আমি চিনি। খোঁজটা এমন কিছু কঠিন কাজ হবে না। চল দুজনে একদিন গিয়ে খোঁজ করে দেখি।

ঠিক আছে। তাই চল।

আমি আগামীকাল চিটাগাং যাচ্ছি একটা কাজে। সাতদিন পর ফিরে এলে তোকে নিয়ে বেরুবো। চলি এখন।

রায়হান চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। ও এলে আমার ভেতরে উৎকণ্ঠা পাথরের মতো জমতে থাকে। আমি ওর সামনে ঠিক ততোটা সহজ হতে পারি না। সেদিনের সেই ঘটনা আর সাইকির মুখটা মনে হতে থাকে। কেবলই মনে হয় রায়হান আমার জন্যে একটা দুঃসংবাদ নিয়ে আসবে। যে-কোন দিন যে-কোন মুহূর্তে সে ঘটনাটা ঘটতে পারে। বেলা অনেক হয়েছে। আমি তড়িঘড়ি উঠে পড়লাম। ছুটির দিনটা আর শুয়ে শুয়ে নষ্ট করতে চাই না। হাত-মুখ ধুয়ে চা খেয়ে লেখার টেবিলে এলাম। মাথার ভেতরে চল নেমেছে। এখন আমি একটানা কয়েক ঘণ্টা লিখে যেতে পারব। ফ্লাস্ক ভর্তি চা নিয়ে বসেছি। লেখা-পাগল বালজাক সারারাত লিখতেন আর কফি খেতেন। সেই কালো কফি পরবর্তী জীবনে তার কাল হয়েছিল। আমার অবশ্য সে ধরনের ভয় নেই। বালজাকের মতো আমি অমন রাতদিন লিখতে পারি না। আজকে বসার পরই না থেমে আমি একটানা বারো পৃষ্ঠা লিখে ফেললাম। লিখে আমার মনটা ভীষণ খুশী হয়ে গেলো। একটা চমৎকার অংশ লিখতে পেরেছি বলে বিশ্বাস হলো। মাঝে মাঝে এমন কিছু ভাল শব্দ লিখি, যার জন্যে খুশীর অন্ত থাকে না। তখন মনে হয় শিল্পের গোলকধাঁধার পথ চলতে পারছি। গোলকধাঁধাটা বড় নির্মম। পাষণ্ডের মতো আচরণ করে। একটুও ক্ষমা নেই। লিখতে লিখতে মেজাজ বিগড়ে গেলো। লেখাটা এখন আর ঠিকমতো এগুচ্ছে না। লেখা থামিয়ে পেছনের দিক থেকে পড়তে শুরু করলাম।

তখন মিতুল এলো। দরজা খোলাই ছিল। ও ঢুকে দরজা বন্ধ করে আমার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো।

আমি মনে মনে তোমাকেই চাইছিলাম মিতুল। একটানা লেখার পর মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে।

আমি ওর হাতটা কপালে রাখলাম।

কি লিখছিলে?

উপন্যাস।

নায়ক কে?

কেন আমি?

আর নায়িকা?

তুমি বল দেখি কে?

সত্যি বলব? তাহলে এই মিতুল।

ঠিক। তুমি যে কেমন করে সবকিছু টের পাও?

একদম সোজা।

কেমন?

আমার দিকে তাকালে তোমার চেহারা বদলে যায়। তখন আমি সব বুঝি।

তাই নাকি?

আমি ওকে বুকের ওপর নিয়ে এলাম। পরিশ্রান্ত স্নায়ুতে মিতুলের স্পর্শ অমৃতের মতো। জানি না অমৃত কেমন। দেবতা তো আর হইনি। কিন্তু আমি বুঝি মিতুল মানেই অমৃত। মিতুলের মদির ঠোঁটে এমন কোন সুরা নেই, যা আমি পাই না। সে অমৃত আমাকে অনন্ত যৌবনের যাদুকরী ক্ষমতা দেয়। আমি ভুলে যাই বার্ধক্যের কথা, জরার কথা, মৃত্যুর কথা। আমার সামনে তখন একটা প্রশস্ত রাজপথ। যে পথে হাজার হাজার মাইল হাঁটলেও জরা এসে হালুম করে ঘাড়ে চাপে না। ক্লান্তি সিন্দবাদের বুড়ো হয় না।

আমি আর মিতুল অনেকক্ষণ শুয়ে থাকলাম। একসময় মিতুল জিজ্ঞেস করলো, তোমার মাথাটা এখন কেমন করছে জামী?

মাথার কথা ভুলে গেছি।

বলছিলে না ঝিমঝিম করছিল?

আঃ মিতুল আমি সবকিছু ভুলে গেছি। আমি এখন জিউসের মতো ইদা পর্বতের ঘাসের শয্যায় শুয়ে আছি। দেবী হিরি ঘুম দেবতার কাছ থেকে আমার জন্যে ঘুম চেয়ে নিয়ে এসেছে। আমার সামনে আর কোন ট্রয়ের যুদ্ধ নেই।

জেগে উঠে যখন দেখবে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেছে?

তখন জিউসের মতো ভীষণ রেগে উঠব।

মিতুল খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বালিশে ছড়ানো মিতুলের একরাশ

চুলের মধ্যে আমি মুখ গুঁজে রাখি। মিতুল এলেই আমি ওর চুল খুলে দেই। খোঁপা, বেণী কিছু আমার ভাল লাগে না। রাশি রাশি চুলের প্রপাত আদিম বুনো অরণ্যের গন্ধে আমাকে মাতাল করে।

একসময় মিতুল হঠাৎ করে উঠে বসে, জামী কাল রাতে আমি একটা ভীষণ বাজে স্বপ্ন দেখেছি।

কি ?

দেখলাম কারা যেন আমার হাতে-পায়ে শিকল বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা আমাকে ভীষণ উঁচু এক পর্বতের মাথায় ফেলে রেখে আসে। আর তখুনি এক ভয়ানক ঈগল সাঁই সাঁই করে ছুটে আসে আমাকে খুবলে খাবার জন্যে। উঃ আমি যা ভয় পেয়েছিলাম জামী।

মিতুলের স্বপ্নের কথা শুনে আমার শরীরের এতক্ষণের রগরগে অনুভূতি একদম থিতিয়ে যায়। আমি মুখ খুলতে পারি না। মনে হয় বেশ অনেকদিন আমি এ স্বপ্নটা দেখিনি। স্বপ্নের কথা আমার মন থেকে প্রায় মুছে গিয়েছিলো।

তুমি কিছু বলছ না কেন জামী ?

ওসব কিছু না। স্বপ্নটা একটা বাজে ব্যাপার।

কিন্তু স্বপ্নটা আমাকে একদম—

এসব খারাপ জিনিস নিয়ে চিন্তা করতে নেই মিতুল। চিন্তা করলে মন খারাপ হয়। মন খারাপ হলে আর কিছুই ভাল লাগে না। কেবল মরতে ইচ্ছে করে।

ঠিক বলেছ। মিতুল সোৎসাহে বলে।

তাহলে তুমি আর এসব নিয়ে ভাববে না ?

একটুও না।

মিতুল আবার আমার পাশে শুয়ে পড়ে। শুয়ে শুয়ে আমরা একসঙ্গে ইউক্যালিপটাসের পাতার ফাঁকে আকাশ দেখি। সেই দোয়েলটা আবার আসে। জানালার পাশের ডালে নাচানাচি করে। এ ডাল ও ডাল। এ পাতা ও পাতা। আর কোনকিছুতে ওর কোন খেয়াল নেই। ও আমাদের কথাও ভুলে গেছে। আমার মনে হলো আমি আর মিতুলও আজ পারিপার্শ্বিকের কথা ভুলে গেছি। এখন কেবল ঐ নাচানাচিটাই সম্বল। কেবল আপন মনে, আপন ছন্দে নাচা। অন্য কোন মুদ্রা নয়। নিজস্ব নিয়মের

মুদ্রা। মিতুল খিলখিলিয়ে হাসলো।

পাখিটার কাণ্ড দেখেছ?

আমি যখন আনন্দে থাকি, তখন ও আসে মিতুল।

তাই নাকি? তাহলে ও তোমাকে ভালবাসে।

তোমার চেয়ে বেশি না।

কেমন করে বুঝলে? দেখছ না ও কতভাবে নিজেকে প্রকাশ করছে। ওরকম করে আমি নিজেকে প্রকাশ করতে পারি না।

মিতুলের কন্ঠ কেমন মিইয়ে আসে। লক্কর ঝক্কর গাড়ির চাকার মতো ঘড়ঘড় শব্দ ওর কন্ঠে। চোখে পলকা ছায়া। আমি বুঝলাম মিতুল আমার মধ্যে থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ও এখন চুপ হয়ে গেছে। কোনদিকে দৃষ্টি বোঝা যায় না। আকাশের গায়ে ছাই ছাই আভাস। ইউক্যালিপটাসের ডালে দোয়েলটা আর নেই। কখন উড়ে গেছে কেউ টের পাইনি। আমি মিতুলকে উঠিয়ে দিলাম।

মিতুল আজ না আমি তোমাদের ওখানে খাব?

ও মাথা নাড়ল।

কি রাঁধছ?

জানি না। মা আর ঝর্ণা জানে।

আমি খাব আর তুমি বুঝি কিছু জান না?

রান্না-বান্না আমার ভাল লাগে না জামী।

বেশ তাহলে আমি যাব না।

হুঁ, যাবে না বললেই আর হলো। ঠিক আছে তোমার জন্যে আমি একটা কাজ করব।

কি?

খাবার টেবিলে ফ্লাওয়ার ভেসে ফুল দেব।

তাই দিও। তার আগে একটা কাজ আছে মিতুল।

কি?

এক ফ্লাস্ক চা।

উঃ কত চা যে তুমি খাও।

মিতুল স্টোভ জ্বালিয়ে চায়ের জল চাপালো। আমি প্রুফ কাটতে বসলাম। বইটার চার ফর্মা ছাপা হয়েছে। আরো পাঁচ ফর্মার মতো হবে।

আমার তৃতীয় উপন্যাস। নাম দিয়েছি 'সরোবরে ঘোলা জল'। নামটা অবশ্য আমার খুব একটা পছন্দ নয়। তবে শরাফী খুব পছন্দ করে। আমি বদলাতে চাইলে ও প্রবল আপত্তি করেছিলো। সেজন্যে আর বদলানো হয়নি। মিতুল আমাকে চা দিয়ে চলে গেলো। আমি প্রুফ কাটি। হাওয়ায় দরজার কড়া নড়ে। টুংটাং শব্দ হয়। মাথার ভেতর উপন্যাসের প্লটটা টেলিগ্রাফের তারে বসে থাকা দূরের পাখিটার মতো মায়াবী হয়ে যায়।

কতক্ষণ সময় পার হয়েছে জানি না। শুনলাম নীচ থেকে ঝর্ণা ডাকাডাকি করছে। অর্থাৎ খাবার রেডি। আর একটু দেখলে কাজটা শেষ করতে পারি। তাই উঠতে ইচ্ছে করছিল না। তবুও গায়ে শার্ট চাপিয়ে নেমে এলাম। ঘরে ঢুকে দেখলাম আলী আহমদ সাহেব পায়ের ওপর পা উঠিয়ে চুরুট টানছেন।

এই যে বাবা আজকে আবার কোথাও বের হওনি তো?

না।

আমি কোণার সোফায় বসলাম। সেদিনের পত্রিকাটা হাতে নিয়ে চোখ বুলোতে লাগলাম। মনে হলো, এ বাসায় এখন আমার কোনকিছু করার নেই। আমার ভূমিকা নিষ্ক্রিয় দর্শকের। এমন একটা ছবি এখানে চলছে, যেখানে আমি কোন যোগসূত্র খুঁজে পাচ্ছি না। কেবল অবসাদ। কেবল হাই তোলা। ঝর্ণা টেবিলে খাবার সাজাচ্ছে। ওদের ভাই মিন্টু মোটা ফ্রেমের চশমার আড়ালে রেডিওর নব ঘুরাচ্ছে। সেটাও আমার জন্যে বিরক্তিকর। কিছুক্ষণ পর মিতুলের মা এলেন।

চলো, খাবার দিয়েছি।

আমি আর মিতুল মুখোমুখি বসলাম। দেখলাম টেবিলের ফ্লাওয়ার ভেসে একগাদা নানা ধরনের ফুল। একটা টকটকে লাল গোলাপও আছে। ফুলের দিকে তাকিয়ে মিতুলের সঙ্গে আমার চোখাচোখি হলো। ওর ঠোঁটের কোণে খুবই সরু হাসির রেখা। হঠাৎ আলী আহমদ সাহেব বললেন, টেবিলে তো জায়গা কম, ফ্লাওয়ার ভেসটা অন্য কোথাও রাখ।

মিতুল আমার পায়ে চাপ দিল।

আমি বললাম, থাক না ওটা। বেশ ভাল লাগছে কিন্তু।

ও তাইতো, তুমি তো আবার লেখক। ফুলটুল একটু বেশি ভালবাস। আলী আহমদ সাহেব হো হো করে হাসলেন। মিন্টু গম্ভীর মুখে খাচ্ছে।

মিতুলের দৃষ্টি প্লেটে। খালাআম্মা সবাইকে তুলে দিচ্ছেন।

জামেরী ভাইয়া চিতল মাছের এই কোফ্তাটা কিন্তু আমি করেছি।

সত্যি? ভীষণ মজা হয়েছে।

আরো দু'টো দেই?

দাও।

ঝর্ণার মুখটা আনন্দে ঝলমল করে উঠলো।

সত্যি ঝর্ণা মামণি এমন রেঁধেছে না, মনে হচ্ছে এমন খাবার কোনদিন খাইনি।

আলী আহমদ সাহেবের কথায় সবাই হেসে উঠলো।

বাঃ সবাই হাসছে কেন? আমি খাব না।

বোকা মেয়ে বুঝতে পারছ না যে, আমরা সবাই খুশীতে হাসছি। সত্যি খেতে আমাদের খুব ভাল লাগছে।

আমার কথায় ঝর্ণার উত্তেজনা কমলো। ও খাবারে মনোযোগী হলো।

তোমার লেখা-টেখা কেমন চলছে জামেরী?

ভালই।

চমৎকার হাত তোমার। তবে তোমার প্রথম বইটার চাইতে দ্বিতীয় বইটা আমার বেশি ভাল লেগেছে।

আমার একটাও ভাল লাগেনি।

মিন্টু গম্ভীর গলায় বললো। আমি হাসলাম।

আমার মনে হয় আপনার লেখা খুব আড়ষ্ট। অযথা পেঁচিয়ে ফেলেন। বুঝে উঠতে কষ্ট হয়।

অতটুকু ব্রেন খাটাতে না হলে লেখা পড়ে আনন্দ নেই মিন্টু।

না বাবা আমি মানি না। আমি চাই স্বচ্ছ লেখা। যেটা এক নিঃশ্বাসে টেনে নিয়ে যাবে। যার লেখায় পাঠকের আসক্তির বদলে বিরক্তি ঘটায়, সে সত্যিকারের শিল্পী নয়।

মিন্টু একটা কঠিন রায় দিয়েছে।

আমি মিন্টুর কথায় সায় দিয়ে গেলাম। আমি কখনো কোন আলোচনায় নিজের পক্ষ অবলম্বন করি না। সেটা আমার সৌজন্যে বাধে। একটা বই যখন প্রকাশিত হয় তখন সেটা পাঠকের সম্পত্তি। সে বই নিয়ে যথেচ্ছ নাড়া-চাড়া করার অধিকার তার আছে। সেটাকে কেন্দ্র করে সে

নিরপেক্ষ বিচারে যা কিছু ভাবতে পারে। তবে দেখতে হবে সেটা যেন উদ্দেশ্যমূলক না হয়। কোন প্রবল যুক্তি ছাড়া শত্রুতামূলক একতরফা খারাপ বলা আবার আমি সইতে পারি না। তবে আমার বিশ্বাস লেখার যদি বস্তু থাকে তবে সেটা তার যোগ্য মর্যাদা পাবেই। সেটা দুদিন আগে হোক বা পরে হোক।

আমি কিন্তু বটতলার সস্তা উপন্যাসের কথা বলছি না জামেরী ভাইয়া। আমার বক্তব্য হলো লেখার প্রথম শর্ত রিডেবিলিটি।

তোমার সঙ্গে আমি একমত নই মিন্টু। রিডেবিলিটাই কিন্তু আসল কথা নয়। যেমন ধর সাইফুল বারীর উপন্যাসের কথা। একটানা পড়ে শেষ করে ফেলা যায়। কিন্তু তারপর বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। কেননা পড়ার পর আর কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু জামেরীর লেখা তেমন নয়। পড়ার পরও টেনে রাখে। ঘুরে-ফিরে আবার পাতা ওল্টাতে ইচ্ছে করে। বিশেষ বিশেষ জায়গায় চোখ বুলিয়ে যাই।

আমি কিন্তু রিডেবিলিটাকে প্রথম শর্ত বলেছি বাবা।

আলী আহমদ সাহেবের জোরালো বক্তব্যে মিন্টু তেমন যুক্তি খুঁজে পেলো না। আমতা আমতা করে বললো।

হ্যাঁ তুমি সেটা বলতে পার। তবে আমার মনে হয় শিল্পকর্ম শুধুমাত্র কোন একটার বাহন নয়। সেটা সময়ের পরিপূরক।

আমার কথায় আপনি কিছু মনে করেননি তো জামেরী ভাই?

একটুও না। তোমার হৃদয়ে আমি পৌঁছতে পারিনি সেটা আমার দুঃখ। তবে তোমার সত্য ভাষণের জন্যে আমার কোন ক্ষোভ নেই। ভাল লাগা না লাগার অধিকার তোমার নিশ্চয় আছে।

আমিও তাই মনে করি।

শিল্পকর্ম বড় জটিল ব্যাপার না জামেরী?

আলী আহমদ সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে আমি হাসলাম। ভদ্রলোক যে সিরিয়াস পাঠক এটা আমি আগে টের পাইনি। আমাদের কথার ফাঁকে মিতুল উঠে পড়লো। ও এতক্ষণ একটা কথাও বলেনি। তাকে উঠতে দেখে আলী আহমদ সাহেব হা হা করে উঠলেন।

ওকি তোর হয়ে গেলো মিতু? এত কম খেলে কেমন করে শরীর টিকবে? আর একটু বোস মা?

না আর ইচ্ছে করছে না।

মিতুল কোনদিকে না তাকিয়ে চলে গেলো। আমি ওর চোখে চোখ ফেলবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। ওর মুখটা গম্ভীর। ও আমার দিকে একবারও তাকাল না। বুঝলাম আজকের মতো মিতুল আমার সামনে আর আসবে না। ইচ্ছে ছিল খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ রেকর্ডে গান শুনব আর আড্ডা দেব। কিন্তু মনটা বিগড়ে গেলো। মিতুল না থাকলে বৃথা আড্ডা মারা।

ঘরে ফিরেই শুয়ে পড়লাম। খাওয়াটা বেশি হয়েছে। খালাআম্মা চমৎকার রাঁধে। তাছাড়া খাওয়ার পর একটু না গড়ালে আমি কিছুতেই স্বস্তি পাই না। সারাদিন কেবল হাই উঠতে থাকে। কেমন ম্যাজম্যাজ করে শরীর। কিছুক্ষণ গড়িয়ে আবার প্রুফ কাটতে বসলাম। আজকে শেষ করে সন্ধ্যায় প্রকাশকের ওখানে যেতে হবে। ভদ্রলোক আমার ওপর ক্ষেপে আছে। বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে এত বেশি ঘুরতে হয় যে প্রকাশক ক্ষেপলে আর রক্ষে নেই। প্রুফ কাটা সবেমাত্র শেষ করেছি তখন শরাফী এলো। তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেলের শৈশব। ও এসেই হৈ চৈ শুরু করলো।

কিরে তুই যাবি না? তৈরি হোসনি যে?

কোথায়?

বাঃ তোকে তিন-চারদিন আগেই তো বলে রেখেছি যে, আজ বিকেল পাঁচটায় কাঁকড়া গোষ্ঠীর একটা সাহিত্য সভা আছে।

আমি ভুলে গেছি।

নে নে তৈরি হয়ে নে।

বোস না। চা খা।

আমি ওকে ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দিলাম।

তোর যাবার গরজ আছে বলে মনে হচ্ছে না?

সভা-সমিতি আমার খুব বেশি ভাল লাগে না, তুই তো জানিস শরাফী। সভায় গেলে আমার খুব অস্বস্তি লাগে। থাকতে পারি না।

তোর এই ঘোড়ারোগটা আর গেলো না দেখছি।

সে তুই রাগ করে আমাকে যা খুশী তাই বলতে পারিস, তাতে আমি রাগ করব না একটুও। তবে কি জানিস বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে ঐ

গালভরা বুলি কপচানোতে আমার ভীষণ নসিয়া। আমরা কেউ তেমন কোন মহৎ কাজ করতে পারছি না এবং চেষ্টাও করি না। দু-তিনটে বই লিখে পণ্ডিত হয়ে যাই এবং ঐ ভাঙিয়ে সারাজীবন খাবার চেষ্টা করি। ঐ দু তিনটে বইয়ের বদৌলতে সভা-সমিতিতে সভাপতির পদ অলংকার করা আমাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ঐ সবে আমার প্রচণ্ড ঘৃণা শরাফী। আমি বুঝি কাজ। প্রচণ্ড কাজ। কাজের মধ্য দিয়ে সৃষ্টিকে এক একটি ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। সহৃদয় পাঠক আমার মূল্যায়ন করবে কি করে যদি আমি তাদের সামনে তেমন কাজ দেখাতে না পারি?

পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ারও তো একটা দরকার আছে?

তেমন পরিচয়ে আমি বিশ্বাস করি না শরাফী—যেটা কেবল পরস্পরের পিঠ চুলকানিতে এসে দাঁড়ায়।

তোর কি একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে না জামেরী?

সেটা তুই ভাবতে পারিস। আমি মনে করি না। শিশু-সাহিত্য করতে এসে যারা বিবেককে জলাঞ্জলি দেয়, তাদের কাছে বিনীত হওয়ার মতো দুর্ভাগ্য আর কিছুতে নেই শরাফী। সে কাজ মানেই লেখক সত্তার অপমৃত্যু। আমার লেখায় যদি পদার্থ থাকে তবে তার স্বীকৃতি একদিন হবেই।

কিন্তু তুই তো জানিস জামেরী অনেকসময় দলাদলি বা ইজমের খপ্পরে পড়ে অনেক ভাল বই তার যোগ্য মর্যাদা পায় না।

তার জন্যে কোন দুঃখ নেই। একজন সহৃদয় বিবেকবান পাঠকের জন্যে আমি শতাব্দীকাল অপেক্ষা করতে রাজী আছি। পাঠক আমার ঈশ্বর। তাঁরা কখনো ভুল বিচার করে না।

শরাফী চুপ করে থাকে। উত্তেজনায় আমার বুকটা ধপ্‌ধপ্ করে। টের পাই উত্তেজিত হলে বুকের ভেতর কি যেন একটা প্রসারিত হতে থাকে। প্রসারিত হয়ে আমার সমস্ত হৃদয় ছেয়ে ফেলে। তারপর দুহাত বেয়ে নামতে থাকে। তখন আমার মনে হয় হৃৎপিণ্ডের ধুকপুক শব্দটা গলার কাছে এসে উঠেছে। ওটা যে-কোন সময় হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে। শরাফী ঠক্ করে চায়ের কাপটা টেবিলের ওপর রাখলো।

তুই অনেক ভাল ভাল কথা বললি জামেরী। সবাই স্বীকার না করে

উপায় নেই। তবে হৈ-চৈ আড্ডা আমি একটু পছন্দ করি।

আড্ডা আমারও ভাল লাগে যদি সেটা সাহিত্যের আড্ডা হয়। তেমন আড্ডায় আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতে পারি।

সেটা আমি জানি। তবে এসব জায়গায় গেলে একটা সুবিধে আছে।

কি?

নানা ধরনের লোক দেখা যায়।

দৃষ্টিটা ঠিকমতো খোলা রাখতে পারলে তেমন লোক আমাদের আশে পাশে অজস্র দেখা যায় শরাফী। তার জন্যে বিশেষ জায়গায় যেতে হয় না। দেখাটাই আসল।

বেশ ভাল! আমাকে নিরীহ শ্রোতা পেয়ে একতরফা শুনিয়ে যাচ্ছিস। আমার অতো সময় নেই। আমি চললাম।

তোদের সভার সভাপতি কে রে?

শামসুল মাহমুদ খান।

শরাফী কোনমতে উত্তর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে গেলো। জানে যার নাম ও উচ্চারণ করলো তাকে আমি স্বীকার করি না। শালা পঞ্চাশ বছরে দুটো উপন্যাস লিখেছে। ঐ ভাঙিয়ে এখন চলছে। সারাজীবন কেবল ধান্দা আর মতলবের পেছনে ঘুরেছে। সাহিত্যের জন্যে সত্যিকারের মমতা এবং ত্যাগ তার ছিল না। আমার ভাবতে অবাক লাগে যে, এরা কি করে পাঠকের সামনে আসে। নিজের সৃষ্টির দীনতায় এদের লজ্জাও হয় না। সভাপতির আসনকে এরা পৈতৃক সম্পত্তির মতো ব্যবহার করে। অথচ বক্তৃতার সময় বড় বড় কথা। সেখানে কোন ত্রুটি নেই।

আমি জানালার সামনে এসে দাঁড়ালাম। শরাফী ক্ষুব্ধ হয়েছে। তাতে আমার কিছু এসে যায় না। বুকটা এখনো ধুক্‌ধুক্ করছে। এ অবস্থায় আমি কখনো শুতে পারি না। শুলে ভীষণ হাঁস-ফাঁস লাগে। জানালার শিকে মাথা রেখে দম নেবার চেষ্টা করলাম। আস্তে আস্তে প্রসারিত বোধটা সংকুচিত হচ্ছে। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আমি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম। বুঝি ডাক্তার দেখানো দরকার। আলসেমির জন্যে হয়ে ওঠে না। তাছাড়া ভাল থাকলে অসুখের কথা বেমালুম ভুলে যাই আমি। বাইরে রোদের তাপ কমেছে। প্রুফ বগলদাবা করে বেরুলাম। এগুলো প্রকাশকের কাছে পৌঁছে দিয়ে অফিসে যেতে হবে।

হাঁটতে হাঁটতে ন্যুমার্কেট এলাম। হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে দেখলাম সাইকিকে। ওর সঙ্গে আর একটি মেয়ে। আমার চোখে চোখ পড়তে ওর চোখটা দপ্ করে জ্বলে উঠলো। একঝলক শাদা আগুন। সাইকি মুখটা ঘুরিয়ে নিলো। আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম। ভাল কথা। সাইকি আমাকে ঘৃণা করলো। রায়হানের বন্ধু বলেই করলো। আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো। অথচ আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। বোকার মতো ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কি যে যাদু! ও পেছন ফিরে আর একঝলক আমার দিকে তাকালো। কি বুঝলো কে জানে। দ্রুত রাস্তা পেরিয়ে অপর দিকে চলে গেলো। ওর পায়ে ভীত হরিণীর লঘু গতি দেখে আমার কান্না পেলো। সাইকি আমাকে ভয় পেয়েছে। ও হয়তো ভেবেছে আমি একটা শিকারী কুকুর। প্রভুর হুকুম তামিল করার জন্যে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছি। হয়তো এখুনি ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে টুঁটি কামড়ে ধরবো। আমার বুকটা খাঁ খাঁ করে উঠলো। আমার হৃদয়ে তখন সন্ধ্যার পেলব আহ্বান। মনে মনে বললাম, সাইকি আমি তোমার ভাল চাই। মঙ্গল চাই। তোমার মঙ্গল চিন্তায় আমার হৃদয় এখন পবিত্র ইলিউম। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর সাইকি। একবারের জন্যে বিশ্বাস কর। তুমি জানতে পারছ না যে, তোমার চোখের ঐ অবিশ্বাসী ঘৃণায় আমার হৃদয় চড়চড় করে পুড়ছে। ট্রয়ের মতো পুড়ছে।

চার

শনিবার আমার অফ ডে। শরীরে অসম্ভব জড়তা। শুয়ে শুয়ে জয়েসের ইউলিসিস পড়ছিলাম। কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারলাম না। শরীরের কোথায় যেন বিদ্রোহ। বইয়ের সঙ্গে আপোষ নেই। চোখ জড়িয়ে আসে। অথচ ঠিক ঘুমও পাচ্ছে না। বাইরে একফোঁটা বাতাস নেই। ভ্যাপসা গরম। কি করবো ভাবতে পারছিলাম না। সেদিন শরাফীর বাসায় গিয়েছিলাম। ওর মেয়ে রামীন সোজা আমার কোলে উঠে বললো, কাকু আজ আমার কি হলো? ওর কথা বলার ভঙ্গিতে আমি তো

অবাক। এই একরত্তি মেয়েটা বলে কি? বললাম, কি হয়েছে মামণি?

আজ শুধু আমাকে পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে?

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম।

তুমি নিশ্চয় পিঁপড়ের সঙ্গে আড়ি নিয়েছ। তাই তো ও ভাব করতে চায়।

হ্যাঁ বয়ে গেছে আমার পিঁপড়ের সঙ্গে আড়ি নিতে।

ও রাগ করে আমার কোল থেকে নেমে গিয়েছিল। আমার উত্তরটা ওর মনঃপুত হয়নি। হঠাৎ রামীনের কথা আমার মনে হলো। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, আজ আমার কি হলো? কিন্তু এখানেও কোন সদুত্তর দিতে পারলাম না। বইটা বন্ধ করে পাশ ফিরে শুলাম। এমন সময় পিয়ন এলো। আমাকে কেউ চিঠি লেখে না। মিতুলের চিঠি। এ চিঠির কথা ও আগেই আমাকে বলে রেখেছিলো। ওর মামা থাকে লণ্ডনে। তার কাছে ও লিখেছিল ওর মা-র একটা ছবি পাঠাবার জন্যে। নিকট আত্মীয়স্বজন কাছে-ধারে কেউ নেই। ওর মা আর মামা-ই ছিল দুই ভাইবোন। নানা-নানীও নেই। সুতরাং কারো কাছে গিয়ে মন খোলার কোন উপায় নেই মিতুলের। সেটা ওর ভাল লাগে না। আমার সঙ্গেই ওর যতো কথা। অন্য কারো কাছে কোন কথা বলে না। চিঠিটা বালিশের নিচে রেখে দিলাম। একটু পরে মিতুল এলো।

পিয়ন আসতে দেখলাম জামী?

হ্যাঁ, তোমার চিঠি এসেছে।

চিঠিটা পড়ে ও হতাশ হলো। ওর মামা লিখেছে ওর মা-র কোন ছবি তার কাছে নেই। মিতুল ফিকে হাসলো।

আসলে আমার মা-কে বোধ হয় কেউ ভালবাসতো না জামী।

তা কেন হবে। ছবি কি আর সবাই সবসময় রাখে। এই দেখ না তোমার কোন ছবিতো আমার কাছে নেই।

মিতুল কথা বললো না। মনোযোগ দিয়ে আবার চিঠিটা পড়লো। দুবার-তিনবার পড়লো। তারপর এক সময় ছিঁড়ে কুটিকুটি করে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিলো।

ছিঁড়লে কেন মিতুল?

ওর বুক কাঁপিয়ে নিঃশ্বাস এলো।

রেখে কি হবে? আমার মা-ও তো অমনি কুটিকুটি করে ছিঁড়ে আমাকে

জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছে।

মিতুল পাগলের মতো হাসতে আরম্ভ করলো। একটু অস্বাভাবিক হাসি। আমি ভয় পেলাম। ওকে ধরে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি দিলাম। বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকালো ও। যেমন হঠাৎ শুরু করেছিলো তেমন হঠাৎ করে শান্ত হয়ে গেলো। ওর সেই তেপান্তরী-দৃষ্টিতে আমি মোহিত হলাম। অনেক দূরের হাতছানি ওখানে। সাগর পাড়ে হারিয়ে যাওয়ার ডাক। মিতুল আমার মিতুল। মনে হলো আফ্রোদিতির মতো আমাকে কুয়াশায় ঢেকে ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝ দিয়ে অবলীলায় নিয়ে যেতে পারে। কোন বর্শা বা তীর আমার শরীর স্পর্শ করবে না। আমি এক পা এগুলাম। ও হাসলো।

তোমাকে একটা জিনিস দেখাব বলে এনেছি জামী?

ও ব্লাউজের ভেতর থেকে একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি বের করলো। এক মহিলার ছবি। অনেক পুরোন। খুব ভাল করে দেখলে মিতুলের চেহারার সঙ্গে কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

কোথায় পেলে?

বাবার পুরোন একটা ডায়রীর ভেতর। আমার মা-র মতো মনে হচ্ছে না জামী?

অনেকটা হচ্ছে।

যদিও অনেক আগের ছবি তবুও আমি বুঝেছি আমার মা-ই হবে। আচ্ছা জামী এখন নিশ্চয় মায়ের চেহারা আর এমন নেই। এই ছবির সঙ্গে মিলিয়ে খুঁজলে আমি তাকে চিনতেই পারব না। তুমি কি বল?

তা ঠিক। মানুষের চেহারা কতো পাল্টে যায়।

ধুত্ বাজে। তুমি যেন আজ কেমন মিন মিন করে কথা বলছো। কেবল আমাকে তোয়াজ করার চেষ্টা। মিনমিনে পুরুষ আমি একদম দেখতে পারি না।

মিতুল রেগে উঠলো। রাগলে ও আমার ঘরে জোরে জোরে পা ফেলে পায়চারী করে। আমি বসে বসে ওকে দেখলাম। ওকে কেমন উদভ্রান্ত দেখাচ্ছে। আমারও রাগ হলো। মনে মনে গাল দিলাম। তুই একটা হারামি মিতুল। শালা তুই হলি ইউক্লিডের জ্যামিতি। তোকে বোঝা কার সাধ্যি। কতবার তোকে পড়ে ওঠার চেষ্টা করলাম। এক-একবার

মনে হয় বুঝেছি। আবার দেখি কিছুই বুঝিনি। জ্যামিতি বোঝার মাথা আমার নেই। চেষ্টা করলে কি হবে। দোহাই লাগে মিতুল তোর হারামিপনা একটু কমা। তুই একটু সহজ হয়ে আমার কাছে আয়। তোর ঐ আঁকা-বাঁকা রেখাগুলো আমার সামনে থেকে সরিয়ে ফেল। প্লীজ মিতুল। ইউক্লিড আমার নমস্য। তাকে আমি কোনদিনও বুঝতে পারব না। তোকে আমি জ্যামিতির মতো চাই না মিতুল। কবিতার মতো চাই। উঃ মিতুল তুই একটা শুয়োর, শুয়োর, শুয়োর।

হঠাৎ দেখলাম মিতুল সেই ছবিটা টুকরো টুকরো করে ফেললো। মেঝেতে ফেলে স্যাণ্ডেল দিয়ে ইচ্ছেমতো পাড়ালো। অনেকক্ষণ ধরে ওই কাজ করলো ও। কিছুতেই যেন মনের আশ মিটছে না। এ অবস্থায় আমি কি করবো বুঝতে পারছিলাম না। হঠাৎ গভীর চোখে আমার দিকে তাকালো। আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়ালো। আমার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠলো, তুমি কিছু বলছ না কেন জামী?

আমি কি বলবো? আমি কি করতে পারি ওর জন্যে। রায়হান ফিরে এলে যে করে হোক ওর মাকে আমি খুঁজে বের করবো। কিন্তু সেকথা মিতুলকে আমি বললাম না। শুনলে ও অধীর হবে। অথবা এমন কঠিন হবে যে, তখন বলবে, না থাক খুঁজো না। চাই না মা-কে। আমার বুকে মুখ রেখে অনেকক্ষণ ধরে ও কাঁদলো। কাঁদতে কাঁদতে ও যখন শান্ত হলো, তখন বললাম, মিতুল বেইলী রোডে ভাল একটা নাটক হচ্ছে, চলো দেখে আসি।

চলো। আমি কাপড় পরে আসি।

মিতুল শান্ত মেয়ের মতো উঠে চলে গেলো। আমি ছবির ছেঁড়া টুকরোগুলো একটা কাগজে মুড়ে বিছানার নীচে রেখে দিলাম। যে-কোনদিন এসে ও আবার ওটা দাবী করতে পারে। আমরা যখন রাস্তায় নামলাম, তখন সূর্যের জাল গোটানোর সময়। সে ব্যাটা আস্তে আস্তে রশি টানছে। আমরা একটা রিকশা নিলাম।

নাটক তখনো আরম্ভ হয়নি। হলে লোক গিস্‌গিস্‌ করছে। বহু কষ্টে দুটো টিকিট পেয়েছি। আমি আর মিতুল বাইরে এক কোণায় দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের উল্টো দিকে বেশ বয়স্ক এক মহিলা একা চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ভিড়ের গায়ে তার দৃষ্টি ইতস্তত ঘুরছে। পরনে লাল পেড়ে

পরদের শাড়ি। মিতুল আমার হাতে চাপ দিলো।

দেখ জামী ঐ মহিলাকে ঠিক আমার মা-র মতো লাগছে।

যাঃ কি যে বলো।

তুমি একবার ভাল করে দেখ?

ছেলেমানুষি করে না মিতুল।

আমি একটু ধমকে উঠলাম।

ঠিক আছে, আমি জিজ্ঞেস করবো।

ও দ্রুত ঐ মহিলার সামনে এগিয়ে গেলো। বাধ্য হয়ে আমাকেও পিছু পিছু যেতে হলো। সামনে গিয়ে মিতুল একটু হকচকিয়ে গেলো। কি করে শুরু করবে বুঝতে পারছিলো না।

আপনি কোথায় থাকেন?

রাজাবাজার।

মহিলা বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিয়ে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিলো। বুঝলাম কথা বলতে চায় না। আমি মিতুলকে টানলাম। ও আসতে চায় না।

আচ্ছা আপনি মিতুল নামে কোন মেয়েকে চিনতেন?

না।

মহিলা অন্যপাশে গিয়ে দাঁড়ালো। অসহায়ভাবে মিতুল আমার দিকে তাকালো। দরজা খুলে দিয়েছে। আমি ওকে নিয়ে হলে ঢুকে গেলাম। অর্ধেক নাটক দেখার পর ও উস্‌খুস্‌ শুরু করলো।

জামী আমার শরীর খারাপ লাগছে। বমি বমি ভাব।

আর একটু বোস।

আমি তখন নাটকে জমে গেছি। চমৎকার নাটক। একটু পর ও আবার একই কথা বললো।

জামী আমি আর থাকতে পারছি না। ভীষণ বমি লাগছে।

অগত্যা উঠতে হলো। বাইরে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ও বমি করলো। চায়ের দোকানে থেকে পানি এনে ওর মুখ ধুয়ে দিলাম। চোখ দুটো লাল। দেখলাম গায়ে জ্বর এসেছে। মিতুল সত্যি অসুস্থ। এতক্ষণ ওর ওপর যে রাগ ছিল, সেটা উবে গেলো। রিক্‌শা ডাকলাম। ও নিষেধ করলো।

চলো একটু হাঁটি জামী।

বেইলী রোডের আবছা অন্ধকারে মিতুল আমার হাত ধরে হাঁটতে লাগলো। বেশ ফুরফুরে বাতাস। রমনা পার্ক ছাড়িয়ে ইন্টারকন পর্যন্ত আমরা হাঁটতে হাঁটতে এলাম। মাঝে মাঝে মিতুল অনেক আবোল-তাবোল কথা বললো।

আমার কেউ নেই, না জামী?

আমিতো আছি।

যাঃ তুমিও নেই।

অন্ধকারে মিতুল কেমন খ্যাক শব্দে হাসলো।

আমার শীত করছে জামী।

চলো রিকশা নেই।

না থাক।

আচ্ছা জামী তুমি আমাকে কতদিন ভালবাসবে?

যতদিন বাঁচবো।

তা কি হয়? কেউ কাউকে সারাজীবন ভালবাসতে পারে না। পাত্র বদলায়!

সবাই বদলায় না।

হ্যাঁ সবাই বদলায়।

মিতুল জেদের সঙ্গে বললো। আমি চুপ করে রইলাম।

আমি জানি তুমিও বদলাবে। উঃ আমার মাথাটা কেমন জানি করছে। মনে হচ্ছে আবার বমি হবে।

দেখলাম মিতুলের শরীর কাঁপছে। টেম্পারেচার বেড়েছে। আমার মনে হয় সাময়িক ধকলের জন্যে মিতুল এমন হঠাৎ অসুস্থ হলো। আমি ওর কোন কথা না শুনে রিক্শা ডেকে বাসায় ফিরলাম।

সাত দিনের ওপর হয়ে গেলো অথচ রায়হান এখনো ফিরছে না। অফিসের কাজে, লেখায় কোনকিছুতেই মন বসাতে পারছি না। গত তিন দিন ধরে মিতুল অসুস্থ। জ্বর কখনো কমে, কখনো বাড়ে। একদম ছাড়ছে না। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ও। হাতের ওপর রগ জেগেছে। আলী আহমদ সাহেব ভাবনায় পড়েছেন। এই মেয়েটির জন্যে তাঁর একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। যেটাকে মিতুল মায়ের ভালবাসা বলে। একদিন

সকালবেলা দু পৃষ্ঠা লেখার জন্যে অনেক চেষ্টা করলাম। পারলাম না। কিছুতেই আসে না। রেগেমেগে পাণ্ডুলিপিটা ছুঁড়ে ফেললাম খাটের নীচে। তখন আলী আহমদ সাহেব এলেন। তিনি সাধারণত আমার এখানে আসেন না। দরকার হলে ডেকে পাঠান। এসেই সরাসরি বলে ফেললেন, কি করি বল তো বাবা? স্পেশালিস্ট দেখালাম, তাও তো কিছু হচ্ছে না।

উত্তরের প্রত্যাশায় উনি আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। আমার মনে ঝড়। মিতুল আমাকে সার্সির মতো যাদু করে রেখেছে। মিতুল ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারি না। আমতা আমতা করে বললাম, আপনি ভাববেন না। ও কাল-পরশুর মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।

তাই যেন হয় বাবা। তুমি তো জান না, ওর অসুখ হলে আমি একদম অস্থির হয়ে পড়ি। তখন খেতে পারি না, ঘুমোতে পারি না। তাছাড়া মেয়েটাও কেমন কাহিল হয়ে পড়েছে। এই জ্বরে কেউ এতো দুর্বল হয়, তা আমি কোনদিন দেখিনি। তুমি কি বলো? (চেষ্টুতে ২৮)

আমারও তাই মনে হয়।

আচ্ছা উঠি। যাচ্ছিলাম ন্যুমার্কেটের দিকে কিছু আপেল কিনতে। হঠাৎ মনে হলো তোমার সঙ্গে একটু কথা বলে যাই।

আলী আহমদ সাহেব নেমে গেলেন। আমি জানালার সামনে এসে দাঁড়াই। উনি এসেছিলেন আমার কাছে শান্তনা খুঁজতে। তাঁকে শান্তনা দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই। আমি নিজেই তো বিপর্যস্ত। যাত্রী ওঠাবো কেমন করে, আমার জাহাজ যে গভীর সমুদ্রে তলিয়ে যাচ্ছে। গতকাল মিতুলের বিছানার সামনে বসে কতবার প্রার্থনা করেছি, অসুখটা যেন আমার হয়। হঠাৎ হাসি পেলো। আলী আহমদ সাহেব কিনা এসেছিলেন আমার কাছে আশ্রয় খুঁজতে? খাটের নীচ থেকে পাণ্ডুলিপিটা উঠিয়ে এনে টেবিলে রাখলাম। অপরাধে ভরে উঠলো মন। পৃষ্ঠাগুলো গুছিয়ে নিয়ে চুমু খেলাম। আসলে এমনি হয়। কখনো সৃষ্টিকে পায়ে মাড়াই। কখনো কপালে ঠেকাই। রুষ্ট প্রাণের দেবতা প্রতিমুহূর্তে ভাঙাগড়ার খেলায় মগ্ন।

ঘরে আর ভাল লাগছিল না। কোথায় যাব, তারও ঠিক নেই। অনেকদিন রেজার সঙ্গে দেখা নেই। ভাবলাম, ওর ওখান থেকে ঘুরে

আসি। ওকে না পেলে রিক্‌শা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবো। কিন্তু বেরুবার আগেই রায়হান এলো।

কি রে, সাতদিনের নাম করে একেবারে পনেরো দিন কাটিয়ে দিয়ে এলি!

বোস, কথা আছে।

রায়হান গম্ভীর। কিছুক্ষণ আমার খাটে চুপচাপ বসে রইলো। এতক্ষণে আমি ওর দিকে ভাল করে খেয়াল করলাম। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। শার্টে ইস্তিরি নেই। প্যান্টেরও একই অবস্থা। রায়হান আজ অন্যমনস্ক। দরজাটা বন্ধ করে দে জামেরী?

কেন?

কেউ আসতে পারে।

এখানে কেউ আসবে না।

তুই বন্ধ করে দে না।

ও চেঁচিয়ে উঠলো। আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম।

কি হয়েছে বল?

ছন্দার বিয়ে হয়ে গেছে।

এঁ্যা!

আমার মুখ দিয়ে অস্ফুট ধ্বনি বেরুলো। হঠাৎ মনে হলো সাইকি বেঁচে গেলো। রায়হান আর ওর নাগাল পাবে না। কিন্তু খুব জোর দিয়ে ব্যাপারটা ভাবতে পারলাম না। রায়হান কি ওকে ছাড়বে?

আমি চিটাগাং থাকতেই বিয়েটা হয়েছে জামেরী। খুব ঘরোয়া অনুষ্ঠানে কাজ সেরেছে ওরা। কিন্তু আমিও ছাড়বো না। তোকে বলে রাখলাম। আমার হাত নিশপিশ করছে।

কিন্তু রায়হান—

উপদেশ দিস না জামেরী। উপদেশ শুনতে আসিনি।

কি করবি?

বুলেটের বিনিময়ে ভালবাসা চাই। ছন্দাকে আমার হতেই হবে।

আমার একটা কথা শুনবি রায়হান?

না। তোর সামান্য উপদেশে আমার ভেতরে কিছু কাজ হবে না এখন। তোকে খবরটা জানাবার জন্যে এসেছিলাম। তাছাড়া তোর একটা কাজের দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। চল আজ সেটা সেরে আসি।

চল।

দুজনে বেরিয়ে এলাম। রিক্‌শা নিলাম একটা। মাথার ওপর রোদের দাপট। রোদ থেকে যেন ভাপ উঠছে। রোদে আমি বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। মাথাটা ঝিমঝিমিয়ে ওঠে। রায়হান চুপচাপ। ও আজ বেশি কথা বলছে না কেন? ওর ভেতরে ভয়ানক একটা আলোড়ন চলছে নিশ্চয়। হেডিসের তিন মাথাঅলা কুকুরের মতো ওর চারদিকে এখন মাথা গজিয়েছে। ও বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফুঁসছে। উঃ সাইকি তুমি পালাও। পালাও। অনেক দূরে পালিয়ে যাও।

কি রে বিড়বিড় করছিস কেন?

রায়হান আমাকে কনুই দিয়ে গুঁতো দিলো।

একটা হিসেব মেলাতে চাইছি। কিন্তু কিছুতে মিলছে না।

রায়হান শব্দ করে হাসলো।

মনে মনে হিসেব মেলানো যায় না। তারজন্যে চাই এ্যাকশন। তোদের মতো দুর্বলচিত্তের লেখকরা কি হিসেব মেলাবে বল?

রায়হান এখন চিন্তার রকেটে উঠেছে। সে গতির সঙ্গে পাল্লা দেয়ার সাধ্য আমার নেই। আমি জানি ও আজ অনেক কিছু ভাবছে। ভেবে ভেবে পন্থা বের করবে। সে পন্থায় পিষে মারবে সাইকিকে।

জামেরী দেখতো আমাদের ফলো করে কোন রিক্‌শা আসছে কিনা?

কি যে বলিস? কে আমাদের ফলো করবে?

করতে পারে। আমি এখন অনেককিছু ভাবছি কিনা। তুই দেখ না তাকিয়ে?

পেছনে তো সারি সারি রিক্‌শা আসছে। কোনটা আমাদের ফলো করছে কেমন করে বুঝবো?

তুই তাহলে লেখক কেন শালা?

ও আমাকে আবার কনুই দিয়ে গুঁতো দিলো। মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো।

লেখক কিন্তু ডিটেকটিভ নই শালা। যতসব আজগুবী চিন্তা।

আমার মৃদু ধমকে কাজ হলো। রায়হান আর কোন কথা বললো না। ওর আচরণগুলো আমার কাছে বেখাপ্পা লাগছে। ওতো ঠিক এ ধরনের আচরণ করে না। এ পর্যন্ত আমি দেখিনি। কোথাও কিছু একটা গলদ

হয়েছে। মনে হচ্ছে ওর ভেতরের নদী বাঁক বদলাচ্ছে। অথচ একগুঁয়ে জেদী বাছুরের মতো পাড় ভাঙছে। ভীষণ একটা পরিবর্তন আসছে রায়হানের।

মালীবাগের যে জায়গায় এসে আমরা থামলাম, তার দু-তিনটে বাড়ি পরেই সেই স্কুলটা। কতোকাল আগের কথা। ছোটবেলায় রায়হান এ পাড়ায় থাকতো। কেবল মিতুলের মা-র নামটা মনে আছে। প্রথমে দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করলো রায়হান।

আয়শা আপা আছেন?

আছেন।

একটু ডাক তো, আমাদের দরকার আছে।

দারোয়ান ভেতরে গেলো। আমি দুরু দুরু বুকে দাঁড়িয়ে রইলাম। কেমন হবে মিতুলের মা? মিতুলের আকাঙ্ক্ষিত মা। এই মা-কে দেখার জন্যে অনেক তৃষ্ণা ওর বুকে। আমি প্রথমে কি কথা বলবো তার সঙ্গে? একটু পর দারোয়ান ফিরে এলো।

না, উনি নেই। ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছেন। ওনার বাচ্চার অসুখ।

বাসা কোথায়?

২।১, তাঁতখান লেন।

দারোয়ানের কাছ থেকে ভাল করে লোকেশনটা জেনে নিয়ে দুজনে ফিরে এলাম। নির্জন রাস্তা। রায়হান দু-এক বার চমকে পেছন ফিরে তাকালো।

মনে হচ্ছে, কারা যেন আসছে।

তোকে ঠিক ভূতে ধরেছে। তোর হয়েছে কি বলতো?

রায়হান হাসলো।

তুই বুঝবি না জামেরী। আমি কেবল একটা নদী পার হয়েছি।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা বড় রাস্তায় এলাম। গলিটা বেশ ছায়াচ্ছন্ন ছিলো। দুপাশের বাড়ির দেয়াল উপচে ডাল-পালা নেমেছে রাস্তার দিকে। রায়হানকে বললাম, চল, গলিটায় আর একবার হেঁটে আসি।

কেন? ও অবাক হলো।

এমনি হাঁটতে বেশ ভাল লাগছে।

এবার দেখি ভূতে তোকে ধরেছে। আমার অনেক কাজ আছে

জামেরী। আমি চললাম। তুই ঐ ঠিকানা খুঁজে মিতুলের মা-র সঙ্গে আলাপ করে নিস।

রায়হান একটা রিকশা নিয়ে চলে গেলো। আমি পথে দাঁড়িয়ে গাড়ি দেখলাম, মানুষ দেখলাম। মাথার মধ্যে ঘুরছে ২।১, তাঁতখান লেন। আমাকে এখন ঐ গলিটা খুঁজতে হবে। একটি মুখ বের করতে হবে। আমার মিতুলের জন্যে আমার সামনে এখন কেবল একটা গলি। কিন্তু গলিটাকে এত দূর মনে হচ্ছে কেন? পথের দিকে তাকালে কেবল পাহাড় ভেসে ওঠে। অগণিত পাহাড়। কেমন করে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবো? কি বলে পরিচয় দেব? মনে হচ্ছে, এমন কঠিন সমস্যায় আমি আর কোনদিন পড়িনি। তবু একটা রিক্‌শা ডেকে উঠলাম। কিন্তু মেডিক্যালের সামনে এসে আমার মন ঘুরে গেলো। মনে মনে ভাবলাম, আজ থাক। আর একদিন যাব। এক মহিলা তার পঁচিশ বছর আগের ইতিহাস ঢেকে রেখেছে সঙ্গোপনে। সে জীবনের প্রতি তার কোন আকাঙ্ক্ষা আছে কিনা, আমি জানি না। আর একটি মেয়ে সে ইতিহাসের তৃষ্ণায় ব্যাকুল। শুধু ব্যাকুল নয়, সে তৃষ্ণা তার জীবন-মরণ সমস্যা। আমি এ দু'য়ের যোগসাধনের সেতু। আমার আরো একটু প্রস্তুতি দরকার। আসলে ভয়। জোড়া লাগাতে গিয়ে আমি যদি পুরোটাই ভেঙে ফেলি? সে বেদনা মিতুল সইতে পারবে না। তাই আপাতত তাঁতখান লেন মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে রেজার খোঁজে হাসপাতালে ঢুকলাম। সেই বিচিত্র শব্দে নীল বাতির মুকুট মাথায় এম্বুলেন্সটা বেরিয়ে গেলো আমার পাশ ঘেঁষে। দাঁড়িয়ে সে শব্দ শুনলাম।

রেজা আমাকে দেখে হাসলো।

কিরে, অনেকদিন লাপাত্তা? আমি ভাবলাম, তুই আবার কোন্ গুহায় গিয়ে ঢুকলি?

বেঁচে আছি না মরে গেছি, নিজেও তো একবার সে খোঁজ নিসনি? কেবল আশা করে থাকিস কখন এসে আমি দেখা দেব।

সত্যি, জামেরী এত ব্যস্ত যে, দম ফেলার সময় নেই। গত মাসখানেক ধরে কি যে হয়েছে, রুগীর সংখ্যা ভীষণ বেড়ে গেছে। জানিস, রোগের মৌসুম ছাড়াই কোন কোন সময় এমন হয়। রুগীর সংখ্যা হঠাৎ করে বাড়তে থাকে। তারপর, কেমন আছিস বল?

আমি ভাল। মিতুলের জ্বর।

তাহলে তো তুইও ভাল নেই দোস্ত।

রেজা আমার পিঠ চাপড়ে হো হো করে হাসতে থাকে। আমিও।

কবে থেকে জ্বর?

তিন-চারদিন হলো।

তোর পৃথিবী এখন অন্ধকার, কি বলিস?

একরকম তাই।

মনের গুমোট ভাবটা কেটে যাচ্ছে। এ কয়দিন কে যেন আমাকে ভীষণ অন্ধকার ঘরে বন্দী করে রেখেছিলো। কিছুতেই বেরুতে পারছিলাম না।

তুই এখন কি লিখছিস জামেরী?

একটা বড় উপন্যাসে হাত দিয়েছি। পঞ্চাশ পৃষ্ঠার মত লিখেছি।

গুড। তুই একটা ভাল কিছু করবি মনে মনে আমি এটা চাই।

রেজার উচ্ছ্বাসে আমি হাসলাম। ও সবসময় আমাকে এমন ভঙ্গিতে উৎসাহিত করে। ও আমার অকৃত্রিম বন্ধু। ওর মধ্যে কোন বিদ্বেষ নেই। ওর ঐ সহজ সরল দ্বিধাহীন আবেদন আমার ভাল লাগে। যে জন্যে আমি ওর কাছে ছুটে ছুটে আসি। মনে হয় সাহিত্যিক বন্ধু শরাফীর কাছে আমি যতোটা স্বস্তি না পাই, রেজার কাছে তা পাই। রেজা বেয়ারা ডেকে চা আনতে বললো।

আমি তোকে ডিস্টার্ব করছি না তো?

মোটেও না। এতক্ষণ কাজের চাপে হিমশিম খাচ্ছিলাম। এখন একটু ফ্রি। তোকে একজন ইন্টারেস্টিং রুগী দেখাবো।

কেমন?

প্যারানয়ার রুগী।

বুঝিয়ে বল।

প্যারানয়ায় আক্রান্ত রুগীরা সবসময় নিজেকে অনেক বড় ভাবে। নিজে যা নয়, তার চাইতে অনেক বেশি। এই ছেলেটি গত বছর পাশ করে বেরিয়েছে। লেখালেখির দিকে ঝোঁক আছে। মাস দুই আগে থেকে আস্তে আস্তে অসুস্থ হয়। এখন বেশ অসুস্থ। ওর মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা চলছিলো। কিছুদিন আগে জণ্ডিস হয়েছে। এখন আমাদের এখানে।

একঘেয়ে অসুখের মাঝে এ ধরনের দু-একজন ব্যতিক্রমী রুগী কিন্তু ভাল লাগে জামেরী।

তুই দেখি কট্টর ডাক্তার হতে পারলি না। এখনো ভালমন্দ খুঁজিস।

রেজা হাসলো। বেয়ারা চা দিয়ে গেলো। চা খেতে খেতে রেজার প্যারানয়ার শব্দটা আমার মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো। আমি গন্ধ শুঁকলাম। আমার নিজস্ব নিয়মের গন্ধ। মনে হলো, এ ধরনের লোক নিয়ে উপন্যাসের চরিত্র হয়। আসলে আমরা আপাত সুস্থ লোকেরাও প্যারানয়ার রুগী। আমরা কেউ নিজের মূল্যকে সঠিক বিচারে দেখি না। একটু বাড়িয়ে দেখতেই ভালবাসি। চা খাওয়া হতেই রেজা তাড়া দিলো।

চল যাই জামেরী। আবার আমার দশ মিনিট পর ডিউটি আছে।

আমরা যখন সতেরো নম্বর ওয়ার্ডের তিন নম্বর বেডের সামনে এলাম, দেখলাম সেই ছেলেটি চোখ বুঁজে শুয়ে আছে।

জামিল? রেজা ডাকলো।

ও চোখ খুললো না।

মহামান্য সম্রাট জামিল? রেজা একটু জোরে ডাকলো।

বলো।

ও চোখ না খুলেই বললো।

আজ আপনি কেমন আছেন?

ভাল।

আপনার সঙ্গে একজন অধম দেখা করতে এসেছে।

কি চায়?

কথা বলতে চায়।

ও কি লেখাপড়া জানে?

সামান্য জানে।

আমার মহাকাব্য পড়েছে?

কোন্‌টা?

মূর্খ। নামও জানে না।

না মহামান্য জামিল, তা নয়। আপনার তো অনেক মহাকাব্য, কোন্‌টার কথা বলছেন বুঝতে পারিনি।

ইলিয়াড।

জামিল গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিলো। আমি হাসি চাপতে পারলাম না। শব্দ বেরিয়ে গেলো।

হাসে কে?

হুঙ্কার দিয়ে উঠে বসলো ও।

মূর্খ, মূর্খ। সব মূর্খ। লেখাপড়া শিখলে কেউ হাসতে পারে। এজন্যে তো এদের আমি দুচোখে দেখতে পারি না। মহামান্যের দরবারে এসে হাসি? সাহস তো কম নয়।

জামিল বালিশের ওপর একটা ঘুঁষি দিলো।

শুনুন সম্রাট, এ কিন্তু আপনার মহাকাব্য পড়েছে।

রেজা বিনীতভঙ্গিতে বললো।

পড়েছে? মূর্খ বুঝেছে কিছু?

জামিল চোখ বড় করলো। আমার মনে হলো ওর চোখে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি আছে। ঝক্‌ঝকে ধারালো ছুরির মতো। এ দৃষ্টি ঔপন্যাসিকের। যে কোন তুচ্ছ জিনিসের ওপর তীব্র আলো ফেলতে পারে। সে আলোয় বালি থেকে সোনা তুলে আনা যায়। এমন দৃষ্টি তো দেখার অসাধারণ ক্ষমতা যোগায়।

এই মূর্খ আমার উপন্যাস পড়েছে? ওয়ার এণ্ড পীস, দি ওল্ডম্যান এ্যাণ্ড দি সী, সিদ্ধার্থ পড়েছে? পড়েছে আমার নাটক? হ্যামলেট? ওথেলো? পড়েছে?

না সম্রাট পড়েনি।

গেট আউট। গেট আউট।

জামিল উত্তেজিত হয়ে উঠলো। রেজা আমাকে ইশারায় বেরিয়ে যেতে বললো। আমি বেরিয়ে এলাম। উত্তেজনা হয়তো ওর ক্ষতি করতে পারে। রেজা ওকে ঠাণ্ডা করে বালিশে শুইয়ে দিলো। ও আবার চোখ বুঁজলো।

জানিস জামেরী ও বেশির ভাগ সময় চোখ বুঁজেই শুয়ে থাকে।

কেন?

এ জায়গাটা ওর থাকবার জন্যে উপযুক্ত নয় বলে। তাছাড়া কোন মানুষকে ও মানুষ মনে করে না। ওর চোখে সব গরু, ছাগল, ভেড়া। কেবল ওর মা এলে একটু চুপচাপ থাকে।

স্যাড। অথচ ওর চোখ দেখে মনে হয় সুস্থ থাকলে ও একটা কিছু

করতে পারতো।

ঠিক বলেছিস। মাঝে মাঝে ঐ দৃষ্টি দেখে আমিও চমকে যাই। তুই আর একদিন আসিস জামেরী। আজ তাড়া আছে।

ঠিক আছে।

রেজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন রাস্তায় এলাম, তখন দুপুর গড়িয়েছে। ভীষণ খিদে পেয়েছে। বাইরে খাওয়ার মতো পয়সা নেই পকেটে। সেই কাফে রেঁস্তোরার কথা মনে হলো। কিছুক্ষণ গিয়ে বসলে মন্দ হোত না। কিন্তু সাত পাঁচ ভেবে আবার বাসার দিকে রওনা হলাম। ঘরে ফিরে স্টোভে ভাত আর আলু সেদ্ধ বসিয়ে দিলাম। এ কয়দিনের অমনোযোগে ঘরটা নোংরা হয়ে আছে। মিতুল দেখলে বলতো, তুমি যে কি নোংরা থাক জামী? আমি হাসলাম। তবু পরিষ্কার করার ইচ্ছে হলো না। যেমন আছে, তেমনই থাকুক। বর্তমানে জঞ্জালই সঙ্গী। কত ময়লা মনের ওপর জমে, সব কি আর সাফ্ করতে পারি? বাথরুমে শাওয়ার ছেড়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। ঝিরঝিরে জলে সেই তাঁতখান লেন ভাসতে ভাসতে আবার আমার সামনে এলো। আমি মনে মনে এক মহিলার মুখের ছবি আঁকবার চেষ্টা করলাম। বড় হয়ে মিতুল তাকে কোনদিন দেখেনি। ও যখন জেনেছে ওর জীবনে একটা ঘটনা আছে তখন থেকে ওর বুকে কষ্ট জমতে শুরু করেছে। বরফের মতো জমা। মাঝে মাঝে সে বরফ জল হয়ে নামে। আঃ তখন মিতুল আমার থেকে অনেক দূরে চলে যায়। মিতুলকে আমি ধরে রাখতে পারি না। মিতুলের জ্বর-ক্লান্ত মুখটা আমার বুকের সঙ্গে এসে মেশে। আমি ভুলে যেতে চাই অন্যসব ছবি আঁকার ব্যাপার-স্যাপার।

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে আমি টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। শরীরে বিশ্রী জড়তা। ঘুম পাচ্ছে। ভীষণ ঘুম। ঘুমোবার আগে আধো-চেতনায় টের পেলাম দোয়েলটা ইউক্যালিপটাস গাছের ডালে বসে ডাকছে। পাতা নড়ছে। ঝিরঝিরে বাতাস আমার ফুসফুসে ঢেউ তুলছে। আমি তলিয়ে যাচ্ছি। একবার মনে হলো কালো দোয়েলটা মিতুলের চুল হয়ে আমার বালিশে ছড়িয়ে আছে। আমি সে চুলে মুখ গুঁজেছি। ঘুম যখন ভাঙলো তখন ঘামে জবজব হিম আমার শরীর। দৃষ্টি গিয়ে শূন্যে ঠেকলো। সমস্ত মুখটা বিস্বাদে ভরা। তেতো স্বাদে জিহ্বা আড়ষ্ট। আমি কিছুই

ভাবতে পারছি না। সেই স্বপ্নে আমার ঘুম ভেঙে গেছে। সেই ভীষণ স্বপ্নটা অনেকদিন পর আজ আবার আমার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। দৃষ্টি ঘুরতে ঘুরতে ইউক্যালিপটাসের ডালে এসে পড়লো। দেখলাম দোয়েলটা চুপচাপ বসে। নাচানাচি নেই। একটু বিষণ্ণ যেন ও। আমি বিছানা থেকে নামতেই ফুড়ুৎ করে উঠে গেলো। জানালার কাছে গিয়ে দেখলাম ওটা অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। বাইরে সন্ধ্যা নামছে। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছি আমি। মুখ-হাত ধুয়ে তৈরি হয়ে নিলাম অফিস যাবার জন্যে।

পরদিন মিতুলের জ্বর আর এলো না। তারপর দিন না। তারপরও দিন না। মিতুল ভাল হয়ে গেলো। ওকে ভীষণ ফ্যাকাসে দেখায়। অথচ আমার চোখে মিতুল একদম অন্যরকম। দীপ্তিহীন অথচ আকর্ষণীয়। ওর দৃষ্টিতে আকাশ যেন থমকে আছে। মিতুল আমার দিকে হাতটা বাড়িয়ে বললো, আমি খুব রোগা হয়ে গেছি না স্বামী?

ঐ জন্যেই তো তোমাকে অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমি নীচু হয়ে মিতুলের চোখের পাতায় চুমু দিলাম।

জানো স্বামী অসুখের সময় আমি কতো কি আবোল-তাবোল ভাবতাম।

এখন আর ভেবো না কেমন?

ভাবনা যে এসে যায়!

জোর করে তাড়াবে।

পারি না যে!

তাহলে এক কাজ করবে, তখন শুধু আমার কথা ভাববে।

মিতুল হেসে ফেললো।

হাসছো কেন?

তুমিতো আমার সব ভাবনার ওপরে স্বামী।

উঁহু তা হবে না। আমার কথা ছাড়া তুমি আর কিছু ভাবতে পারবে না।

ঠিক আছে তাই হবে। এখন থেকে তুমি আমার ধ্যান, তুমি আমার জ্ঞান, তুমি আমার প্রার্থনা। হলো তো?

হুঁ।

মিতুল আমার হাতটা ধরলো। ওর মুখের সেই উজ্জ্বল হাসিটা যেনো ফিরে আসছে। অনেকক্ষণ মিতুল আমার হাত আঁকড়ে শুয়ে রইলো।

ড্রইংরুমে মিণ্টু উঁচু ভল্যুমে রেকর্ড বাজাচ্ছে। এই ওর এক নেশা। রেকর্ড জোগাড় করবে আর গান শুনবে। ঝর্ণা আর খালাআম্মা যেনো কোথায় গেছে। ঝি আমাকে এক কাপ চা দিয়ে গেলো। চা শেষ করে বললাম, আমি এখন যাই মিতুল?

না। অসুখের সময় কেবলই মনে হতো, তুমি সারাক্ষণ আমার পাশে থাকো।

আমার মনটা ছলকে উঠলো। ফিসফিসিয়ে বললাম, মিতুল, এবার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তুমি ভাল করে সেরে ওঠ। তারপর তোমার বাবার কাছে কথাটা বলবো। ইদানীং আমারও কেবল মনে হয়, সারাক্ষণ তুমি আমার পাশে থাকো।

কথাটা বলে আমার বুকটা যেমন ভরে উঠলো, তেমন মিতুলের মুখেও সুখী হাসি ছড়িয়ে রইলো। ও আমার হাতটা গালে ঘষলো। বালিশের ওপর পড়ে থাকা ওর লম্বা বেণী খুলে দিলাম আমি।

দেখ জামী, একটানা শুয়ে থাকার জন্যে চুলগুলো কেমন জট পাকিয়ে গেছে।

মিতুল, তোমার এই চুলের অরণ্য আমার প্রিয় বাসভূমি।

কতো কথা যে তুমি বানাতে পারো!

ওর চোখে ঝিলিক উঠলো। মিণ্টু রেকর্ডে মুকেশের একটা জনপ্রিয় গান বাজাচ্ছে। ঐ কণ্ঠ যেন আমারই কথা বলে দিচ্ছে। যে কথাগুলো বলতে না পারার জন্যে অহরহ আমার মনটা গুমরে মরে। আমি মিতুলের চুলে হাত ডুবালাম। মিতুল আমার হাতটা আঁকড়ে শুয়েই রইলো। পর পর মুকেশের কয়েকটা গান বাজালো মিণ্টু। আমি আর মিতুল চুপচাপ শুনলাম। কেউ কোন কথা বললাম না। দরজার কড়া নাড়ার শব্দ হলো। মনে হলো খালাআম্মা আর ঝর্ণা ফিরেছে। আমি উঠলাম। মিতুল কিছু বললো না। হাত ছেড়ে দিলো। আমার দৃষ্টি ওর ফ্যাকাসে পাতলা ঠোঁটে কেঁপে উঠে থেমে গেলো। ড্রইংরুমে গিয়ে দাঁড়াতেই ওরা ঘরে ঢুকলো। আমাকে দেখেই ঝর্ণা লাফিয়ে উঠলো, আপনি কখন এসেছেন জামেরী ভাইয়া?

অনেকক্ষণ। তোমার জন্যে অপেক্ষা করে হয়রান হয়ে গেছি।

ইস। তাই বুঝি?

ঝর্ণা মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো। খালাআম্মা হেসে শোবার ঘরে চলে গেলেন। ঝর্ণা আমাকে এক কোণায় ডেকে নিয়ে কানে কানে বললো, জানেন ভাইয়া, আপু না জ্বরের ঘোরে শুধু আপনার নাম বলতো? আমি ওর পিঠে দুকিল বসালাম।

ডেঁপো হচ্ছো।

ঝর্ণা হাসতে হাসতে অন্য ঘরে চলে গেলো। মিন্টুর গান বাজানো শেষ হয়েছে। ও বসে বসে রেকর্ড গোছাচ্ছে। ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার থার্ড উপন্যাসটা কি বেরিয়ে গেছে জামেরী ভাই?

না। প্রচ্ছদের জন্যে আটকে আছে।

ছাপা তো হয়ে গেছে?

হ্যাঁ, মাস দুই আগে।

এতদিনেও প্রচ্ছদ হয়নি?

কি করবো বলো, আর্টিস্ট ঘোরাচ্ছে। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, এই তার উত্তর।

উঃ আমি হলে সইতাম না। সিওর খুনোখুনি হতো। তাছাড়া আপনাদেরও দোষ আছে জামেরী ভাই, শুধু প্রতিষ্ঠিত শিল্পীর কাছে যান। কেন, নতুন শিল্পী খুঁজে বের করতে পারেন না? নতুনদের অনেকের হাত কিন্তু চমৎকার।

ঐ খুঁজে বের করার অভাবেই তো আমরা এগুতে পারছি না। এস্টাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে যেতে আমাদের যতো ভয়।

একদম ট্রু কনফেসন।

মিন্টু হাসলো। আমি বেরিয়ে এলাম। সিঁড়িতে পা রাখতেই সেই প্যারানয়ার রুগীর একটা শব্দ খট্ করে আমার কানে এসে বাজলো। মূর্খ? লোকটা সারাক্ষণ মূর্খ বলে গালাগাল করেছে। আমার মনে হলো, আমি যে সিঁড়িতেই পা রাখি, সেখান থেকেই সেই শব্দটা উঠে আসছে। মূর্খ! আমার শরীরে কাঁপুনি জাগলো। মনে হলো, ঐ শব্দটা জীবনের সর্বজ্ঞ সত্য। কিছুই জানি না। জানতে চেষ্টা করার আগেই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। আমি খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে উঠলাম। মনে হচ্ছে, পারছি না। উঠতে কষ্ট হচ্ছে। সেই সম্রাট জামিলের অসাধারণ দৃষ্টি গোটা সিঁড়ি আলোকিত করে রেখেছে। আমি প্রচণ্ড মূর্খ, ভণ্ড, প্রতারক।

জীবনের সমস্ত অন্ধকারের তলায় চাপা পড়ে আছি। বেরুবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না। নিঃশ্বাস নিতে বড় কষ্ট। কেবল চাপ চাপ অন্ধকারের দলা প্রতি নিঃশ্বাসে বুকের ভেতর ঢুকে যায়। আমার দুচোখ ছাপিয়ে জল আসতে চায়। শেষ সিঁড়িতে উঠে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করতে হবে জানি না। জানি না পথ কোথায়। ভয় হলো। এখানে বসেই কি আমার সারাজীবন কেটে যাবে? আমার সামনে দিয়ে ষোড়শ শতাব্দীর ইতালী হেঁটে গেলো। কাঠগড়ায় গ্যালিলিওকে দেখলাম। আমার সামনে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠলো। দেখলাম, ব্রুনো পুড়ছে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। ইদানীং খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে না। শারীরিক দুর্বলতা হতে পারে। পকেট হাতড়ে চাবি বের করে তালা খুললাম। দক্ষিণের জানালা দিয়ে একঝলক ঠাণ্ডা বাতাস এসে চোখে-মুখে লাগলো। এক জগ পানি খেলাম। মাঝে মাঝে এমন হয়। নিজের বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ আক্রোশে দাঁত কিড়মিড় করি। নিজের বিরুদ্ধে আমার সবচেয়ে বড় বিদ্রোহ। যখন শাসন করি, তখন নিষ্ঠুরের মতো করি। যখন ভালবাসি, সে ভালবাসার গায়ে কোন আঁচড় দেই না। এই মন আমার শত্রু। আমার বন্ধু। আমার প্রেমিক। যখন নিজের সঙ্গে কথা বলি, তখন বড় অন্তরঙ্গ পরিবেশ গড়ে ওঠে। যখন রাগারাগি করি, তখন মাথা ঝিমঝিম করে। বুকের ধুক্‌পুকানি বেড়ে যায়। নিজের সঙ্গে একতরফা আপোষ আর হয়ে ওঠে না।

স্টোভ জ্বালিয়ে এক ফ্লাস্ক চা বানালাম। নিজের ওপর জেদ হলো। আজ রাতে আমি পঞ্চাশ পৃষ্ঠা লিখবো। গত তিনদিনে দশ পৃষ্ঠা লিখেছিলাম। পুরোটা কেটে ফেললাম। মনে হলো, কিছু হয়নি। আবার লিখতে শুরু করলাম। একটা গতি অনুভব করছি। ভরসা পাচ্ছি। হয়তো ভাল একটা অংশ দাঁড় করাতে পারছি। পাঠক নিরাশ হবেন না। একটানা পনেরো পৃষ্ঠা লেখার পর থামলাম। আর এগুতে পারছি না। জানি আর পারব না। চুল ধরে টানলাম। চা খেলাম। পায়চারী করলাম। আবার চেয়ারে এসে বসলাম। কিন্তু কলম বেঁকে বসেছে। মাথা শূন্য। বিরক্ত হলাম নিজের ওপর। যারা একটানা লিখে যায় তারা আমার বিস্ময়। তারা আমার নমস্য। আমি তিরিশ লাইন লিখলে দশ লাইন কাটি। কিছুতেই মন ভরে না। খুঁতখুঁতি থাকে। এই অতৃপ্তি আমাকে

তাড়িয়ে মারে। অতৃপ্তির যন্ত্রণা বরফ-জলে চুবিয়ে নাকানি-চুবানি খাওয়ায়। আমি তখন কাঁদি। কাঁদতে আমার ভাল লাগে। সেই ভাললাগা আঁকড়ে ধরে জীবনের বিমূর্ত ব্যঞ্জনায় আমি দিশেহারা হই।

কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলাম। বাইরে ঘোর অন্ধকার। আজ অমাবস্যা। রাস্তার দুটো বাল্ব নষ্ট হয়ে গেছে। মিটমিটে আলো ভিখিরীর থালার পাই পয়সার মতো। থাকা না থাকা সমান। চেষ্টা করেও আমি দূরের কোনকিছু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। আসলে এমনি হয়। মাঝে মাঝে আমরা কোনকিছুই পরিষ্কার দেখি না। আমার বুকে বেদনা। আমি জানি না, কেন। আমি তো জানি, শিল্পের কাছে ফাঁকি নেই। ক্ষমা নেই। শিল্প ফাঁকি সহ্য করে না এবং ক্ষমাও দেয় না। শিল্পের গোলকধাঁধায় কখনো পথ হারাই। তখন বিবেক নামক আরিআদনি ওপর থেকে রেশমী সুতোটা ঝাঁকায়। আমি বুঝি, শিল্প গোলকধাঁধা। মিনোটওর মহাকাল। মহাকালকে জয় করতে না পারলে শিল্পের সাধনা মিথ্যে।

বাতি জ্বেলে বই খুঁজতে বসলাম। আজ রাতে ঘুম আসবে না। বইয়ের গাদা থেকে আবু সয়ীদ আইয়ুবের 'গালিবের গজল থেকে' বইটি টেনে বের করলাম। গালিব আমার প্রিয়। এই বই আমি অসংখ্যবার পড়েছি। প্রতিটি শের আমার মুখস্থ। পড়ে পড়ে আশ মেটে না। যখনই পড়ি, প্রতিবারই নতুন মনে হয়। "দুঃখের রাগরাগিনীর মূল্যও বুঝতে শেখো, হৃদয় আমার; অস্তিত্বের এই বিচিত্র বীণাটি একদিন নিঃশব্দ হয়ে যাবে।"

সব বীণাই একদিন নিঃশব্দ হয়ে যায়। আমি শুয়ে শুয়ে গালিবের জীবনী পড়লাম। শেষ লাইনটা আমার বুকে গেঁথে রইলো, "এতখানি প্রতিভাধর একটি মানুষের জীবন আর একটু কম যন্ত্রণাময় হলে বিধাতার কি ক্ষতি হতো ?" আমার মনে হলো, যন্ত্রণা ছিল বলেই তাঁর বেদনায় তীব্রতা ছিল। সেখান থেকে তিনি পরিশুদ্ধ আনন্দের ফুল চয়ন করেছিলেন। সে ফুল শতাব্দীকাল পরও অম্লান থাকে। সৌরভ বিনষ্ট হয় না। আমার মতো কতো অসংখ্যজন সারারাত গালিব পড়ে কাটিয়ে দিতে পারে। দারিদ্র্য, হতাশা, নিন্দুকের নিষ্ঠুরতা, বিদ্বেষ ক্ষত-বিক্ষত করেছিলো গালিবকে। কিন্তু নিঃশেষ করতে পারেনি তাঁর হৃদয়ের অমৃত। সেই অমৃতের স্পর্শে

ছিনিয়ে নিয়েছিলেন অমরতা।

"হে ঈশ্বর, কাল আমাকে মুছে
ফেলছে কেন?
পৃথিবীর পৃষ্ঠার উপর আমি
বাড়তি হরফ তো নই।"

এই শেরটি আওড়াতে আওড়াতে আমার চোখ বুঁজে এলো। বিড়বিড় করলাম, কাল তোকে মুছে ফেলেনি। তুই কালকে জয় করেছিস। তুই শালা হারামী শিল্পের গোলকধাঁধার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার পথ পেয়েছিলি। তোকে আর পায় কে? তোকে ঈর্ষা করতে করতে আমার ঘুম পাচ্ছে। আস্তে আস্তে আমার ইন্দ্রিয় বধির হয়ে গেলো।

সকালে চোখ ধাঁধানো আলোয় যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলাম মাথার ওপর আলো জ্বলছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না। বইটা গড়িয়ে নীচে পড়েছে। ওটাকে তুলে বালিশের নীচে রাখলাম। পাশ ফিরে শুয়ে আর একটু ঘুমুবো বলে যেই ঘুরেছি, দেখলাম দোয়েলটা এসেছে। হঠাৎ মনে হলো, তাঁতখান লেনে আমার এখনো যাওয়া হয়নি। ওখানে যেতে হবে। না গেলে মিতুলের বড় ক্ষতি হবে। ঘুম এলো না। চুপচাপ শুয়ে রইলাম। ইউক্যালিপটাসের ফাঁকে ঝকঝকে আকাশটা টুকরো টুকরো হয়ে আছে।

তখনই নিঃশব্দে দরজা ঠেলে রায়হান ঢুকলো। আমি অবাক হলাম। সারারাত আমি দরজা খোলা রেখেই ঘুমিয়েছি তাহলে? পরক্ষণে হাসলাম। কিইবা আছে আর নেয়ার মতো। যা সম্পদ, তা আমার বই। এ দেশে বই কেউ চুরি করে না।

কি রে, হাসছিস যে?

এই সাত সকালে কোথেকে এলি?

হাসলি কেন আগে বল?

এমন কিছু নয়। সারারাত দরজা খোলা রেখেই ঘুমিয়েছি। পরক্ষণে ভাবলাম, চোরের নেয়ার মতো কিছুই নেই ঘরে।

কেন, তুই নিজে আছিস তো? তুই কি কম মূল্যবান?

কিন্তু এ বস্তু তো বিক্রী করা যায় না রায়হান। যে জিনিসের বিনিময়ের মূল্য নেই, তাকে নিয়ে লাভ কি?

তা বটে। এখন চা খাওয়া।

হকার কাগজ দিয়ে গেলো। রায়হান সেটায় চোখ বুলোতে লাগলো। মনে হলো, ও সারারাত জেগে কাটিয়েছে। একটুও ঘুমোয়নি। মনের মধ্যে আমার সাইকির খবরের জন্যে ঝড়। কিন্তু নিজ থেকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। স্টোভে চা বসিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। ঠাণ্ডা পানিতে হাতমুখ ধুয়েও জ্বালা কমলো না। আরো বাড়লো। সাইকি আমার বুকের মধ্যে ঝক্‌ঝকে রূপালী মাছ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। সাইকির জন্যে আমার বুকটা এখন সমুদ্র।

রায়হান এক গ্লাস চা খেয়ে আমার বিছানায় টানটান হয়ে শুয়ে পড়লো।

আমার ঘুম পাচ্ছে জামেরী।

ঠিক আছে, একটা কড়া ঘুম দিয়ে দে।

আমি নির্বিকার। কোনরকম আগ্রহ দেখালাম না। জানি, কথা বলার জন্যে রায়হান এসেছে। ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে। ওর বুকটা কথা বলার জন্যে ফেটে যেতে চাইছে। আমি খবরের কাগজটা মনোযোগ দিয়ে পড়তে শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর দেখলাম, ও উস্‌খুস্‌ করছে।

কাল সারারাত ঘুমোইনি জামেরী।

কেন?

কাগজটা রাখ না।

আমি হাসলাম। চাঁদ আস্তে আস্তে পথে আসছে। এখন কথার তোড়ে ভাসিয়ে দেবে আমায়। যেহেতু আমার কোন কাজ নেই, তাই মনোযোগী ছাত্রের মতো ওর সব কথা শুনতে পারবো। ওর কথা আমার শোনা দরকার।

জানিস জামেরী, এ কদিন সন্ধ্যা হলেই ছন্দাদের বাড়ি থেকে একটু দূরে প্রতিদিন দাঁড়িয়ে থেকেছি। অন্ধকার হলেই কে যেন আমার পায়ে শিকল দিয়ে ওখানে টেনে নিয়ে যায়। মাধবী লতার ঝাড়টা বুকে আগুন হয়ে জ্বলতো। আগে ছন্দা আমাকে ওর জন্যে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলতো। ও এখন আর আমাকে চায় না। তবু আমি দাঁড়িয়ে থেকেছি! কখনো দেখেছি, ওরা হাসতে হাসতে বেরিয়েছে। ছন্দার মুখে আলোর দীপ্তি। বিমানবিধ্বংসী কামান থেকে গোলাগুলো বেরিয়ে লাল হয়ে আকাশে যেমন

ছড়িয়ে যায়, ছন্দার খুশীটা তেমনি। হ্যাঁ জামেরী, আমি ঐ খুশীতে ধ্বংসই দেখেছি, কোন মঙ্গল নয়। কখনো দেখেছি লোকটাকে একা বেরিয়ে যেতে। আমি কিছু করতে পারিনি। হাতের আঙুল কোন ট্রিগার খুঁজে পায় না। আমি নিঃশব্দে সরে আসি। বার বার মনে হয়, আমি কি হেরে যাচ্ছি? কেন? ছন্দার প্রতি ভালবাসায়, না লোকটার প্রতি দয়ায়? না, কোনটাই না। যা করবো বলে পণ করেছি, তা আমার করা চাই। কোন আবেগ-তাড়িত ছেঁদো কথায় আমি পিছু হটে আসব না। ছন্দাকে আমি ভালবাসি। ছন্দাকে আমি চাই। এর বাইরে আমি আর অন্যকিছু বুঝি না। ছন্দা আর একটি লোককে নিয়ে সুখে সংসার করবে ঐ ভেবে আমি শান্ত্বনা পাব এ ধরনের মধ্যযুগীয় প্রেমে আমার আস্থা নেই। আমি তখন আবার আপনশক্তিতে ফিরে আসি। কাল সারারাত এক বারে বসে প্রচুর গিলেছি। মাথা এখন ভীষণ গরম। ভীষণ গরম।

রায়হান বিড়বিড় করলো। একবার ইচ্ছে হলো, ঘাড় ধরে ওকে ঘর থেকে বের করে দেই। কিন্তু পরে ভাবলাম, তাতে কি সাইকির কোন উপকার হবে? আমার সমস্ত বুদ্ধি ঘোলাটে হয়ে যায়। আসলে আমার কিছু করার নেই। আমার ভূমিকা নীরব দর্শকের। এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার জন্যে সাইকিকে বলতে পারি। কিন্তু ওকে কোথায় পাব? ঠিকানা তো জানি না। সাইকি যদি আমাকে অন্যরকম সন্দেহ করে? সেই ঘৃণার দৃষ্টি তো আমি ভুলে যাইনি।

কি ভাবছিস জামেরী?

কিছু না।

আমাকে ঘৃণা করছিস?

আমি উত্তর দিলাম না।

ঘৃণা তুই করবি জানি। কিন্তু এছাড়া আমার কোন উপায় নেই। পিছু হটতে আমি চাই না।

আমি খবরের কাগজে মনোযোগ দিলাম। কিছুক্ষণ ও পায়চারি করলো। সিগারেট জ্বালালো। মুখ নীচু অবস্থায় আমি ওর পা দেখলাম। জুতোর মচ্‌মচ্‌ শব্দ শুনলাম। এক সময় ও আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।

তুই কি আমার সঙ্গে কথা বলবি না জামেরী?

তুই এখন চলে গেলে আমি খুশী হব।

তুই আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছিস?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে।

রায়হান আর কোন কথা না বলে শিথিল পায়ে বেরিয়ে গেলো। এই প্রথম আমি ওর সঙ্গে বেশ কড়া রকমের দুর্ব্যবহার করলাম। অথচ ওকে বরাবর আমি বুঝতে চেয়েছি। সহানুভূতির সঙ্গে ব্যবহার করেছি। কিন্তু ওর এই একগুঁয়ে জেদ আমাকে উত্তেজিত করেছে। এই বর্বরতা সহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তবুও রায়হানকে বের করে দিয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। আসলে ওর ভেতরে একটা জ্বালা আছে। লেজে বারুদ নিয়ে ও পাগলের মতো ছুটে বেড়াচ্ছে। সে বারুদ যখন-তখন ফস্ করে জ্বলে ওঠে। রায়হানকে আমার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা দরকার। আমি বরাবর সেটা করে এসেছি। আজকে আমি কিছুতেই নিজেকে সংযত রাখতে পারিনি। মনে মনে লজ্জিত হলাম। ঘরে থাকতে ভাল লাগল না। কাপড় পরে বেরিয়ে এলাম। অফিস থেকে ছুটি নিয়েছি সাতদিনের। মাঝে মাঝে কিছুতেই অফিস করতে ইচ্ছে করে না। তখন হুট করে বেরিয়ে যাই কোথাও। মিতুল রাগ করে। বলে, বলা নেই কওয়া নেই তুমি কোথায় যে উধাও হয়ে যাও। তুমি বোঝ না সে কয়দিন আমার কেমন নির্ঘুম রাত কাটে। ও রাগ করে তারপর সাতদিন আর কথাই বলে না। সে রাগ ভাঙাতে অনেক সাধ্যি-সাধনা করতে হয়। কিন্তু আমারও উপায় নেই। মন যখন বাঁধন-হারা হয়, তখন পেছনের কথা আর মনে থাকে না। কখনো হয়তো অফিস থেকে চলে যাই। মিতুলকে বলে যাওয়ার সময় থাকে না। ছুটির আর দুদিন বাকি আছে। আগামী পরশু ফুরিয়ে যাবে। আজকেই আমার তাঁতখান জেনে যেতে হবে। আসলে পুরো ঘটনা দেখার জন্যে আমার মনেও একটা কৌতূহল আছে।

রিকশার জন্যে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলাম। এক সময় দেখলাম, সাইকি আর একটি লোকের সঙ্গে আমার সামনে দিয়ে রিকশায় চলে গেলো। আমি তাকিয়েই থাকলাম। কিছুদূর গিয়ে সাইকি পেছনের পর্দা তুলে আমাকে দেখলো। দৃষ্টিতে সেই অবিশ্বাসী ঘৃণা। আজ ও কি ভাবলো কে জানে। আমার মনে হলো রিকশা থামিয়ে বলি, সাইকি তুই পালিয়ে

যা। ভালবাসার লোক নিয়ে অন্য কোথাও চলে যা। কিন্তু আমার ভাবনার সামনে দিয়ে রিকশা কোথায় মিলিয়ে গেলো টের পেলাম না। রায়হান ঠিকই বলে, এ্যাকশনের চাইতে আমার ভাবনা বেশি। অথচ এই খবরটা সাইকিকে জানানো কতো জরুরী ছিলো। জনারণ্যে ফুটপাথে আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা আশ্চর্য কাডিওগ্রাম দিয়ে আমার বুকের ভাষাটা সাইকিকে যদি পড়াতে পারতাম? আমি এতকাল ভালবাসা পেয়েছি। ঘৃণা পাইনি। সাইকির ঘৃণায় আমার সর্বশরীরে আগুন।

তাঁতখান লেনের ২/৯, নাম্বারের ছোট্ট বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে যখন দরজায় কড়া নাড়লাম, তখন টের পেলাম, হার্টবিট অস্বাভাবিকরকম বেড়ে গেছে। যদি কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা ঘটনার মুখোমুখি হই? ছোট্ট একটা ছেলে এসে দরজা খুলে দিলো।

জিজ্ঞেস করলাম, বাড়িতে কে আছে?

আম্মু আছে। আর কেউ নেই।

তোমার আম্মুকে ডাক।

ছেলেটি আমাকে বসতে দিলো। ঘরের অবস্থা খুব ভাল নয়। নড়বড়ে চৌকি একটা একপাশে। একখানা হাতলঅলা চেয়ার। দেয়ালে তিন বছর আগের পুরোন ক্যালেণ্ডার। জানালার ওপর একগাদা ঔষধের শিশি। কেমন দম আটকানো পরিবেশ। আমার মনটা চুপসে গেলো। ভদ্রমহিলা এলেন। রোগা। লম্বা। খুঁজে দেখলে চেহারায় যেনো কিছুটা লাবণ্য পাওয়া যায়। আমি পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাঁকে দেখলাম। তিনি কিছুটা বিব্রত হলেন।

আপনি কাকে চান? বাবুর আব্বা তো বাসায় নেই।

আমি আপনাকে চাই।

আপনাকে আমি ঠিক—

না, আমাকে আপনি চিনবেন না। কখনো দেখেননি। আপনি মিতুলকে চেনেন?

মিতুল? ভদ্রমহিলা চমকে উঠলেন। মুখটা নীচু করে চুপ করে রইলেন। দেখলাম হাতের আঙুল কাঁপছে। আস্তে আস্তে বললেন, মিতুল কেমন আছে।

ভাল। ও আপনাকে দেখার জন্যে ব্যস্ত হয়ে আছে।

না।

ভদ্রমহিলা তীব্র চাপা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন। আমি অবাক হলাম।

না কক্ষনো না। মিতুল আমাকে দেখতে পাবে না।

কেন?

মিতুলের মায়ের অধিকার আমি ত্যাগ করে এসেছি।

ত্যাগ করলেই তো ত্যাগ করা হয় না। মিতুলের সঙ্গে আপনার নাড়ির সম্পর্ক।

উঃ চুপ করুন। এসব কথা আমি জানি।

মিতুলের জন্যে আপনার কোন ভালবাসা নেই?

এ প্রশ্ন বৃথা। দূর থেকে ভালবাসার কোন মানে নেই। প্রতিদিনের সাহচর্যে ভালবাসাকে জীবন্ত রাখতে না পারলে মরা ভালবাসায় লাভ কি?

আমি ধাক্কা খেলাম। সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিতে পারলাম না। মুহূর্তে তার চোখে চোখ ফেললাম। এই মুহূর্তে আমি তাঁকে বুঝতে পারছি না। তবে মিতুলের ব্যাপারে তাঁর কঠিন মনোভাব আমাকে আহত করলো। ভদ্রমহিলার ভেতরে কোথাও যেন শানিত ইস্পাতের চমক আছে।

কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন না যে, আপনাকে দেখার জন্যে মিতুল পাগল হয়ে আছে।

কিসের দেখা—ভালবাসার না ঘৃণার?

সেটা আমি জানি না।

হঠাৎ ভদ্রমহিলা খুব শান্ত গলায় বললেন, যে মা দুই বছর বয়সে সন্তানকে ত্যাগ করে, তার জন্যে সন্তানের কোন ভালবাসা থাকে না।

এটা আপনার মনগড়া কথা। মিতুল তা নাও ভাবতে পারে।

এ হয় না। হতে পারে না।

ভদ্রমহিলা নিজেকেই কথাগুলো বললেন।

আপনি বসুন না। চা আনি।

আমাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে উনি উঠে গেলেন। মনে হলো আমার সামনে থেকে পালালেন। এখন তাঁর নিজের সঙ্গে যুদ্ধ হবে। রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। আমার খুব খারাপ লাগতে শুরু করলো। আমি যেন একটা পাতাঝরা গাছে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়েছি। সেটা এখন নড়ছে। কিছুতেই

থামতে পারছে না। তবে উনি সাধারণ কোন মহিলার মতো না। তাঁর ব্রেনে অনেক অতিরিক্ত সেল আছে। সে সেলে চিন্তা-ভাবনার উৎপত্তি হয়। সে অঙ্কুর বাড়তে বাড়তে বিশাল হয়। তারপর কামড়ে ধরে। তার সামনে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো। আসলে তা নয়। মিতুলের জন্যে আমি সব পারি। আমি রাজা প্রিমিয়ামের মতো হেক্টরের মৃতদেহ ভিক্ষা চাইতে এসেছি। একিলিস দয়া করেছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলা মিতুলের জন্যে কোন দয়া করবেন কিনা আমি জানি না। ভেবেছিলাম চিরাচরিত বাঙালী মেয়েদের মতো মিতুলের কথা শুনে কাঁদবেন। দুঃখ করবেন। মিতুলকে দেখার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করবেন। কিন্তু পেলাম তার উল্টো। তিনি নিজের কৃতকর্মের জন্যে সন্তানের কাছে জবাবদিহি করতে প্রস্তুত নন। চা আর বিস্কিট নিয়ে আবার এলেন। আমি চায়ের কাপটা তুলে নিলাম। আর কি কথা বলবো বুঝতে পারছিলাম না। উপন্যাস লেখার সময় প্রচুর কথা বানাতে পারি। কিন্তু আলাপে বসলে বেশি কথা বলতে পারি না। মাঝে মাঝে নিজের এই অক্ষমতার জন্যে নিজের ওপর রাগ হয়।

মিতুল এখন কি করে?

চাকরি করছে।

আমি চা শেষ করলাম।

ও একদম আপনার মতো হয়েছে দেখতে।

ভদ্রমহিলা চুপ।

আমি ওকে নিয়ে কবে আসবো?

কোনদিনও না।

ভদ্রমহিলার কণ্ঠে ঝাঁঝ। কিছুটা রূঢ়ও।

ওকে আপনার দেখতে ইচ্ছে করে না?

জানেন তো, সব আবেগকে প্রশ্রয় দিল বেঁচে থাকাটা কঠিন হয়।

তার এই একটি উত্তরের জন্যে আমি তাকে নমস্য মানলাম। উপন্যাসে এই ধরনের একটি সংলাপের জন্যে কয়েক রাত জাগতে হয়। আর উনি কেমন অবলীলায় বলে গেলেন। আমি বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলাম। উনি পেছন থেকে ডাকলেন, শুনুন, কিছু মনে করবেন না, আপনি মিতুলের কে হন?

মিতুলের বন্ধু।

উনি হাসলেন।

আপনি ঠিক এই সময়ে শুক্রবারে মাঝে মাঝে আসবেন।

আমি চলে এলাম। আমার কাছ থেকে তিনি মিতুলের খবর জানতে চান। সে জন্যেই আমাকে আসতে বলেছেন। অথচ ওর মুখোমুখি হবার সাহস তাঁর নেই। ওকে ভয় না কি নিজেকে? কে জানে? বোঝা মুশকিল। তবে কাঠিন্যের অন্তরালে গোপন ফল্গুধারার পথ রোধ করার সাধ্যি কারো নেই। আমার বিশ্বাস, মিতুলের জন্যে তাঁর একটা বিশেষ জায়গা আছে। যেহেতু মিতুল তাঁর যৌবনের ফসল। মিতুল তাঁর মাতৃত্বের অনাস্বাদিত পুলক। তিনি কি সুখী হয়েছেন? ভিন্ন বন্দরের কালো মাটিতে তাঁর সুখের বীজ কি তড়বড়িয়ে বাড়ছে? চেহারায় তো তেমন কোন ছাপ দেখিনি। হয়তো সুখীই হয়েছেন। নইলে আলী আহমদ সাহেবের স্বাচ্ছন্দ্যের কোল থেকে অমন ছিটকে বেরিয়ে পড়লেন কেন? দারিদ্র্যের নিবিড় উত্তাপ জীবনের মধুর লগ্নটিকে বিষিয়ে তোলেনি হয়তো। সবই আমার কল্পনা। আমি এই মুহূর্তে ভাল দিকটাই ভাবতে চাইছি। ঘুণে-ধরা জীর্ণ জীবনের হতাশা অন্তত মিতুলের মা-র জন্যে নয়। তাই যেন হয়। তাই যেন হয়। আমি বিড়বিড় করলাম। এখানে আবার আসবো। মিতুলের জন্যেই আসতে হবে। ইস্পাতের অন্তরালে যে অবিশ্বাসী ভালবাসা থাকে, তা আমি অস্বীকার করছি না। তাকে সময় দিতে হবে। প্রস্তুতির সময়। আমি দেখবো নদীর বুকে লগি কতোটা ডোবে। খুঁজে বের করবোই মিতুলের জন্যে নির্ধারিত বিশেষ কোন্দরটি। যতোই চড়ায় আটকে যাক নৌকো।

মিতুল তুই একটুও ভাবিসনে, তোকে আমি উজ্জ্বল আলোকিত বন্দরে নিয়ে যাবো। এখন চারদিকে ঘন কুয়াশা। সেজন্যেই সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে আমাদের। আমার বিশ্বাস কুয়াশা কাটবে। তুই তো জানিস না মিতুল নাবিক হওয়া বড় কষ্টের। পদে পদে বিপদ ওঁত্ পেতে থাকে। তোর মাকে আমি ভালবেসেছি। কোন অমর্যাদা করিনি। এখন শুধু রোদের আশায় হাত বাড়িয়ে রেখেছি।. তোর মা-র জলপাই বনের ঘন কুয়াশা উড়িয়ে রোদ আসবে। আসতেই হবে। হ্যাঁ, মিতুল মানুষের মনটা ভীষণ নীল কুয়াশার মতো। সে কুয়াশায় নিজেরাই পথ

হারায়। তুই আর আমি তেমন একজন মা খুঁজে নেব যে আমাদের জন্যে আশীর্বাদের ঘট নিয়ে দুয়োরে দাঁড়াবে। চিরকালের জন্যে। তোর কষ্ট তার নিজের করে নেবে।

পাঁচ

অবশেষে আমার তৃতীয় উপন্যাসটা বেরুলো। প্রকাশকের কাছ থেকে প্যাকেটটা এসেছে গতদিন। এখনো খুলিনি। মিতুল এলে খুলবে। নইলে ও রাগারাগি করে। বই ছাপা হওয়ার আগ পর্যন্ত ভীষণ টেনশনে থাকি। বেরিয়ে গেলে কেমন একটা নিরাসক্তি পেয়ে বসে আমাকে। লাফালাফি করে খুলে দেখার খুব একটা ইচ্ছেও নিজের মধ্যে নেই। বসে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিলাম—তখনি মিতুল এলো। সকালে বই বেরুনোর খবরটা ওকে দিয়েছিলাম। দুপুরে ও এলো। আমি কিছু বলার আগেই বইয়ের প্যাকেটটা টেবিলের ওপর থেকে টেনে নিয়ে চটপট খুলে ফেললো। বড় বড় শ্বাস টেনে নতুন বইয়ের গন্ধ নিলো। আমার হাসি পেলো। হঠাৎ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ক্ষেপে গেলো।

হাসছো যে?

তোমার কাণ্ড দেখে না হেসে উপায় আছে।

ভাল হবে না বলছি।

ঠিক আছে বাবা এই মুখে আঙুল দিয়ে বসলাম।

থাক আর ভেজা বেড়ালের মতো ভাব করতে হবে না।

আচ্ছা জামী বই বেরুলে তোমার কেমন লাগে?

ভাল লাগে।

কেমন ভাল?

এই তোমাকে ভালবেসে যেমন সুখ পাই তেমন।

ঠিক বলেছ?

মিতুল আমার গলা জড়িয়ে ধরে। আমার ঘাড়ে নাকটা ঘষতে ঘষতে বলে, হ্যাঁ ঠিক সেই রকম একটা গন্ধ বেরুচ্ছে।

কি রকম?

ঐ নতুন বইয়ের মতো। মনে হচ্ছে তোমার সারা শরীরটা একটা চমৎকার নতুন বই।

মুহূর্তে আমার অনুভূতি পাল্‌টে গেলো। আঃ এজন্যেই তুমি আমার নিঃশ্বাস মিতুল। ঠিক মুহূর্তে মনের কথাটি বলতে পারো। আর কেউ আমাকে এমন করে বলতে পারে না। তুমি বোঝ আমি কি চাই। এজন্যেই তোমার সঙ্গে আমার এতো ভাবের খেলা। এ খেলা না থাকলে আমি হয়তো অনেক আগে ঝিমিয়ে যেতাম। জীবনের অর্থ যেতো বদলে। আমার প্রথম বইটা যখন বের হয় তখন মিতুলের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। দ্বিতীয় বইটা যখন বের হয় তখন কেবল পরিচয়ের সূত্রপাত। তৃতীয় বইটা প্রকাশের সময় মিতুল সম্পূর্ণ আমার। এখন ভালবাসা বলতে আমি বুঝি মিতুল। ও যেন আমার নতুন বইয়ের মতো আনন্দ এবং উত্তেজনা। অন্য অর্থে গর্ব।

ওঃ জামী, তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, আজ আমার জন্মদিন।

সত্যি? আমার ভীষণ খুশী লাগছে। বলো এখন কি করবো?

কি আবার করবে। আর খুশীরই বা কি আছে?

মিতুল উঠে জানালার ধারে গেলো। ছটফট করলো। কিছুক্ষণ ঘুরে-ফিরে আবার আমার কাছে এসে দাঁড়ালো।

জানো জামী, বাবা আজ সকালে আমার মাথার কাছে একগাদা ফুল দিয়েছিলো।

তাহলে ফুলের গন্ধে তোমার ঘুম ভেঙেছে?

হ্যাঁ।

আমার ভাবতেই খুব ভাল লাগছে।

কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগেনি।

কেন?

জানি না।

মিতুল আর কথা বললো না। আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম। ওর দৃষ্টি পালটে যাচ্ছে। বাবা-সম্পর্কিত কোন কথায় সবসময় ওর দৃষ্টি পাল্‌টে যায়। ও তখন অন্য মানুষ।

অসুখের সময় দেখতাম, বাবা প্রায়ই রাত জেগে আমার মাথার কাছে বসে আছে। আমার ভীষণ বাজে লাগতো। কান্না পেতো।

বাবার প্রতি তুমি বড্ড অবিচার করো মিতুল?

কক্ষনো না।

মিতুলের চোখ ছলছলিয়ে উঠলো।

মা-র ভালবাসা আমি মা-র কাছ থেকেই পেতে চাই জামী। আঃ আজ যদি আমার মা কাছে থাকতো। জন্মদিনে মা না থাকাটা খুব কষ্টের। জন্মের সঙ্গে বাবা-র কোন প্রত্যক্ষ যোগ থাকে না জামী। সে যোগ মায়ের।

আমার বুকটা ধ্বক্ করে উঠলো। তাঁতখান লেনের ঘটনাটা মিতুলকে বলা হয়নি। ইচ্ছে করেই বলিনি। ওকে কি বলবো? শুধু মা-র সঙ্গে দেখা হয়েছে বললে ও খুশী হবে না। একগাদা প্রশ্ন করবে, অথচ ওর জন্যে আমি তেমন কোন খবর আনতে পারিনি, যে খবরে মিতুলের কষ্ট কমবে।

তোমাকে আমি একটা কাজ দিয়েছিলাম জামী, তুমি সেটা করোনি?

কোন্‌টা?

তুমি আমার মাকে খুঁজবে কথা দিয়েছিলে?

ও একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। আমার ঠোঁট কাঁপলো। হঠাৎ করে কি বলবো বুঝে উঠতে পারলাম না। মিতুলের কাছে মিথ্যে বলতে আমার বাধে। তবু আজ বলতে হলো।

আমি তো খুঁজছি মিতুল। এখনো—

খোঁজাখুঁজিই সার হবে। জানি, পাবে না। হারিয়ে-যাওয়া জিনিস সহজে পাওয়া যায় না।

আমি ঠিকই পাবো। তুমি আর ক'টা দিন সবুর কর।

কোনকিছুতেই সবুর এখন আর সয় না জামী। অসুখের পর থেকে শরীরটা কেমন যেনো হয়ে গেছে। মনে হয় ভেতরে ভেতরে ভীষণ একটা রদবদল চলছে।

যতসব বাজে ভাবনা।

বাজে নয় জামী। এ এমন একটা ব্যাপার যে, আমি কাউকে বোঝাতে পারবো না।

ঠিক আছে, তোমার সব ব্যাপার তো আমারও। আমরা দুজনেই বুঝবো।

আমি ওকে উৎফুল্ল করার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। মিতুলের ক্লান্ত মুখটা আমার কাছ থেকে অনেকদূরে সরে গেলো। একবার ইচ্ছে করলো মা-সম্পর্কিত ধারণায় মিতুলের ভুলটা ভেঙে দেই। কিন্তু ওকে আঘাত দিতে সাহস হলো না। মিতুল আমার কাছ থেকে উঠে চলে গেলো। হাত দিয়ে এলো খোঁপা বাঁধলো।

তোমার ঘরে আমি একটা ছবি ছিঁড়েছিলাম, সেটা দাও জামী?

বের করে দিলাম।

জানো, বাবা একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি তাঁর পুরোন ডায়রীটা ধরেছি কিনা? আমি সোজা বলে দিয়েছি, না।

তারপর?

বাবা আর কিছু বলেননি।

ঐ টুকরোগুলো কি করবে?

যেখান থেকে পেয়েছি সেখানে রেখে দেবো।

মিতুল খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো।

মাঝে মাঝে বড্ড জানতে ইচ্ছে করে যে, মা সম্পর্কে বাবা কি ভাবে? বাবা বোধহয় মাকে ভীষণ ঘৃণা করে।

মিতুল আরো জোরে হাসলো।

আমি বললাম, কিছু কিছু ঘৃণা থাকে, যেটা ভালবাসার মতো।

সত্যি?

মিতুল চোখ বড় করলো।

তাহলে তুমি আমাকে তেমন ঘৃণায় ভরিয়ে দাও জামী।

ও এসে আমার পাশে বসলো। কাঁধে মুখ ঘষলো। আমার তখন সাইকির কথা মনে হচ্ছিলো। মনে হচ্ছিলো, সাইকি আমার পাশে বসে আছে। আমার শরীর সাইকিতে আচ্ছন্ন হচ্ছে।

কথা বলছ না কেন জামী?

আঃ মিতুল, তুমি কি এসব ভাবনা ছাড়বে?

আমি ওকে জোর করে চুমু খেলাম। মিতুল এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেলো। এখন মিতুলের এলো খোঁপা খুলে গেছে। একরাশ চুল বিষণ্ন দোয়েলের মতো পিঠের ওপর নিথর।

টানটান হয়ে শুয়ে পড়লাম। উপন্যাসটা মাথার মধ্যে ধোঁয়ার মতো

নীলাভ হয়ে উঠছে। ইউরেকা! পেয়ে গেছি। নাম রাখবো 'মগ্ন চৈতন্যে শিস'। নাম নিয়ে ভীষণ ঝামেলায় পড়তে হয় আমাকে। কিছুতেই মনমতো নাম ঠিক করতে পারি না। আশি পৃষ্ঠার মতো লেখা হয়েছে। মগজ যেমন জলপিঁপিঁর ডাক ছাড়ছে, তাতে এখুনি বসলে কয়েক পৃষ্ঠা একটানা লেখা যাবে। উঠবো উঠবো করছি, শরাফী এলো। দরজা খোলাই ছিলো।

যেভাবে শুয়ে শুয়ে পা নাচিয়ে চিন্তা করছিস, মনে হলো ডিস্টার্ব করলাম?

একটুও না। চিন্তাটা একবার মনের মধ্যে ঢুকে গেলেই হলো। তারপর যতো গণ্ডগোলই হোক না কেন, যে-কোন মুহূর্তে আমি আবার এই মাথার কাছে ফিরে যেতে পারি। তারপর, তোর খবর কি বল শরাফী?

খবর আবার কি! তোর খোঁজ নিতে এলাম। দিন-দিন যে একদম ঘরকুণো হয়ে যাচ্ছিস?

যাবার জায়গা কোথায় বল? কোথাও গিয়ে তো খাপ খাওয়াতে পারি না। তারচেয়ে এই জগৎটা অনেক ভাল শরাফী। নিজের মনে কাজ করে যাওয়া কেবল।

হুঁ, বুঝেছি, জমতে-জমতে মুক্তোই হয়ে উঠবি তুই। ঠিক আছে, সেই ঝিনুকের প্রত্যাশাতেই থাকবো আমরা।

ওর কথায় হো হো করে হাসলাম। শরাফী মাঝে মাঝে এমনি দু-একটা কথা ছাড়ে।

তুই আজ অফিসে যাসনি শরাফী?

না।

কেন? শরীর খারাপ?

আরে না। সকালে বাথরুমে বসে একটা গল্পের প্লট মনে এলো। বারোটা পর্যন্ত একটানা লিখে শেষ করেছি। তারপর খেয়ে-দেয়ে ঘুম। ঘুম থেকে উঠে তোর এখানে এলাম।

বেশ করেছিস। বোস, চা বানাই।

শরাফী আমার 'সরোবরে ঘোলা জল' বইটা টেবিল থেকে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, কিরে এতক্ষণ যে চেপে ছিলি খবরটা?

চাপিনি দোস্ত, মনে ছিলো না। কালকেই দিয়ে গেছে।

হুঁ, তোর অভ্যেসই এই। মুখ খুলতে চাস না।

সবার কাছে মুখ খুলি না ঠিক। তাই বলে তোকে বলবো না, এটা হয় নাকি? তুই বল শরাফী, লেখার মধ্যে যদি জিনিস থাকে, লোকে খুঁজে নিয়ে পড়বে, আমি কেন জনে-জনে বলতে যাবো?

হয়েছে, আর সাফাই গাইতে হবে না।

তুই রাগ করিস না দোস্ত। তোকে কি আমি কোন কথা না বলে থাকি? একটু আগে মিতুল এসেছিলো, এ জন্যে বইয়ের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছি।

শরাফী হো হো করে হেসে উঠলো। এতক্ষণে ওর মনের গুমোট ভাবটা কাটলো। আসলে প্রচণ্ড অভিমানী ও। আমি ওকে এক কপি বই দিলাম। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে হঠাৎ ও প্রশ্ন করলো, আচ্ছা জামেরী, তুই যখন লিখিস, তখন মিতুল তোর মাথা আচ্ছন্ন করে রাখে না?

হ্যাঁ, কখনো কখনো রাখে। তখন লেখা বন্ধ করে রাখি। তারপর মিতুল বিদায় নিলে আবার শুরু করি।

কতক্ষণে বিদায় নেয়?

তার কি ঠিক আছে? কখনো চট্ করে। কখনো অনেক পরে। কখনো হয়তো নেয়ই না।

বেশ আছিস।

শরাফী শব্দ করে চায়ে চুমুক দিলো।

তোর বইয়ের একটা রিভিয়্যু লিখবো।

সে তোর ইচ্ছে।

আমি সিগারেট জ্বালালাম। শরাফী এলে আমার গল্গল্ করে কথা বলতে ইচ্ছে করে। আমরা দু বন্ধু অনেক গল্প করতে পারি। ক্লান্তিহীন বিরতিহীন সে গল্প। আজো শরাফী সন্ধে পর্যন্ত আমার এখানে কাটালো। তারপর দুজন খানিকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় এলোমেলো ঘোরাঘুরি করে আমি অফিসে গেলাম। বেশ রাতে ফিরলাম। তখনো দেখি মিতুলের ঘরে আলো জ্বলছে। আমি জানালায় টোকা দিলাম। বিছানায় শোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম এলো। দরজার কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙলো। তাকিয়ে

দেখি, তখনো ঠিকমতো ভোর হয়নি। ফিকে আঁধার গুঁড়ো গুঁড়ো ঝরছে। বিরক্তি লাগলো। হঠাৎ শব্দে বুকটা ধ্বক্ ধ্বক্ করছে। আবার শব্দ। চোখ বুঁজলাম। এ সময় কে আসতে পারে? শব্দটা আজকে একদম অন্যরকম মনে হচ্ছে। মিতুল নয় তো? কিন্তু মিতুল তো কখনো এমন শব্দ করে না? আরো জোরে শব্দ। অসহিষ্ণু ডাক বোঝা যাচ্ছে। উঠে দরজা খুললাম। রায়হান দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলো।

শালা, দরজা খুলিস না কেন?

ও আমাকে জোর করে ঠেলে ঘরে ঢুকলো।

দরজা বন্ধ করবার সময় আমার হাত কাঁপলো। মনে হলো, কোথায় কি যেন একটা হয়েছে।

রায়হান টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রচণ্ড দম্ভে বললো, কাজটা সেরে এলাম।

কোন্ কাজ? আমার গলা শুকিয়ে কাঠ।

যে কাজটা সারার জন্যে আমার হাত নিস্‌পিস করছিলো।

রায়হান হো হো করে হাসতে আরম্ভ করলো। অনেকক্ষণ ধরে হাসলো। আমার বুকটা রাঢ়ের খরার মাটি। ফেটে চৌচির। একফোঁটা জলের জন্যে হামা দিয়ে ঘুরে মরছি। রায়হান চেয়ারে না বসে আমার লেখার টেবিলটার ওপর চেপে বসলো।

অনেক চেষ্টার পর সাতদিনের মাথায় সুযোগটা পাই। আমার আসুরিক শক্তিটা নিপুণ দৈত্যের মতো কাজ করে। মাত্র দুটো গুলীতে লোকটা রাস্তার ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। লোকজন জড়ো হওয়ার আগে আমি হাওয়া। আমি জানি, আমাকে ধরার সাধ্যি কারো নেই। কোন সূত্র রেখে কাজ করি না আমি। যাই একটু হাত-মুখে ঠাণ্ডা পানি দেই।

রায়হান বাথরুমে ঢুকলো। বেশ জোরে শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিলো। ওর সব কাজে আমি বিজয়ীর ঔদ্ধত্য দেখতে পাচ্ছিলাম। বুকটা কেমন ভার-ভার ঠেকছে। ঘরের মেঝেয় বারদুই পায়চারী করলাম। দরজা-জানালা টানটান করে খুলে দিলাম। খোলা বাতাস আসুক। এখন আমার বিশুদ্ধ বাতাস দরকার। বাথরুম থেকে বেরিয়ে চমকে উঠলো রায়হান।

কি ব্যাপার, দরজা-জানালা অমন খুলে রেখেছিস কেন ?

বাতাস আসুক।

কেউ তো আমাদের কথা শুনতে পারে ?

এখানে কেউ নেই।

আসতে কতোক্ষণ।

রায়হান নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিলো। তোয়ালে নিয়ে মুখ মুছতে শুরু করলো। আমার ভেতরে প্রচণ্ড রাগ ফুলে-ফেঁপে উঠছে।

চা খাওয়াবি নাকি জামেরী ?

না।

রায়হান থমকে আমার মুখের দিকে তাকালো।

তুই কি আমাকে সেদিনের মতো তাড়িয়ে দিবি ?

আমি কিছু না বলে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। যুতসই দুটো ঘুঁষি লাগানোর পর ও আমার হাতটা ধরে ফেললো।

ব্যথা পেলাম। টের পেলাম, কব্জিতে জোর অনেক। ও শান্ত গলায় বললো, মারামারি করলে তুই আমার সঙ্গে পারবি না জামেরী। আমার স্বাস্থ্য তোর চাইতে অনেক ভাল। মুখে বললেই পারতিস, আমি চলে যেতাম। অযথা শক্তি ক্ষয় করতে গেলি কেন ?

রায়হান দরজা খুলে বেরিয়ে গেলো। আমি দরজার মুখে দাঁড়িয়ে একটা খুনীর সিঁড়ি দিয়ে নামা দেখলাম। না, ওর পা টলছে না। স্বাভাবিকভাবেই নামছে। সমতলভূমিতে ওর হাঁটা দেখলাম। তাও ঠিক আছে। খুনী রায়হান আমার বন্ধু। আমি একজন খুনীর বন্ধু। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বাক্য দুটো মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করলাম। নিজের ওপর প্রচণ্ড আক্রোশ। চুল ধরে টানলাম। উঃ কেমন বিচ্ছিরি লাগছে। তীব্র বিবমিষা। আমি ছুটে বাথরুমে গেলাম। পানির মতো কিছু তেতো পদার্থ বেরিয়ে গেলো। ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে আমার মনে হলো আমি যেনো নিজেকে খুঁজে পাচ্ছি। জলের রেখা ধরে আমি নিজের ভেতরে প্রবেশ করছি। তখন আমার উপন্যাসের একটা নতুন অধ্যায়ের কথা মনে হলো।

সকালে মিতুল অফিসে যাওয়ার পথে আমার ঘরে এলো, ভোররাতে তোমার দরজায় কড়া নাড়ছিলো কে জামী ?

আমার এক বন্ধু।

উঃ, কেমন বন্ধু তোমার! গোটা বাড়ির সবার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে।

আমি হাসলাম। মিতুলকে বেশ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে। হালকা হলুদ শাড়ি। কাঁধে ঝোলানো লম্বা ব্যাগ। ওর গম্ভীর চোখে সকালের রোদ। মিতুলের শ্যামলা ছিপছিপে ফিগার আশ্চর্য ধারালো। আমি সব ভুলে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার বিবমিষা কেটে গেছে। ও এগিয়ে এলো।

কি দেখছো?

আমি উত্তর না দিয়ে তাকিয়ে রইলাম। মিতুলের চোখে শাসন।

কি হচ্ছে—অফিস যাব না?

না।

যাঃ, কি যে বলো? দেরী হয়ে যাচ্ছে।

না মিতুল, না। তুমি আজ অফিসে যাবে না। কাল একটা ছুটির দরখাস্ত দিয়ে দিও।

একটা জরুরী কাজ আছে।

সব চুলোয় যাক। আজ তুমি আর আমি সারাদিন এ ঘরে কাটাবো। প্ল্যান করবো।

কিসের প্ল্যান?

দিনক্ষণ ঠিক করার প্ল্যান। কিভাবে কি হবে সব ঠিক করবো। মিতুলের চোখে ঝিলিক। মুখে হাসি।

সত্যি জামী, আমার যেনো কি হয়েছে। এখন আমার কেবল তোমার কাছে থাকতে ইচ্ছে করে।

আমি হো হো করে হাসলাম। মিতুল অপ্রস্তুত হলো।

হাসছো কেন?

সব অসুখ এবার ঠিক হয়ে যাবে।

মিতুল তির্যক হেসে ব্যাগটা টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিলো। তারপর স্টোভ জ্বালিয়ে চা বসালো।

দিন-দিন তুমি একটা ফাজিল হোচ্ছ। লোকে জানে, তুমি ভীষণ গম্ভীর। কথা-টথা কম বলো। আমি তো জানি, তুমি কি?

সবার সঙ্গে নিজেকে মিলিও না মিতুল। তুমি কাছে থাকলে আমার প্রাণের উৎস খুলে যায়।

থাক, আর বাড়িয়ে বলতে হবে না। তুমি যে কথা বানাতে জানো, তা আমি জানি। আমার কাছে ঐ গুণ জাহির না করলেও চলবে।

দেখো, ইনসাল্ট কোর না।

আমি কপট রাগ দেখাই। মিতুল খিলখিলিয়ে হাসে। হাসিতে তরঙ্গ ওঠে। আমি খাটের ওপর চিৎপাত হই। ও চা বানিয়ে নিয়ে এলো। কৌটা খুলে বিস্কিট বের করলো। খাটের ওপর আমার পাশে হাঁটুতে মুখ রেখে বসলো।

এখন নিজেকে বেশ পাকাপাকি সংসারী মনে হচ্ছে মিতুল। জানো সংসারের নামে ভীষণ ভয় পেতাম। মনে হতো বাজে একটা ঝামেলা। কেবল তেল-নুনের হিসেব। ঐ বস্তু ঘাড়ে একবার চাপালে আর নামাতে পারবো না। এখন এই যে তুমি ঘুরে ঘুরে কাজ করছো আমার সমস্ত অন্তর তাতে ভরে যাচ্ছে। আফসোস হচ্ছে। এতোদিন অযথা সময় নষ্ট করেছি।

তুমি কি কাব্য করার জন্যে আমার অফিস বন্ধ করলে?

সত্যি, আজ আমার কি যেনো হয়েছে মিতুল। সকাল থেকে মনে হচ্ছিলো আমি কুয়াশায়পড়া দিকভ্রষ্ট বিরাটাকায় জাহাজ। তুমি যখন এলে, আমি আশ্রয় পেলাম। তুমি আমার ঈপ্সিত বন্দর।

বাস, এবার থামো। চা-টা শেষ করো। কেবল কথা।

মিতুল আমার মুখে হাত চাপা দিলো। ইউক্যালিপটাসের ডালে দোয়েলটা কিচ্ কিচ্ করে উঠলো। মিতুল চমকে ফিরে তাকালো। আমি অবাক হলাম।

কি হলো মিতুল?

কিসের শব্দ?

পাগল। ঐ দেখ দোয়েল।

আমার মনে হলো কে যেন ডাকছে।

তোমার হয়েছে কি বলো তো?

আমার ভেতরে একটা রদবদল হচ্ছে। আমি অনবরত সেটা টের পাই জামী। তুমি তো আমার কথা মোটেই বিশ্বেস করো না। ভাবো আমি প্রলাপ বকছি। জানো, কখনো কখনো ঘুমের মধ্যে আমার সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি বয়ে যায়। থরথরিয়ে কেঁপে উঠি।

মিতুল কেমন অস্বাভাবিক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালো। আমার বুকটা কেঁপে গেলো। এ দৃষ্টি আমি আগে কখনো দেখিনি। হঠাৎ মনে হলো, আজ সকাল থেকে সাইকির কথা আমি একবারও ভাবিনি। সাইকিকে আমি বেমালুম ভুলে গেছি। অথচ রায়হানের কাছ থেকে খবরটা পাওয়ার পর সাইকির কথা আমার সবচেয়ে বেশি মনে পড়া উচিত ছিলো। আসলে তা নয়। মিতুল সামনে এলে আমি আর সবকিছু বেমালুম ভুলে যাই।

বিয়ের আগে আমার একটা শর্ত আছে জামী।

কি?

আমার মাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

ঠিক আছে। সে হবে।

খুব সহজে যে বললে? কেমন করে হবে?

সে আমার দায়িত্ব। তোমার ভাবতে হবে না।

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে বাবাকে জিজ্ঞেস করি। কিন্তু পরে আর ভাল লাগে না। মানুষের জীবনটা কেমন, না জামী? চলতে চলতে হস্‌পস্‌ হয়ে যায়।

মিতুলের দৃষ্টি উদাস হয়ে যায়। ও কিছু একটা ভাবছে। ঘরের ভেতরে ভ্যাপসা গরম। বৃষ্টি হতে পারে। আমরা দুজনে কেউ চা খাইনি। চা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা। প্রায়ই আমাদের এমন হয়। চা বানিয়ে শেষ পর্যন্ত আর আমাদের খাওয়া হয় না। বাইরে রোদের তেজ কম। টুকরো মেঘের আড়ালে সূর্য চাপা পড়েছে। আমার মনটা বিষণ্ন হয়ে গেলো। সে বিষণ্নতা মিতুল না সাইকির জন্যে, তা বুঝতে পারছি না। হঠাৎ মিতুল আমার পাশে শুয়ে পড়লো।

আমার মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে জামী।

ওর মুখটা শাদা হলো। দৃষ্টি ঘোলাটে।

আমার হাত-পা বুঝি ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

আমি ভীষণ ভয় পেলাম। এ ধরনের ঘটনার জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাড়াতাড়ি চোখ মুখে পানি দিলাম। মাথায় বাতাস দিলাম। ও কেমন অবসন্নের মতো শুয়ে আছে। আমার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার

চোখ জলে ভরে ওঠে। আমার সব আবেগ মিতুলকে কেন্দ্র করে। আমি জানি না কেন ও এমন করে আমাকে টানে। মনে হয় যুগ যুগ ধরে মিতুলের মমী নিয়ে আমি বসে আছি। মিতুল আর কোনদিন নড়বে না, চড়বে না, কথা বলবে না। বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো। নিজের ওপর রাগ হলো। ইচ্ছে করলেই আরো আগে মিতুলকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পারতাম। নিজের খামখেয়ালির জন্যে সেটা হয়নি। আমার কাছে থাকলে ও এতোটা মনোবিকলনের শিকার হতো না। যে পরিবেশে ও থাকে, তার সঙ্গে ওর হাজার দ্বন্দ্ব। বাবার ভালবাসা আনন্দের বদলে ওকে কষ্ট দেয়। এসব কিছু আরো আগে আমার বোঝা উচিত ছিলো। আমি নিজের দায়িত্ব যথাযথ পালন করিনি। অথচ মিতুলও এমন মেয়ে যে, কোনদিন নিজের থেকে বিয়ের কথা বলেনি। ও বললে হয়তো আমি আরো আগে বিয়ের ব্যাপারটা ভাবতাম। নিজের চুল টেনে ধরলাম। প্রতি মুহূর্তে মিতুলকে আমি অসুস্থ করে তুলেছি। রায়হানের চাইতে আমি কম খুনী নই।

অনেকক্ষণ পর মিতুল চোখ খুললো, জামী, আমার ঘুম পাচ্ছে।

ঘুমোও।

জামী, তোমার কি খুব খারাপ লাগছে?

তুমি ঘুমোও মিতুল।

তুমি কোথাও যাবে না তো?

না। আমি তোমার পাশেই আছি।

তুমি গেলে আমার ভয় করবে।

আমি কোথাও যাবো না।

মিতুল আমার বাম হাতটা নিজের মুঠিতে নিয়ে চোখ বুঁজলো। ও যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলো, আমি খাট থেকে নেমে লেখার টেবিলের সামনে এসে বসলাম। ভেবেছিলাম, আমি আর মিতুল আজ সারাদিন চমৎকার একটা সংসার-সংসার খেলা খেলবো। দেখবো কেমন লাগে। তার আগে মিতুল ঘুমিয়ে গেলো। মিতুল যেনো পাঁচ বছরের মেয়ের মতো ধুলোবালির রান্নাবাড়ি খেলতে-খেলতে মাটিতে ঘুমিয়ে গেছে। জেগে উঠে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবে। কিন্তু আসলে মিতুল ছেলেমানুষ নয়। বোঝে অনেক। কিন্তু সে বোঝাকে ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে না। ঠিক এমনি

একটি মেয়ে চরিত্রই আমার উপন্যাসের নায়িকা। আসলে মিতুলকে আমি ভেঙে টুকরো করে বিভিন্নভাবে দেখবার চেষ্টা করছি। যতো দেখি, দেখা আর ফুরোয় না। প্রতিবারই নতুন বোধ জন্ম নেয়। মাঝে মাঝে সেই স্বপ্নের কথা মনে হয়। সেটা যেনো এক আদিম যুগের ঘটনা। তারও অনেক আগে থেকে আমি মিতুলকে দেখছি। কোনদিন ওকে আমার খারাপ লাগেনি। আমার চোখে বুড়ো হয়নি। পুরোন হয়নি। মিতুল প্রকৃতির মতো খোলস বদলিয়ে নতুন হয়ে ওঠে। আর তাতেই আমার আনন্দ, আমার বিশ্বাস, আমার বেঁচে থাকা। আসলে মিতুল সেই আরিআদনি—আমার প্রজ্ঞা এবং বিবেক হয়ে অনির্বাণ জ্বলে।

সংসার-সংসার খেলা জমেনি বলে আমার খারাপ লাগছে না। হাঁড়িকুড়ির মধ্যে মিতুল কেবল আমার রাঙা বৌ নয়। তা আমি হতেও দেবো না। মিতুলের সেই দৌড়ে-পালানো আবেগটা আমার চাই। তার সঙ্গেই আমার কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলা। মিতুল নিজেও জানে না ওর ভেতরের বাইরের শরীর থেকে আমি কেমন ননী চুরি করি। ঘুমের ঘোরে ও যেনো কি বললো। তারপর পাশ ফিরলো। আমি এখন ওর পিঠ দেখতে পাচ্ছি। চুল দেখছি। ওর ব্লাউজের একটা হুক খোলা। আঁচলটা ঘাড়ের কাছে জড়ো হয়ে আছে। দেখতে দেখতে আমার সময় কেটে যায়। টেবিল থেকে একটা বই টেনে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করি। পারি না। মিতুলের পিঠে দৃষ্টি আটকে যায়। বাইরে মেঘ। গুমোট ভাব কেটে গিয়েছে। হঠাৎ করে ঘনকালো মেঘ করেছে। ঝলক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসের লুটোপুটি। জানালার সামনে এসে দাঁড়াই। রাস্তায় ব্যস্ততা। বাতাসে ধুলো, ছেঁড়া-কাগজ উড়ছে। জোর বাতাস শুরু হয়েছে। এখুনি হয়তো বৃষ্টি নামবে। মন্দ হয় না। বৃষ্টি নামলেই এখন আমি সবচেয়ে খুশী হই। চারদিক অন্ধকার করে ঝমঝম বৃষ্টি পড়ুক। এলোও তাই। আমাকে খুশী করার জন্যেই আকাশের সব আয়োজন। বড় বড় ফোঁটার পর মুষলধারে বৃষ্টি এলো। আমি জানালা বন্ধ করে কাচের ওপর মুখ রেখে বৃষ্টি দেখি। ছিটকিনির ওপর একফোঁটা জল টলটল করছে। বাতাসের ধাক্কায় পড়ে যায়। আবার একফোঁটা জমে। আমি অনেকক্ষণ সেই খেলাটা দেখি। কতোক্ষণ কেটে যায় টের পাই না।

মিতুল আমার পিঠের ওপর হাত রাখে।

উঠেছো কেন?

এখন বেশ লাগছে।

কোন অসুবিধে নেই তো?

না। মাথাটা ঝরঝরে মনে হচ্ছে। কিন্তু জানো জামী, মাথাটা মাঝে মাঝে হঠাৎ কেমন যেন হয়ে যায়।

মিতুল আমার বুকের কাছাকাছি দাঁড়ালো। জানালায় মুখ রাখলো। বৃষ্টির তোড়ে সব কেমন ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে। ভিজে ভিজে গাড়ি চলে যাচ্ছে সাঁই করে। মানুষ নেই। দোকান বন্ধ। মিতুলের চুল থেকে চমৎকার গন্ধ আসছে। ওর মাথাটা আমার নাকের কাছে। সেই সুগন্ধী থেকে আমার কাফ্‌কার কথা মনে হলো। জানি না কেন। কাফ্‌কা মরণোত্তর খ্যাতি পেয়েছিলেন।

আমি তা চাই না। মৃত্যুর পর যে খ্যাতি তাতে আমার সুখ কোথায়? যে খ্যাতি আমার আনন্দ, তা আমার কাম্য। কাফ্‌কা প্রেমের যন্ত্রণায় অবিবাহিত ছিলেন। আমি তা চাই না। না, আমার মিতুল আছে। তখুনি আমি ওকে হাত ধরে টেনে বিছানায় নিয়ে এলাম। ও অবাক হলো।

কি ব্যাপার?

বোস। প্ল্যানটা কোরে ফেলি।

আচ্ছা লোক তুমি। যেমন হাতকড়া দিয়ে টেনে নিয়ে এলে। ভাবলাম অপরাধ করেছি বুঝি?

অপরাধ তো করেছো বটেই।

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম।

কি অপরাধ?

এই যে আমাকে ভালবেসেছো।

যাঃ!

মিতুল খিলখিলিয়ে হাসলো।

আচ্ছা মিতুল, আগে দিনটা ঠিক করি?

দিন? একটা বিশেষ দিন? হ্যাঁ, ঠিক করো।

এটা অক্টোবর মাস। সামনের নভেম্বরের দশ তারিখ আমার জন্মদিন। সে দিনটি কেমন হয়?

মুরুব্বীরা বলে, জন্মমাসে বিয়ে হয় না।

তুমি দেখছি একটা কুসংস্কারের ডিপো। আমি ওসব মানি না। কথায় বলে না, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ। আমি ঐ তিনটে ব্যাপারকে একদিনে বাঁধতে চাই।

তিনটে কেমন করে বাঁধবে? মৃত্যুর কথা তো তুমি বলতে পারো না?

পারি। ঐ নভেম্বরের দশ তারিখেই আমার মৃত্যু হবে। ইচ্ছে থাকলে মানুষ সব পারে।

যতোসব আজগুবী।

কিছুই আজগুবী নয়। জানো, জাপানী ঔপন্যাসিক এবং ছোট গল্পকার ওসামু দাজাই-র আত্মহত্যা ভীষণ প্রিয় ছিলো। তিনি তিন-তিনবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চতুর্থবার সফল হয়েছিলেন। তিনি শিল্পের বস্তু হবার জন্যে নিজেকে ধ্বংস করেছিলেন।

তুমি কি সে রকম করবে নাকি?

মিতুল চোখ বিস্ফারিত করলো।

পাগল। আত্মহত্যায় আমার ভীষণ ঘৃণা।

লেখকদের আমার ভয় করে জানো। লেখকরা নাকি অন্যরকম হয়। সবাই তাই বলে।

মিতুলের ভীতুকণ্ঠে আমার হাসি পেলো। হাসতে হাসতে আমি বিষম খেলাম। ও রেগে গেলো।

তোমার ঐ ধরনের হাসির কোন অর্থ বুঝি না আমি। ওসামু দাজাই-র কথা বলে তুমি কিসের ইঙ্গিত করলে, সে আমি কি করে বুঝবো?

মিতুলের গলা ধরে এলো। হয়তো এখুনি কাঁদবে।

আমি ওকে কাছে টানলাম।

নিজেকে ধ্বংস করে আমি শিল্পের বস্তু হবো না মিতুল। আমি শিল্পকে ভালবাসি।

তোমরা লেখকরা শিল্পের জন্যে অনেককিছু করতে পারো। তখন তোমাদের প্রিয়জনের কথা মনে থাকে না।

গলগলে ধোঁয়ার মতো কথাগুলো মিতুলের মুখ থেকে বেরিয়ে এলো। আমি নিজের ভেতর হোঁচট খেলাম। কথাটা কি মিতুল ভুল বলেছে?

ও মুখটা নীচু করে দাঁতে নখ কাটছে। ও এখন ভীষণ সিরিয়াস। ব্যাপারটা এতো সিরিয়াস হয়ে যাবে আমি নিজেও ভাবিনি।

কি, চুপ করে আছ যে? কথাটা বুকে লেগেছে না?

মিতুল বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকালো। আমি হাসলাম।

তুমি যা বলো তাই আমার বুকে লাগে মিতুল। সেটা কি আমি পায়ে লাগাতে পারি?

ইস! আমার ঠাকুর।

দেখো আমরা কিন্তু আসল কথা থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি। তারিখটায় তুমি রাজী আছ তো?

হুঁ।

আচ্ছা মিতুল তোমার জন্যে আমার কি কি কিনতে হবে?

আমি জানি না।

বলো না?

একশিশি আলতা, রেশমী চুড়ি, মেঘডুম্বুর শাড়ি—

ফাজলামী হচ্ছে?

আমি ওর বেণী ধরে টান দিলাম। মিতুল হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়লো।

দেখো জামী, জিনিসের প্রয়োজন তাদের হয়, যারা সাজানো-গোছানো বিয়ে করে। আমাদের কি তেমন কিছুর দরকার আছে?

আমার আছে। একদিনের জন্যেই আমি তোমাকে অন্যরকম দেখতে চাই। লাল বেনারসী, জড়োয়া গয়না, চন্দনের ফোঁটা সারা মুখে—তুমি চোখ বুঁজে আছ—আঃ ভাবতেই আমি উত্তেজিত হচ্ছি।

এখন একটু থামবে? নইলে আমার কিন্তু মাথা ধরবে।

আমি উঠে জানালার ধারে গেলাম। বাইরে বৃষ্টি ধরে এসেছে। এখন টিপটিপিয়ে পড়ছে। মিতুল হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। মাঝে মাঝে বাতাসের ঝাপটায় বৃষ্টির ছাঁট আসছে। তবু জানালাটা আমি খুলেই রাখলাম। ভালই লাগছে। বাইরের সবকিছু এখন আমার ভাল লাগার মধ্যে। আজকালের মধ্যেই কথাটা মিতুলের বাবার কাছে বলতে হবে। আগে মিন্টুকে বলবো। ওরাও জানে আমার কেউ গার্জিয়ান নেই। কাজেই নিজে নিজেই সব করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললে সেটা কার্যকরী করার জন্যে আমি ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তখন আর দেরী সয় না। মনটা

আবার একটু খারাপ হলো। তার আগে আমাকে একবার তাঁতখান লেনে যেতে হবে। মিতুল তো জানে না তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর খোঁজ আমি পেয়েছি। কিন্তু প্রাচীর ডিঙিয়ে তার কাছে পৌঁছতে পারিনি। মিতুল তেমনি মুখ বুঁজে বসে আছে। আমি গিয়ে ওর মুখটা নিজের দিকে ঘোরাতেই দেখলাম চোখে জল।

কি হয়েছে মিতুল?

ও কথা বললো না। তেমনি শক্ত হয়ে বসে রইলো।

মিতুল, লক্ষ্মীটি কি, হয়েছে?

ও কিছু না বলে খাট থেকে নামলো। আঁচলে চোখ মুছলো। তারপর দরজা খুলে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে গেলো। আমি ডাকলাম না। জানি লাভ নেই। মিতুল এখন আমার আশ্রয়ে আর নেই। জানি না বিয়ের কথায় ওর হয়তো অনেক ঘটনা মনে পড়ছে। ওর শৈশব, কৈশোর ওকে বড় কষ্ট দেয়। হঠাৎ মনে হলো কষ্ট পেতে পেতে মিতুল হয়তো একদিন টুপ করে মরে যাবে। কেউ জানবে না ওর কি হয়েছে। শুধু আমি বুঝবো কেন মরলো মিতুল।

পরেরদিন মিন্টুকে ডেকে সব কথা বললাম। ও খুশীতে লাফিয়ে উঠলো।

আমরা তো আপনার এই একটি কথার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম জামেরী ভাই। কংগ্রাচুলেশন।

তারিখটাও জানিয়ে দিলাম ওকে। সেই তারিখ অনুযায়ী এখনো একমাস চারদিন বাকি। মিন্টু চলে যাবার পর নিজেকে খুব হাল্কা লাগলো। দোয়েলটার মতো আমি এখন ইউক্যালিপটাসের উঁচু ডালে গিয়ে বসতে পারি। অনায়াসে আকাশ ছুঁতে পারি। মেঘ হতে পারি। তক্ষুনি লাফাতে লাফাতে ঝর্ণা এলো।

জামেরী ভাইয়া মিষ্টি চাই।

কেন, কিসের মিষ্টি?

বাঃ কিছুই যেন জানেন না?

অতো সহজে মিষ্টি নেই ঝর্ণামণি। আগে আপুকে এই হাতের মুঠিতে দাও, তারপরে মিষ্টি।

বাব্বা আপনি কি সাংঘাতিক লোক!

মোটেই না। তোমার ক'হাঁড়ি মিষ্টি চাই বলো? তবু সাংঘাতিক হ'তে রাজী নই।

ঠিক আছে মিষ্টি আমার চাই না। বিয়ের দিন শোধ তুলবো। তখন মজাটা টের পাবেন। নাকের জল, চোখের জল এক হবে।

শোন, শোন ঝর্ণা—

আগে দুলাভাই হয়ে নিন তারপর শুনবো।

ও যেই ভঙ্গিতে এসেছিল ঠিক সেই ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে চলে গেলো।

আমি ঘর বন্ধ করে বেরুলাম। আকাশ ফাঁকা। বৃষ্টি নেই। মেঘ নেই। ঝকঝকে তাতল রোদ। লাফাতে লাফাতে এসে গায়ে সুড়সুড়ি দেয়। রাস্তায় বেরিয়ে আমার সাইকির কথা মনে পড়লো। আঃ সাইকি, তুমি এখন শোকার্ত এ্যাণ্ড্রোম্যাকী। তোমার স্বামী হেক্টরের মতো বীরের মৃত্যু বরণ করেনি। কিন্তু—। তখুনি তীব্র বিবমিষায় আমার মাথাটা কেমন পাক দিয়ে উঠলো। মনে হচ্ছে যতো রিকশা আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে, সব রিকশায় সাইকি বসে আছে। পেছনের পর্দা তুলে আমাকে দেখছে। চোখে সেই অবিশ্বাসী ঘৃণা। আমার বুকে লু হাওয়া। আমি ফুটপাথের কৃষ্ণচুড়ো গাছের নীচে দাঁড়ালাম। মগজে একটা শিরশিরে বোধের বিস্তার হচ্ছে। বাড়ছে। ক্রমাগত বাড়ছে। কি যে হলো আমার। এখন আমি প্রাণপণে মিতুলকে ভাবলাম। চকচকে ডানা দোয়েলটাকে ভাবলাম। ভাবতে-ভাবতে আমার প্রেয়সী আকাশটা বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলাম। আমার নিজস্ব চেতনার ভুবন। তখুনি রিকশা নিয়ে অফিসে এলাম। দু গ্লাস পানি খাবার পর মনে হোল, আঃ শান্তি! ডেস্কে অনেক কাজ ছিলো। সেগুলো সারতে সারতে অনেক রাত হয়ে গেলো। প্রায় তিনটে। তাছাড়া বাড়ি ফেরার কোন তাগিদ আমি অনুভব করছিলাম না। তাই অতো রাতে ঘরে না ফিরে টেবিলের ওপর শুয়ে কাটালাম। সারারাত মশার দল আমাকে গান শুনিয়ে আরব সাগরের তীরে নিয়ে গেছে। যেতে না চাইলেও জোর করেছে। একটুও ঘুমুতে দেয়নি। সকালে টের পেলাম মাথা ধরেছে। চোখ জ্বালা করছে। জিহবা তেতো বিস্বাদে ভরা। নিশ্চয় লিভার ফাংশন খারাপ যাচ্ছে। ঘরে ফিরে গোসল সেরে একটা কড়া ঘুম দিতে হবে। এই চিন্তা করতে করতে যখন রিকশা থেকে নামলাম দেখলাম সিঁড়ির মুখে রায়হান বসে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে আছে।

নোংরা এলোমেলো কাপড়-চোপড়। দুতিন সিঁড়ি নীচে স্যাণ্ডেল পড়ে আছে। কোনদিকে খেয়াল নেই। সিঁড়িতে আমার পায়ের শব্দ শুনে মাথা তুললো। একটু চমকে উঠে তড়বড়িয়ে বললো, আজ কিন্তু তাড়িয়ে দিলেও যাবো না।

আমি কথা না বলে তালা খুললাম।

কথা না বললেও যাবো না। কিছুতেই যাবো না।

বুঝলাম টেনে এসেছে। আমি ঘরে ঢুকলে আমার পিছু পিছু ঢুকলো। আমি ওকে কিছু বলতে পারছি না। ও স্বাভাবিক নয়। ও চেয়ার টেনে বসলো। আমার দিকে চেয়ে রইলো। আমি ওকে পুরো উপেক্ষা করে লুঙ্গি তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকলাম। আমি ঠাণ্ডা পানিতে পা ছেড়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কোনকিছুই ভাবতে ভাল লাগছে না। এখন গোসলটাই আমার আনন্দ। আমি গান গাইতে গাইতে গোসল সারলাম। অনেকক্ষণ পর বেরিয়ে দেখলাম রায়হান টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। আমি ওকে না ডেকে ওর মুখটা দেখলাম। এমন একদৃষ্টে আমি কখনো ঘুমন্ত মানুষের মুখ দেখিনি। মাথার মধ্যে চড়চড়িয়ে উঠলো সেই বোধটা, রায়হান খুনী। কিন্তু খুনীর মুখটা তেমন ভয়ংকর নয়। ওর মুখের প্রতিটি শিরায় অপরাধবোধের একটা চিকন সুতো টাঙানো আছে। পরক্ষণে সেটা উড়িয়ে দিলাম। অপরাধবোধে আক্রান্ত হওয়ার মতো দুর্বল স্নায়ু ওর নয়। কিন্তু আমার দৃষ্টি তো ভুল হতে পারে না। আমি ভুল দেখছি না। মনটা খচ্ খচ্ করছে। রায়হান কি তবে শুভবুদ্ধির কাছে নতজান্ হয়েছে? ওর মুখটা সেই কথা বলছে। কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। আমি জানিনা। কখনো খুনীর ঘুমন্ত মুখ দেখিনি। হয়তো এটা ওর মুখোশ হতে পারে। কিন্তু না, ঘুমের সঙ্গে ছলনা কি সম্ভব? ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ কিছুতেই প্রতারক হতে পারে না। ভাবতে ভাবতে চা বানালাম। ওকে ডাকলাম। ও চমকে ধড়মড়িয়ে উঠলো—এ্যাঁ, কি হয়েছে? কি?

চা খাবি না?

চা?

ও ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো।

যা বাথরুম থেকে মুখটা ধুয়ে আয়।

তুই আমাকে চা খেতে বলছিস?

হ্যাঁ, বলছি। যা মুখ ধুয়ে আয়।

রায়হান শিথিল পায়ে বাথরুমে গেলো। জামার বোতাম অর্ধেক খোলা। বুকটা উদোম। গেঞ্জী পরেনি। চুলে বোধ হয় চিরুনি পড়েনি অনেক দিন। মনে হলো রায়হান নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। অথচ বিজয়ের কোন নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই। রায়হানের জন্যে আমার ভয় হলো। মায়া হলো। মৃত্যুর নিশ্চিত সংবাদ বুকে নিয়ে ও একিলিসের মতো যুদ্ধ করছে। উঃ রায়হান, তুই কার জন্যে কেঁদে মরছিস? সে তোর নাগালের অনেক বাইরে। রায়হান তুই মরবি। বিজয়ের ফল ভোগ করতে হবে না। তুই মরবি। ট্রোজানদের মতো তুইও বুঝতে পারছিস না যে, কাঠের ঘোড়া নয়—ভীষণ একটা মৃত্যুর ছায়া তুই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিস।

মুখ ধুয়ে, চুল আঁচড়ে, শার্টের বোতাম লাগিয়ে মোটামুটি ভদ্র হয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলো রায়হান। আমার একটাকিছু বলা দরকার অথচ ওর সঙ্গে আমি কি কথা বলবো বুঝতে পারছিলাম না। ও চায়ে চুমুক দিলো। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। একসময় আমার চোখে চোখ পড়তে জিজ্ঞেস করলাম, এ ক'দিন কোথায় ছিলি?

যশোর গিয়েছিলাম।

কবে এসেছিস?

কালরাতে।

বাসায় যাসনি?

এতো কথা জিজ্ঞেস করছিস কেন?

রায়হান দৃষ্টিটা সূচালো করে আমার দিকে তাকালো। দৃষ্টিতে সন্দেহ। মনে মনে হাসলাম। ভুলেই গিয়েছিলাম যে ও খুনী। ও এখন মেপে মেপে কথা বলবে। আমাকেও ওর ভয়। কিন্তু রায়হান তো এমন ছিলো না। ওর সেই দম্ভ কোথায় গেলো?

নে বিস্কিট খা।

ও কিছু বললো না। আস্তে আস্তে চা-টা শেষ করলো। সিগারেট জ্বালালো। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে অনেকটা স্বগতের মতো বললো, তিনদিন পর আমি ছন্দাদের বাসায় গিয়েছিলাম জামেরী।

বলিস কি? তোর এতো সাহস?

ওরা তো আমাকে তেমন কেউ চেনে না। তাছাড়া আমার ভেতরটা কেমন ওলোট-পালোট হয়ে গেলো। মনে হতো ছন্দাকে না দেখতে পেলে আমি মরে যাবো। কিন্তু ওখানে গিয়ে আমার সব এলোমেলো হয়ে যায় জামেরী। মনের মধ্যে যেন প্রচণ্ড বোমা ফাটে। সেই বিধ্বস্ত পরিবেশে আমি কিছু খুঁজে পাই না। মনের সুস্থ অবস্থা তো নয়ই। কোন ভালবাসাও যেনো আর নেই।

রায়হান থামলো। আমার প্রশ্নের উত্তর মিলেছে। রায়হানের ঘুমন্ত মুখে আমি এই কথাগুলোই পড়েছিলাম। কিন্তু কেমন করে এটা হলো? যে দৃঢ়তা নিয়ে ও এগিয়েছিলো, সেখানে ও টিকতে পারলো না কেন? সব মানুষই কি একবারের জন্যে হলেও বিবেকের কাছে ফিরে আসে?

ছন্দার বাবা আমাকে বসতে দিয়েছিলো জামেরী। আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করেছিলো। আমি খুব সোজাভাবে কোন উত্তর দেইনি। আমতা-আমতা করে ওদের বন্ধু বলে কাটিয়ে দিয়েছিলাম। আমরা কেউ কোন কথা বলছিলাম না। সমস্ত বাড়িটা চুপচাপ। আমি খুব সজাগ হয়ে কান খাড়া করে রেখেছিলাম কিছু-একটা শুনবো বলে। কোথাও কোন শব্দ নেই কেন? এ কেমন মৃতপুরী? কেউ কি কিছু করতে পারছে না! কেউ যদি কিছু করতে না পারে তাহলে চিৎকার করে কাঁদছে না কেন? আসলে আমি শব্দ চাই। কোলাহল চাই। এমন নিঃশব্দ সমাহিতভাব আমার অসহ্য।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে এলো। প্রথমে আস্তে। তারপর জোরে। আরো জোরে। ছন্দার বাবা মুখটা ঘুরিয়ে চোখ মুছলেন। আমার মনে হয়েছিলো ছন্দার ঐ কণ্ঠস্বর আমি চিনি না। কোনদিন কখনো ছন্দা আমার সামনে কাঁদেনি। ফোঁপানির শব্দ চুপে চুপে আমার মগজে ঢুকছিলো। আমি পাগলের মতো আমার সব অনুভূতি বধির করে দিতে চাইলাম। পারছিলাম না। ক্ষিপ্ত সাঁওতাল ছেলেটার একগুঁয়ে তীরের মতো কান্নার ধ্বনি আমার মগজে বিঁধছিলো। অনবরত বিঁধছিলো। আমার চেতনার তলদেশে একটা হিম ঠাণ্ডা স্রোত।

আমি উপলব্ধি করছিলাম ছন্দার বাবা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। সেই স্নেহপ্রবণ বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মুখটা আস্তে আস্তে ছোট হতে হতে হঠাৎ বিরাট জন্তুর মতো হয়ে যাচ্ছে। আমি অস্ফুট আর্তনাদ করি।

কি হলো আপনার? খুব খারাপ লাগছে বুঝি? মেয়েটার কেন এমন হলো বলুন তো?

বৃদ্ধ উঠে আমার কাছাকাছি বসলেন। তাঁর মুখে উত্তরের প্রত্যাশা। বৃদ্ধ আমাকে আপন করতে চাইছেন। আমার মধ্যে আশ্রয় খুঁজছেন। কিন্তু আমি তাঁর দিকে তাকাতে পারছি না। ভয় হচ্ছে। বৃদ্ধ যেনো ঈশ্বর হয়ে আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাইছেন। আজ আমার শেষ বিচারের দিন। বৃদ্ধ আবার একই কথা আওড়ালেন। স্বগতের মতো।

মেয়েটার কেন এমন হলো বলুন তো? কপাল কি এতোই খারাপ ওর?

আমি জানি না। আমি জানি না।

আমি বিড়বিড় করি। এ সমস্ত কথায় আমার উৎফুল্ল হওয়া উচিত ছিলো জামেরী। কিন্তু আমি কিছুতেই জোর করেও খুশী হতেও পারছিলাম না। মনের সব বাঁধ যেনো ভেঙে গেছে। বৃদ্ধ উদাস হয়ে বলেন, জানেন, ওর জন্মের পর আমার ব্যবসায় খুব উন্নতি হয়েছিলো। একজন ওর জন্মক্ষণ আর রাশি গুণে বলেছিলো, ও নাকি যার ঘরে যাবে তার ঘর উজ্জ্বল করবে। লক্ষ্মী—ভাগ্যবতী মেয়ে আমার ছন্দা।

আমার ভীষণ বলতে ইচ্ছে করছিলো যে, ছন্দা যে ঘর উজ্জ্বল করবে তা আমিই তৈরি করে রেখেছি। ভুল জায়গায় পড়লে সে ঘর উজ্জ্বল করা যায় না। কিন্তু আমি বলতে পারিনি জামেরী।

বৃদ্ধ উঠে পাশের ঘরে চলে যান। ছন্দার কান্না থেমে গেছে। আবার সব চুপচাপ। ছোট্ট নির্জন ঘরটা বিরাট জনপদের মতো খাঁ খাঁ করছে। অনুভব করি আমার বুকটা কেমন শক্ত হয়ে গেছে জামেরী।

আমি পাগলের মতো আমার ভালবাসা হাতড়ে বেড়াই। কোথাও কিছু নেই। সব ফাঁকা। কামালপুরের বাংকারে বসে সমগ্র দেশটাকে যেমন বুকের মধ্যে পুরে রাখতাম, তেমন করে আর কিছুই পারছি না। এতক্ষণে নিজেকে একটা পুরোপুরি খুনী মনে হচ্ছে। শুধু ছন্দার নয়, এখন আমার বুকের বাংকারেও পড়ে আছে একটা লাশ। উঃ জামেরী, তোকে আমি বোঝাতে পারবো না এ যন্ত্রণার কথা।

রায়হান উঠে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আমি ওর শেষ কথায় চমকে উঠি। এসব কি বলছে ও? যে রায়হানকে এতোদিন ধরে আমি চিনতাম তার বিন্দুমাত্র রেশ ওর মধ্যে নেই। ঔপন্যাসিক আঁদ্রে জিদের

কথা আমার মনে পড়লো। তিনি কোন পরিবর্তনকে স্বীকার করতেন না, সবসময় বলতেন নতুন জন্ম। রায়হানের এ পরিবর্তনকে নতুন জন্ম ছাড়া আমি আর কিছুই ভাবতে পারলাম না। আসলে আনুষ্ঠানিক জন্মটা কোন ব্যাপারই নয়। প্রতিমুহূর্তে মানুষ আপন অন্তরের জঠরের অন্ধকারে কতো নাড়ি ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে। নাড়ি-ছেঁড়ার হিসেব আমরা পাই না বলে আনুষ্ঠানিক জন্মটা আমাদের কাছে প্রাধান্য পায়। সে জন্মের যন্ত্রণা মাতার। নিজস্ব নিয়মের খোলস ভাঙার বেদনা সে প্রাণকে স্ফুরিত করে না। তবুও সেটা আমাদের জন্যে আনন্দের বার্তা। কিন্তু অন্তরের একলা ঘরে বসে দাঁতে-কেটে নাড়ি-ছেঁড়া সে যে কি ভয়ানক। রায়হান আমাকে তেমন একটা বোধে ঠেলে দিয়েছে। আমি সে জন্মের রাশি রাশি বেদনার সাক্ষী। এ মুহূর্তে আমি ওর পেছনের অংশটা দেখতে পাচ্ছি। ও জানালার দিকে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে। ওর ভেতরটা কাঁপছে। অস্থিরতা ওর স্নায়ুতে। রায়হানের জন্যে আমার ভীষণ মমতা। দাঁড়ি-পাল্লায় সাইকির দিকটা অনেক কমে এলো।

দশ বছরের রক্তাক্ত যুদ্ধের পর হেলেন ম্যানিলাসের কাছে ফিরে গিয়েছিলো সাইকি। তারা সুখে সংসার করেছিলো। দশ বছরের রক্তাক্ত যুদ্ধের ক্ষত, মৃত্যু, ধ্বংস হেলেন বুকে চেপে রেখেছিলো। তুমি কি তেমন একজন হেলেন হতে পারলে না? জীবনের সবক্ষেত্রে অনেক ফাঁকি থাকে সাইকি। কখনো কখনো সেগুলোর সঙ্গে আপোষ করতে হয়। নইলে বেঁচে থাকা কঠিন। তোমার নিজস্ব নিয়মকে আমি ভুল বুঝিনি সাইকি। তোমার কথাও আমি অনেক ভেবেছি। ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারিনি। এখন মনে হয় যদি তুমি হেলেন হতে অন্তত তোমরা তিনজন মানুষ মরতে না। এখন সবাই মিলে মারা যাচ্ছ। যে রায়হান আমার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে সে আর কেউ নয়—আর্টেমিসের উদ্দেশ্যে বলিরত ইফেজিনিয়া। ওর বিবেক ওর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে। ছল করে ভুলিয়ে এনে ওর গলায় ছুরি দিয়েছে। আমি যেনো ওর কণ্ঠে এখন একটাই চিৎকার শুনতে পাচ্ছি, বা—বা—বা—বা। বাবা—বাবা।

আমার চিন্তা ধপ্ করে মাটিতে পড়ে গেলো। আগামেমনন নামক প্রবঞ্চক বিবেক এখন আর ওর চিৎকারে কিছু ফিরে তাকায় না। ওর শাস্তি অনিবার্য। আমার মাথাটা কেমন যেনো করছে। নড়ে উঠতে

চেয়ারে ক্যাচ করে শব্দ হলো। সে শব্দে চমকে মুখ ফেরালো রায়হান।

দরজার কড়া নাড়ে কে জামেরী?

দরজা নয় চেয়ারে শব্দ হয়েছে।

আমি শুনলাম দরজার শব্দ। তুই দরজা খুলিস না জামেরী। ওরা বোধ হয় আমাকে ধরতে এসেছে।

কারা?

ঐ যে, যারা সারাক্ষণ আমার পিছু পিছু ফেরে। ওদের তুই বলিস জামেরী আমি আর কোনদিনও খুন করবো না। কোনদিনও না।

রায়হান মাটিতে বসে আমার হাঁটু চেপে ধরে। কোলের ওপর মুখ রাখে। আমার অন্তরটা শূন্য হয়ে যায়। বুঝলাম নিজের বিচার ও নিজেই করেছে। শাস্তিও দিচ্ছে নিজেকে।

আচ্ছা জামেরী তুই কি এখনো আমাকে ঘৃণা করছিস?

একটুও না।

না জামেরী তা হবে না। তুই আমাকে ঘৃণা কর। ভীষণ ঘৃণা। আমি আর ভালবাসা চাই না। আমি এখন ভালবাসা ছাড়া বাঁচতে চাই। তুইতো জানিস না ছন্দা এখন আমার বুকে লাশ হয়ে শুয়ে আছে।

কাল সারারাত তোর ঘুম হয়নি রায়হান। তুই এখন একটু ঘুমিয়ে নে।

ঠিক বলেছিস। এজন্যে তো তুই আমার প্রাণের বন্ধু।

রায়হান বিছানায় শুয়ে চোখ বুঁজলো। মুহূর্তে ও আবার ধড়মড় করে উঠে বসলো।

জামেরী তুই কি করে জানলি যে, কাল সারারাত আমি ঘুমোইনি।

তোর চেহারা দেখে মনে হয়েছে।

চেহারা দেখে কি সবকিছু বোঝা যায়?

দেখবার মতো দৃষ্টি থাকলে যায় বৈকি।

আমি যে খুনী, তা কি ওরা আমার চেহারা দেখে বুঝতে পারবে?

আমি চুপ করে থাকি। রায়হান উত্তেজিত হয়ে ওঠে। খাট থেকে নেমে আমার চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়ায়। কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দেয়।

কথা বলছিস না কেন জামেরী?

তোর ভয় নেই রায়হান। চেহারা দেখে কোনকিছু বুঝে নেবার মতো দৃষ্টি ওদের নেই।

বাঁচালি। জানিস জামেরী, আমার যেনো কি হয়েছে। সারাক্ষণ মনে হয় কেউ বুঝি আমার পিছু পিছু হাঁটছে।

সব তোর মনের ভুল। তুই যা, একটু বিশ্রাম নে।

রায়হান আর কোন কথা না বলে সোজা বিছানায় চলে গেলো। ও আমার দিকে পিঠ রেখে শুয়ে পড়লো। ওর চওড়া পিঠটা দেখতে বেশ ভাল লাগছে। একদিন মিতুলও আমার দিকে এমন পিঠ দিয়ে ঘুমিয়েছিলো। আঃ ক'দিন পর মিতুলের পিঠ, বুক, চোখ, নাক, চুল সব আমার দখলে আসবে। আমি যে-কোন সময় মিতুলের যে-কোন জায়গা ছুঁতে পারবো। কতোদিন গেছে মিতুলকে ছুঁয়ে দেখবার প্রবল ইচ্ছে জেগেছিলো। কিন্তু মিতুল নেই বলে পারতাম না। তখন অকারণে নিজের হাত কামড়াতাম। মিতুলের শরীরটা ঝর্ণার মতো। যেনো চমৎকার শীতল জলে নেয়ে ওঠা যায়। মিতুলের বুকে কবুতরের শরীরের উষ্ণতা। অনন্তকাল মুখ রেখে শুয়ে থাকা যায়। একটুও বরফ জমার ভয় নেই। মাঝে মাঝে মনে হয় মিতুল শুধু আমার ভালবাসা নয়। আমার লেখালেখির রেশমী সুতো। গোলকধাঁধায় নামিয়ে দিয়ে আবার টেনে ওঠায়। পথ ভুলতে দেয় না। তখন মগজে জলপিঁপিঁর ডাক শুনলাম। কাগজ টেনে বসলাম। উপন্যাসটা অর্ধেকের বেশি শেষ করে ফেলেছি। প্রকাশকও ঠিক আছে। লেখা হয়ে গেলেই ছাপতে পারবো। কয়েক পৃষ্ঠা লেখার পর রায়হান উঠে এলো আমার কাছে।

কাল সারারাত ঘুমোইনি অথচ আমার একটুও ঘুম আসছে না জামেরী।

রায়হানের কণ্ঠে ভিখেরির দীনতা। সে কণ্ঠ আমার অন্তর ছুঁয়ে গেলো। এখন ওর জন্যে আমার একরাশ মমতা।

তুই বোধ হয় ভীষণ চিন্তা করছিস, এ জন্যে ঘুম আসছে না।

আচ্ছা জামেরী, ছন্দা বোধ হয় পুলিশের কাছে আমার নাম বলে দিয়েছে, না?

তখুনি আমি আমার মানসপটে ছন্দার অবিশ্বাসী ঘৃণার দৃষ্টি দেখতে পেলাম। উত্তর দিতে পারলাম না। ইউক্যালিপটাসের ডালে মেয়েরজটা

ক্রিচ্ ক্রিচ্ করে উঠলো। ডানা ঝাপ্টালো। সেই শব্দে চমকে উঠলো রায়হান।

ঐ বুঝি দরজায় কে কড়া নাড়ছে? আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবি আমি নেই।

এই বলে ও দৌড়ে বাথরুমে চলে গেলো। ওর চেহারায় ভয়, সন্ত্রাস। আমি চেয়ারের ওপর হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসলাম। একি হলো রায়হানের? ও তো এমন দুর্বল স্নায়ুর লোক ছিলো না। ছন্দার কান্নায় ও কি নিজেকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়েছে? এ অবস্থা বেশিদিন চললে ও পুরোপুরি পাগল হয়ে যাবে। অথচ এটা হতে দেয়া উচিত নয়। তার আগে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমি রায়হানকে ডাকতেও পারলাম না। ওর বিশ্বাস এখন মাটির নীচের শিকড়। শক্ত করে আঁকড়ে আছে। উপড়ে ফেলা কঠিন। আমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। কিছুক্ষণ পর ও নিজেই দরজা একটু ফাঁক করে ফিসফিসয়ে আমাকে ডাকলো।

হেই জামেরী—চলে গেছে ওরা?

হ্যাঁ।

ও বেরিয়ে এলো। চোখে-মুখে স্বস্তির ভাব।

কে এসেছিলো?

কেউ না।

তার মানে তুই আমাকে বলবি না?

রায়হানের কণ্ঠে ক্ষোভ।

আমার এক বন্ধু। তুই তাকে চিনবি না রায়হান।

বুঝেছি তোর এখানে থাকা নিরাপদ নয়। অনবরত লোকজন কেবল দরজায় কড়া নাড়ে। আমি চললাম।

কোথায় যাবি?

খবরদার জিজ্ঞেস করবি না। আমি কোথায় যাই না যাই তোর কি রে শালা?

রায়হান রাগে গজগজ্ করতে করতে বেরিয়ে গেলো। ইচ্ছে করে দুপ্ দুপ্ শব্দে সিঁড়ি দিয়ে নামলো। আমি একটুক্ষণ শুনলাম। তারপর আমার লেখার জগতে ফিরে এলাম। একটানা কয়েক পৃষ্ঠা লিখে ফেললাম। লিখে বেশ খুশী লাগলো। অনেকক্ষণ গলা ছেড়ে গান গাইলাম।

সেদিন বিকেলে অকারণে ন্যুমার্কেটে ঘুরলাম। মিতুলের জন্যে চমৎকার একটা নীল বেনারসী কিনলাম। যা দেখি তাই আমার কিনতে ইচ্ছে করে। কিন্তু টাকার অভাবে বেশিদূর এগোতে পারলাম না। এ দোকান ও দোকান ঘুরতে আমার একটুও ক্লান্তি নেই। আমি কেবলই জিনিস পছন্দ করলাম। আর মনে মনে মিতুলকে সাজালাম। বইয়ের দোকানের সামনে শরাফীর সঙ্গে দেখা। ও আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠলো।

এ্যাই জামেরী? কি রে কি খবর?

এই এমনি ঘুরছি।

ঘুরছিস ভাল কথা। কিন্তু হাতে শাড়ির প্যাকেট কেন রে?

বিয়েটা এবার—।

ও বুঝেছি। কংগ্রাচুলেশন। সাহস যে করতে পেরেছিস এ জন্যে তোকে ধন্যবাদ।

আমি হাসলাম।

দেখি কেমন শাড়ি কিনেছিস?

শরাফী আমার হাত থেকে প্যাকেটটা টেনে নিয়ে খুললো।

নীল কেন রে? বিয়েতে সবাই লাল কেনে।

আমার মনে হয়, নীল শাড়িতে মিতুলকে বেশি মানাবে।

যাকগে। সেটা তোর ব্যাপার। চল লিবার্টিতে বসি। আজ আমি তোকে মিষ্টিমুখ করাবো। গার্জিয়ান তো নেই যে এ সময় আদর করে খাওয়াবে।

শরাফী আমাকে টানতে টানতে রেস্তোরাঁয় নিয়ে এলো।

কি খাবি বল?

তোর যা ইচ্ছে।

এ সময়টায় ভীষণ টেনশন থাকে জামেরী। খাওয়া-দাওয়া মুখে রুচতেই চায় না।

নিজের অভিজ্ঞতা অন্যের ওপর ফলাচ্ছিস। মনে হচ্ছে আমার বিয়ের খবরে তুই নিজেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিস?

অনেকটা তাই রে। জানিস বিয়ে বাড়িতে গেলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় দিনটা যদি আমার হতো। শরাফী হো হো করে

হাসতে আরম্ভ করে। আমিও হাসতে হাসতে বললাম, একবার বিয়ে করে শখ মেটেনি?

তা মিটেছে দোস্ত। তবু ঐ নতুন বরের জায়গায় নিজেকে ভাবতে বেশ লাগে।

বেয়ারা মিষ্টি নিয়ে এলো। শরাফী গলগল্ করে কথা বলে যাচ্ছে। আমার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। শুনতেও না। এজন্যে লোকে বলে অহংকারী। আসলে আমার চরিত্রের ধাতই এই। চুপ করে থাকাটা স্বভাবের সবচেয়ে প্রিয় অংশ। সবসময় মাথার মধ্যে কোন না কোন চিন্তা ঘুরপাক খায়। বেশি কথা বললে চিন্তার সঙ্গতি নষ্ট হয়। এটা আমার বিশ্বাস। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটুকু কথা না বললেই নয়, সেটা আমি বলি। তবে শুনতে পারি। মন-মেজাজ খারাপ না থাকলে যে কারো কথা আমি নিবিষ্টমনে শুনি।

কিরে, কি ভাবছিস? তোর 'সরোবরে ঘোলা জল' বইটা তো ভাল প্রশংসা পাচ্ছে। বিভিন্ন কাগজে তিন-চারটে সমালোচনা বেরিয়েছে। দেখেছিস?

হ্যাঁ।

ভাল লিখেছে। তবে উত্তরণের সমালোচনা আমার বেশি ভাল লাগেনি। মুস্তফা জামিল আরো একটু বেশি লিখতে পারতো। অহেতুক কৃপণতা করে তো লাভ নেই। যোগ্যবস্তুর যোগ্যমূল্য দিতে হবে।

আমি হাসলাম। শরাফী এখন রগরগে আবেগের কড়াইয়ে ফুটছে। ওকে থামায় কার সাধ্যি।

তুই কিছু বলছিস না যে জামেরী?

বলার কি আছে? যার যতোটুকু ভাল লেগেছে, সে ততোটুকু লিখেছে। সাহিত্য এমন একটা ব্যাপার যে, জোর করে ভাল লাগানো যায় না। সেটা ব্যক্তিগত রুচির ওপর নির্ভর করে।

না জামেরী তবুও সাধারণ ভাল লাগার একটা মাপকাঠি আছে। যেটা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আমার বিশ্বাস, তোর বইটা সাধারণের ভাল লাগার উর্ধ্বে উঠেছে। যে-কোন রুচির পরীক্ষায় ওটা টিকবে।

তুই বন্ধু বলে বেশি বলছিস।

কক্ষনো না। তুই আমার সাহিত্যের বোধকে অবিশ্বাস করছিস?

ছিঃ ছিঃ কি যে বলিস।

আসলে এটা এক ধরনের নোংরামি জামেরী। ইচ্ছাকৃত ব্যাপার। যার যতোটুকু প্রাপ্য ততোটুকু স্বীকার করতে আমাদের বুক ফেটে যায়। নিজের ওজন যাচাই করতে পারি না বলে অহেতুক কৃপণতা দেখাই।

তুই ক্ষেপেছিস শরাফী?

ক্ষ্যাপা-ক্ষেপির প্রশ্ন নয়। কেননা এটা কেবল তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়। এটা আমাদের সবার ক্ষেত্রেই হতে পারে। বল, পারে কিনা?

হ্যাঁ, তা পারে।

সেজন্যেই এসব জিনিস হতে দেয়া উচিত নয়। সমালোচনার সুস্থতা নষ্ট হয়। আমার আলোচনাটা লিখে শেষ করেছি। ওটা আগামী সপ্তাহে দৈনিক ছায়াপথে ছাপা হবে।

জানিস শরাফী, এক ধরনের লোক আছে যারা হৃদয়ের চোরাকুঠির দেয়াল ভাঙতে চায় না। পরিশেষে ঐ দেয়ালের চাপেই ওরা মরে। সেজন্যে ওদের বিরুদ্ধে লাফালাফি না করে নিজের কাজ করে যাওয়া ভাল। জানি তো ওরা ডোবার জন্যেই সাহিত্য করে।

তোর সঙ্গে আমি একমত নই। কাজের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা হৈ চৈ-এরও দরকার আছে। নইলে বড় একতরফাভাবে পথ ছেড়ে দেয়া হয়। ওরা পাঠককে বিভ্রান্ত করে।

পাঠক কোনদিন বিভ্রান্ত হয় না শরাফী।

বেয়ারা চা দিয়ে গেলো। শরাফী আর কোন কথা না বলে চায়ে চুমুক দিলো। আমিও। দুজনেই বড্ড সিরিয়াস হয়ে পড়েছি। আমি জানি পাঠকের ওপর আমার এতো আস্থা শরাফীর খুবএকটা ভাল লাগে না। এ নিয়ে ও আমার সঙ্গে অনেক তর্ক করেছে। আজ চুপ করে গেলো। জানে তর্ক বৃথা। আমার বিশ্বাস থেকে ও আমাকে টলাতে পারবে না। আমি পরিবেশ হালকা করার জন্যে বললাম, রামীন কেমন আছে রে?

আর বলিস না, তিনদিন ধরে মেয়েটার জ্বর। কখনো কমে, কখনো বাড়ে। একেবারে ছাড়ে না। আর মেয়েটাও হয়েছে তেমনি। এক-মুহূর্ত আমাকে ছাড়তে চায় না। গত দুদিন কোথাও বের হইনি। আজ কমলা কেনার নাম করে বেরিয়ে এসেছি। একটানা ঘরে বসে থাকা যায় নাকি? দম আটকে আসতে চায়।

শরাফী ঠোঁট ওল্টালো। অথচ আমি ঘরে থাকতে ভালবাসি। বেশি বেরুতে হলে আমার বিরক্তি ধরে। বললাম, চল আমার ঘরে যাই। ফুটপাথ থেকে কয়েকটা চমৎকার বই কিনেছি। দেখলে খুশী হয়ে যাবি।

কি বই ?

চল না। এখানে বললে তো আর যাবি না।

একটার নাম বল।

যে বইটা তুই অনেক খুঁজেছিস সেটা পেয়েছি। শুনলে নির্ঘাৎ লাফিয়ে উঠবি। হেনরী মিলারের—

ট্রপিক অব ক্যানসার ?

শরাফী চেঁচিয়ে উঠলো।

হ্যাঁ। তবে আমি এখনো পড়িনি।

তোর পড়তে সময় লাগবে। আমাকে দে আমি আগে পড়ে নেই। তারপর তুই পড়বি। চল এখুনি যাই। ক'দিন ধরে মেয়ের মাথার কাছে বসে রাত কাটাই। আজ অন্তত হেনরী মিলারকে সঙ্গে করে রাতটা পাড়ি দেয়া যাবে।

ওর জ্বর কি বেশি ?

এ ক'দিন বেশি ছিল। আজ একটু কম। জানিস জামেরী, ওর ঐ রোগাক্রান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুতেই আমার ঘুম আসতে চায় না।

বাবা হওয়া এমনি মজার।

আমরা দুজনেই হাসলাম। নিজের অজান্তে মিতুলের নীল শাড়িটা বুকে লেপে ধরলাম। মনে হচ্ছে বুকের লোমে ভীষণ ছোট্ট একটা হাত আমার কাতুকুতু দিচ্ছে। আমার ঐরকম একটা মেয়ে থাকলে কি যে ভাল লাগতো। গ্রীন মার্কেটের ফলের দোকানে দাঁড়িয়ে আমি শরাফীর মেয়ের জন্যে অনেক কমলা কিনে ফেললাম। জানি না কেন।

আমার বিয়ের এখনো দিনবিশেক বাকি। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সাঁকো পেরিয়ে মনটাকে বাগে আনলাম। ঠিক করলাম আজ তাঁতখান লেনে যাবো। এর মধ্যে মিতুল কম করেও চার-পাঁচদিন তাগাদা দিয়েছে। ভেবেছিলাম বিয়ের আনন্দে মিতুল ঐ দিকটা অন্তত ভুলে থাকবে। কিন্তু দেখলাম তার উল্টো। যতোই দিন যাচ্ছে ততোই ও অস্থির হয়ে উঠছে। যেনো এ ব্যাপারটা ওর জীবন-মরণ সমস্যা। আমার একটুও ভাল লাগে

না। এতো বাড়াবাড়ির খুবএকটা গভীর কারণ খুঁজে পাই না। তবুও আজ শুক্রবার দেখে মনটা স্থির করলাম। যা হয় যাবোই। মিতুলের মা আমাকে শুক্রবারে যেতে বলেছিলেন।

দুরু দুরু বুকে দরজার কড়া নাড়লাম। দরজা খুললো ছোকরা চাকর। আমাকে বসতে দিয়ে ও চলে গেলো। ঘরটা অবিকল তেমনি আছে। আগের দিন যেমন দেখেছিলাম। ঔষধের শিশি যেনো আরো কয়েকটা বেশি জমেছে। ক্যালেণ্ডারের পৃষ্ঠায় ধুলোর আস্তর। বসে বসে আকাশ-পাতাল ভাবছি। বেশ অনেকক্ষণ পর ভদ্রমহিলা এলেন। আমাকে দেখে গম্ভীর হতে গিয়েও হাসলেন। যেনো কষ্টের হাসি। হাসতে মন চায় না। অথচ না হাসলেই নয়। আমি সালাম দিলাম।

কেমন আছেন?

ভাল।

ভদ্রমহিলা আজ একটু আড়ষ্ট।

আমি আবার মিতুলের জন্যে এসেছি।

ওকে বুঝিয়ে বলেছেন আমার কথা?

না, এখনো বলিনি। ওকে দেবার মতো কোন খবর ছিল না বলেই বলিনি।

ভালই করেছেন। যে মাকে ওর একটুও মনে নেই, সে পরিচয়ের আড়ালেই থাক।

ভদ্রমহিলা হাসলেন। আমার গায়ে জ্বালা ধরে গেলো।

কিন্তু সে মাকেই ও পাগলের মতো খুঁজছে। দেখার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছে। আমার কণ্ঠে ঝাঁঝ। ভদ্রমহিলা মুখটা নীচু করলেন। আমি রাগতে গিয়েও পারলাম না। কার ওপর রাগ করবো? আর আমার রাগেরই বা কি দাম? তাই কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললাম, আগামী মাসের দশ তারিখে আমাদের বিয়ে ঠিক হয়েছে।

সত্যি? শুনে খুশী হলাম। খুব ভাল লাগছে।

বিয়ের আগে মিতুল আপনাকে একবার দেখতে চায়।

আমি দূর থেকে আশীর্বাদ করবো।

আপনার আশীর্বাদ মিতুলের জীবনে খুব একটা জরুরী কিছু নয়।

আমি রেগে গেলাম। নিজেকে আর সামলাতে পারলাম না।

ভদ্রমহিলার ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। মিতুলের জন্যে তার কি কোন ভালবাসা নেই? একনজর চোখে দেখারও আগ্রহ নেই? আমি উঠে দাঁড়ালাম। ভদ্রমহিলা মুখ নীচু করে তখনো চুপ।

মিতুলকে কি বলবো বলে দিন?

বলবেন, আমাকে কেন্দ্র করে ওর কল্পনা কল্পনাই থাক। বাস্তবে সে কল্পনা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। ও আঘাত পাবে।

এখনো কষ্ট পাচ্ছে।

উঃ, মিতুল কেন এমন হলো? ও কেন আমাকে ঘৃণা করতে শিখলো না?

দেখলাম, ভদ্রমহিলার চোখ চিক্‌চিক্ করছে।

যে সন্তানকে ত্যাগ করেছি, তার ওপর আমার কোন অধিকার নেই।

সে-সব প্রশ্নের দরকার নেই। মিতুল শুধু আপনাকে দেখতে চায়।

মিতুলকে বলবেন, ও যেন আমাকে ক্ষমা করে।

আমাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে ভদ্রমহিলা অন্য ঘরে চলে গেলেন। শূন্য ঘরে আমি কিছুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। ভেবেছিলাম, বিয়ের কথায় ভদ্রমহিলা অন্তত দেখা করতে রাজী হবেন। কিন্তু দেখলাম ইস্পাত নরম করা আমার সাধ্য নয়। মিতুলের ব্যাপারে তিনি শামুকের মতো গুটিয়ে যান। বড় নির্মম সে আবরণ। আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর কেউ যখন আর এদিকে এলো না তখন বেরিয়ে এলাম। মন-মেজাজ ভীষণ খাট্টা হয়ে গেলো। এখন এই মুহূর্তে আমার যেনো কিছু আর করার নেই। আমি পরাজিত সৈনিক। ভেবেছিলাম রায়হানের ব্যাপারে আলাপ করার জন্যে রেজার ওখানে যাবো, তাও ভাল লাগলো না। পেটের ভেতর থেকে ভীষণ একটা তেতো স্বাদ উঠে যেন জিহ্বায় আটকে আছে। রিকশা নিলাম বাসায় ফেরার জন্যে। মেডিকেলের সামনে মোহনবাঁশি বাজিয়ে এ্যাম্বুলেন্সটি চলে গেলো। মুকুটের মতো নীল বাতি মিতুলের নীল বেনারসী হয়ে আমার বুকে আটকে রইলো।

ঘরে ফিরে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে রইলাম। জুতো-জামা খোলারও ইচ্ছে হলো না। ঠিক করলাম সমস্ত ঘটনাটা মিতুলকে বলবো। অহেতুক কষ্ট পাওয়ার চাইতে ও জানুক। সবকিছু জেনে বুকটা হালকা করুক।

তাতে হয়তো ওর ভালই হবে। একটা দিক থেকে স্থির হয়ে যাবে। তখুনি দরজায় খুটখুট শব্দ। দরজা খুলতেই মিতুল হুড়মুড়িয়ে ঢুকলো।

তোমার কি হয়েছে জামী? জানলা দিয়ে দেখলাম তুমি সিঁড়ি দিয়ে উঠছো। চেহারা দেখে মনে হলো কিছু-একটা হয়েছে। কারো সঙ্গে গণ্ডগোল করোনি তো?

করেছি।

কার সঙ্গে?

তোমার মা-র সঙ্গে।

আমার মা?

মিতুল কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর আমার গলা জড়িয়ে ধরলো। চুমু খেলো। শার্টের বোতাম খুলে দিলো। জুতো খুলে দিলো। আমাকে খাটের ওপর বসিয়ে নিজে নীচে বসে কোলের ওপর মাথা রাখলো। সেই তেতো স্বাদটা তখন আমার পেটের ভেতর থেকে বাষ্পের মতো উড়ে উড়ে আসছে। আমার গলার স্বর রুদ্ধ করে দিতে চাইছে। আমি কি করে মিতুলকে বলবো? পরক্ষণে নিজেকে শক্ত করলাম। বলতেই হবে। এ খেলা আর ভাল লাগে না।

জামী আমার মা-র কথা বলো।

আমি ওকে হাত ধরে উঠিয়ে পাশে এনে বসালাম। মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম নিজের দিকে। মিতুলের দৃষ্টি একমুহূর্ত আমার চোখের ওপর থেকে সরতে দেব না। আস্তে আস্তে মিতুলকে সব কথা বললাম। একটু বেশি করে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বললাম। ও নড়লো না, চড়লো না, প্রশ্ন করলো না, কেবল একমনে শুনে গেলো। শেষ করার পর ভয় পেলাম। মিতুল যেনো কেমন করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ঐ চাউনি আমি চিনি না। হঠাৎ ও শব্দ করে হেসে উঠলো।

জানো জামী, বাবা না আজকাল আমাকে ভীষণ আদর করে। কেবল ঘুরে-ফিরে জিজ্ঞেস করে, এখানে বিয়ে হলে আমি সুখী হব কিনা। তুমি বলো জামী, এসব প্রশ্নের কি উত্তর হয়? তোমার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আগে সুখ কি জানতাম না। এখন জানি। জানি বলেই উত্তর দিতে পারি না। আসলে আমার মনে হয় কি জানো, বাবা আমাকে প্রশ্ন করার মধ্য দিয়ে নিজের অন্তরটা হাতড়ে দেখে। তা-ও বোধহয় নয়।

বাবা সবসময় আমাকে আগলে রাখতে চান। কষ্ট থেকে আগলে রাখা আর কি। বুঝতে দিতে চান না কিছুই। আসলে সেটাই বাবার ভুল। বাবার উচিত ছিলো আমার সঙ্গে খোলা-মেলা হওয়া। বর্তমান মা-ই আমার আপন মা এই পরিচয়ে বাবা আমাকে বড় করেছেন। কিন্তু তা-ও কি আমাকে আড়াল করে রাখতে পেরেছেন? সে আগুন বাবার অজান্তে আমাকে স্পর্শ করেছে। এখন পুড়িয়ে মারছে।

মিতুল দুবার ঘরে পায়চারী করলো। আমি জানালার বাইরে অনির্দিষ্ট শূন্যে তাকিয়ে রইলাম। আমার প্রিয় আকাশ থেকে অনেকদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। অনেকদিন আমি আমার মতো করে দিনের এবং রাতের আকাশ দেখিনি। কেমন করে ভুলে গেলাম? কেমন করে? মিতুল গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়ালো। ওকে আমি বুঝতে পারছি না। মা-কে নিয়ে ও এখনও একটি কথাও বলেনি। কেবল শুনেছে। তারপর বাবার কথা বলেছে। কেমন জানি ঘটলো ব্যাপারটা। মিতুলের শরীরটা কাঁপছে। ও শক্ত করে দুহাতে জানালার শিক ধরে আছে। মিতুল কি কাঁদছে? কাছে গিয়ে পিঠে হাত রাখতেই ফুঁপিয়ে উঠলো। অনেক পরে আস্তে আস্তে বললো, জামী তবু আমি একবার মা-র কাছে যাব। তুমি নিয়ে চলো।

যদি দেখা না করে?

ফিরে আসবো।

তবু যাবে?

হ্যাঁ যাব। বুকের জ্বালাটাকে চিরদিনের জন্যে শেষ করে দিতে চাই জামী। তারপর শুধু তুমি আর তুমি। আর কেউ থাকবে না আমার ভাবনায়। আমি ভীষণ ভাল মেয়ে হয়ে যাবো। এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।

বেশ চলো। সামনের শুক্রবার যাবো।

মিতুল আর কিছু না বলে বাথরুমে গেলো। ও এই মুহূর্তে একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেললো। রাখতে কি পারবে? ও রাখতে না পারলেও আমাকে চেষ্টা করতে হবে। নইলে ওকে হারাবো। একবার ভাবলাম, মিতুলকে শাড়িটা দেখাই। পরক্ষণে মনে হলো, না থাক। শাড়ি দেখে আর সব দুঃখ ভুলে যাবে তেমন মেয়ে মিতুল নয়।

ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে এসে মিতুল হাসলো।

মাঝে মাঝে তোমাকে খুব কষ্ট দেই, না জামী?

ওকে ভীষণ স্নিগ্ধ দেখাচ্ছে। চোখ জোড়া ফোলা-ফোলা। নাকের ডগা লাল। আমি ওর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে হাসলাম। ভাল লাগলো যে মিতুল এখন সম্পূর্ণ আমার আশ্রয়ে ফিরে এসেছে।

হাসছো কেন?

কষ্ট-টষ্ট সব ভুলে যেতে পারি একটা শর্তে।

কি?

কাছে এসো।

না। বলো।

কাছে না এলে বলবো না।

জানি কি বলবে।

মিতুল হাসতে হাসতে ভেঙে পড়লো। আমি ইউক্যালিপটাসের বিরাট ডাল হয়ে যাই। মিতুল আমার ডালে শ্যামল দোয়েল।

কয়েকদিন বায়তুল মোকাররম, ন্যুমার্কেট ঘুরে আমি মিতুলের জন্যে টুকিটাকি অনেককিছু কিনে ফেললাম। জানি, মিতুল দেখলেই রাগ করবে, এসবের কি দরকার ছিল জামী? তোমার ঐ দামী কসমেটিক্স কি আমি ব্যবহার করবো? আমি হাসলাম। আসলে মিতুল উপলক্ষ। কিনতে আমারই ভাল লাগছে। সংসার করতে গিয়ে আর কোনদিন হয়তো কেনা হবে না। কিন্তু এখন কেনা চাই। একটি দিনের জন্যে মিতুলকে আমি অপরিচিতের মতো পেতে চাই। মনে হবে চেনা-চেনা। তবু চিনতে পারবো না। না চেনার কষ্ট আমাকে ভীষণ আনন্দ দেবে। আর ঐ আনন্দের ঢেউয়ে ভাসতে ভাসতে মিতুল এসে আমার গলা জড়াবে। জামী, যার জন্যে তোমার ভাবনা, এই আমি সেই। এতক্ষণ পালিয়েছিলাম। দেখলাম খুঁজে পাও কিনা। গুনগুনিয়ে গান গাইতে গাইতে জিনিসগুলো আমি সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে দিলাম। তখন ঝর্ণা এলো।

কি করছেন জামেরী ভাইয়া?

তুমি বলো দেখি, কি করছি? বুঝবো কেমন গণতে শিখেছ?

ঝর্ণা গালে হাত দিয়ে ভাবলো। তারপর হাসলো।

সত্যি কথা বলবো?

হুঁ।

আপনি এখন ভাবছেন—

কি ভাবছি?

কি আবার, বিয়ের কথা।

ঠিক।

আমরা দুজনে হাসলাম।

আমি বলে দিলাম, তুমি ঠিক গণকঠাকুর হবে।

ইস্, ঐসব কাজ করতে আমার বয়ে গেছে।

ঠিক আছে, করতে হবে না। এখন বলো দেখি, তোমার আপু অফিস গেছে কিনা?

না, আজকে যায়নি।

কেন?

তা তো জানি না। সকালে মা-কে বলছিল, শরীরটা খারাপ লাগছে। অফিস যাবে না।

তাই নাকি?

মিতুলের শরীর খারাপ? কি আবার হলো? আমাকে কোন খবর দেয়নি। অবশ্য শরীর খারাপের কথা আমাকে বলতে চায় না। জানে, আমি অহেতুক ভাবনা করবো।

আচ্ছা আমেরী ভাইয়া, বিয়ের কথা শুনলে সবাই খুশী হয় না?

হ্যাঁ, হয় তো।

ঝর্ণার প্রশ্নে আমি অবাক হলাম।

আপু না, কেমন হয়ে গেছে। মুখে একটুও হাসি নেই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। জানেন, রাতে শুয়ে-শুয়ে কাঁদে। আমি কাউকে বলি না। আমাকে বলতে বারণ করেছে।

কেন কাঁদে?

তা তো জানি না। সে-সব কিছু আমাকে বলে না।

মুহূর্তে মনটা খারাপ হয়ে গেলো। মিতুলের কষ্ট আমি কিছুতেই ফেরাতে পারছি না।

আপুর কান্নার কথা আপনি আবার কাউকে বলে দেবেন না যেনো জামেরী ভাইয়া।

কেন ?

আপু বলেছে, একথা কাউকে না বললে আমাকে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ কিনে দেবে।

ঠিক আছে, কাউকে বলবো না।

আমি যাই।

ঝর্ণা চলে গেলো। মিতুলের কান্নার কথা ও আর কাউকে বলেনি। বাবাকে না, মাকেও না। আমাকে বললো। ও বুঝেছে, আমি এখন মিতুলের সবচেয়ে কাছের লোক। কিন্তু আসলে আমরা কেউই মিতুলের কাছের নই। ও অনেক দূরের। অনেকদূর। একটা সিগারেট জ্বালিয়ে চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে টানতে লাগলাম। ভোঁ ভোঁ শব্দে গাড়িগুলো চলে যাচ্ছে। সে শব্দে আমার মগজ টুকরো টুকরো হচ্ছে। একসময় সব গাড়িগুলো এ্যাম্বুলেন্স হয়ে যায়। চমৎকার নীল বাতির মুকুট ওদের মাথায়। ওরা নীল সংবাদ বুকে নিয়ে ছুটছে। আমি ওদের ধরতে পারছি না। কেবল পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকাই আমার কাজ।

চুপিচুপি দরজা ঠেলে রায়হান ঢুকলো। দৌড়ে বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে আমাকে ডাকলো।

এ্যাই জামেরী দেখতো সিঁড়িতে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা ?

কে ?

ঐ যে আমার পিছু পিছু এলো।

আমি সিঁড়িতে মুখ বাড়িয়ে দেখে দরজা বন্ধ করলাম।

কেউ নেই।

যাক বাঁচা গেলো। জানিস যখন মনে হলো তোর এখানে আসবো তখনই কে যেনো আমার পিছু নিলো। কিছুতেই পিছু ছাড়ছিলো না। আমি কিছু বললাম না। আজকে ও বেশ ফিটফাট হয়ে এসেছে। চমৎকার দেখাচ্ছে। কিন্তু চেহারায় সেই দীপ্তি নেই। ওর আসল মুখটা কেউ চুরি করে নিয়ে ওখানে একটা মাটির মুখ বসিয়ে দিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে ঐ ভাবলেশহীন মুখ আমি চিনতে পারি না।

চা খাওয়া না জামেরী ?

বোস।

আমি স্টোভ জ্বালালাম। ও পায়ের ওপর পা তুলে দামী সিগারেট ধরালো। প্যাকেটটা আমার টেবিলে রাখলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে এ্যাসট্রে খুঁজলো, না পেয়ে জুতোর তলে দিয়াশলাইর কাঠিটা চালান করে দিলো।

জামেরী ছন্দা এখন আমার জন্যে তৈরি হচ্ছে, না?

হ্যাঁ।

আমার বিয়ের প্রস্তাবটা কিন্তু তোকেই নিয়ে যেতে হবে।

আচ্ছা যাবো।

তুই বেশ লক্ষ্মী ছেলে হয়েছিস। এমন বন্ধুই আমার ভাল লাগে। কিন্তু তুই যখন রাগ করিস মনে হয় মরে যাই।

আমি ওকে চা দিলাম। ও চায়ে চুমুক দিয়ে আর একটা সিগারেট জ্বালালো। প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলো।

নে খা।

ঐ সিগারেট আমি খাই না।

তবে কি খাস?

আমি নিজের প্যাকেট বের করলাম।

ফুঃ, ঐ সস্তা সিগারেট খেয়ে ফুসফুসটা ঝাঁঝরা করে ফেলবি নাকি?

আমি হাসলাম। ওর সঙ্গে এখন আর রাগ করা চলে না। যার সঙ্গে রাগ করা যেতো সে এখন আর নেই। খাটের নীচে ইঁদুরের চলাচলের শব্দে ও চমকে উঠলো।

কে দরজায় কড়া নাড়ে?

কেউ না। ইঁদুর।

ও একটুক্ষণ কান পেতে রইলো। আর কোন শব্দ নেই দেখে আশ্বস্ত হলো। চা ছলকে ওর দামী সার্টে পড়েছে। সেদিকে তাকিয়ে আমি বললাম, দিলিতো সার্টটা নষ্ট করে?

কি হবে? কাল থেকে এটা আর পরবো না। চল জামেরী তুই আর আমি মিলে একশোটা সার্ট বানাবো?

তাতে কি হবে?

রোজ এক একদিন এক একটা পরবো?

আমার অতো সার্ট ভাল লাগে না।

তাই নাকি? তাহলে থাক। তোর ভাল না লাগলে আর বানাবো না।

তাহলে চল জামেরী আমরা কতগুলো শাড়ি কিনি?

শাড়ি কেন?

বিয়ের সময় লাগবে না?

কথাটা পাকাপাকি হোক। তারিখ পড়ুক। তারপর কিনবো।

ঠিক বলেছিস। আগে কিনে লাভ কি?

রায়হান আধা-খাওয়া সিগারেট জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেললো। আমি শুধু ওকেই দেখছিলাম আর হিসেব মেলাচ্ছিলাম।

তোর উপন্যাসটা কতদূর লেখা হলো রে?

অর্ধেকের বেশি।

জানিস জামেরী, যশোরে একটা দোকানে দেখলাম তোর 'সরোবরে ঘোলা জল' বইটা দশ কপি রয়েছে। আমি সবগুলো কিনে ফেললাম।

অতো বই কি করলি?

বন্ধু-বান্ধবদের দিলাম পড়বার জন্যে। আর বললাম, এই বইয়ের লেখক আমার ভীষণ বন্ধু। হ্যাঁ, জামেরী তুই আমাকে তেমন বন্ধু মনে করিস তো?

করবো না কেন? তুই তো আমার একমাত্র বন্ধু।

সত্যি? তাহলে চল তোকে আজ চায়নীজ খাওয়াবো। কাপড় পরে নে। চল বেরিয়ে পড়ি।

এখনতো দুপুরের খাবার সময় হয়নি?

হয়নি মানে? বারোটা বাজে। যেতে যেতে হয়ে যাবে।

যাবো কি যাবো না দ্বিধায় পড়লাম। রায়হান এখন চমৎকার ভাল মানুষের মতো কথা বলছে। পরক্ষণে বিগড়ে যাবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার ভাবলাম দুপুরে রান্না করার ঝামেলার চাইতে ওর সঙ্গে যাওয়াই ভাল।

দেরী করছিস কেন জামেরী?

সময় হোক। আস্তে ধীরে যাই।

ঠিক তখুনি খাটের নীচে ইঁদুরটা কি ধরে যেনো নাড়া দিলো। রায়হান দৌড়ে বাথরুমের সামনে চলে গেলো।

কে এলো জামেরী ?

কেউ না ইঁদুর শব্দ করেছে।

ইঁদুর বুঝি অমন কড়া নাড়ার মতো শব্দ করতে পারে ? তোর এখানে আর এক মুহূর্ত থাকা যাবে না। কেউ না কেউ কেবল কড়া নাড়তে থাকে। চল যাই।

অগত্যা কাপড় পরে ওর সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। আমি হাঁটতে চাইলাম। ও রিকশার জন্যে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রইলো। হাঁটতে ওর ভাল লাগে না। হঠাৎ মনে হলো পাশ দিয়ে যে রিকশাটা গেলো ওটায় সাইকি বসে। আমি একটুও ভুল দেখিনি। মনটা খচ্ খচ্ করতে লাগলো। ওর সঙ্গে বুড়োমতো আর একজন মহিলা ছিল। সাইকি কি রায়হানকে দেখেনি ? নিশ্চয়ই দেখেছে। ও কি ভেবেছে কে জানে। চাইনীজ রেঁস্তোরার আধো অন্ধকারে বসে আমি ঘামতে লাগলাম। রায়হানের মুখের দিকেও তাকাতে পারছিলাম না।

তুই হঠাৎ অমন চুপ হয়ে গেলি কেন জামেরী ?

একটা কাজের কথা মনে হলো। এক জায়গায় যেতে হবে।

কখন ?

দু'টোর মধ্যে।

তাহলে তাড়াতাড়ি খেতে হয়।

রায়হান বেয়ারাকে তাড়াতাড়ি খাবার দিতে বললো। বেয়ারা কর্ণ সুপ দিয়ে গেলো। এই সুপটা আমার প্রিয়।

কিন্তু আজ আমি খেতে পারলাম না। কেমন তেতো লাগছে। আমার মনে হচ্ছে, বুকের কাছে সবকিছু আটকে যাচ্ছে।

তুই খাচ্ছিস না কেন জামেরী ?

খাচ্ছি তো।

ভাল লাগছে না খেতে। বোধ হয় বাসী সুপ দিয়েছে।

না না ঠিক আছে। আমি খাচ্ছি।

ও বেয়ারাকে ডাকতে যাচ্ছিলো। আমি থামিয়ে দিলাম। রেঁস্তোরায় বসে ও অযথা হৈ চৈ করুক এটা আমার কাম্য নয়। আমি এখান থেকে চলে যেতে পারলেই বাঁচি। সাইকির চোখে আমি চোখ ফেলতে পারিনি। পারলে সেই অবিশ্বাসী ঘৃণাই দেখতে পেতাম। ও নিশ্চয় আমাকে

খুনী ভাবলো।

ধুত শালা, তুই খাচ্ছিস না আর আমার খাওয়াটাও মাটি করলি। তুই খা না। জানিস তো আমি এমন অল্পই খাই।

রায়হান আমার ওপর বিরক্ত হলো। আমি তখনো সাইকির কথা ভাবছি। ভাগ্য ভাল যে রায়হান সাইকিকে দেখেনি। দেখলে একটা হুলস্থুল বাধতো। ওর মাথায় রক্ত উঠতো। এতক্ষণে মনে হলো রায়হান সঙ্গে ছিলো বলেই সাইকি পেছনের পর্দা তুলে আমার দিকে তাকায়নি। সেই ছুরির মতো ঠাণ্ডা দৃষ্টিটা যেনো আমার কলজেয় বিঁধে আছে।

আমার মতো রায়হানও অর্ধেক খেয়ে বেরিয়ে এলো। বেশির ভাগ খাবার পড়েই রইলো। আমার ওপর বিরক্ত থাকার দরুণই ও বেরিয়ে আমার সঙ্গে কোন কথা না বলে রিকশা নিয়ে চলে গেলো। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম যে কোথায় যাবো? রায়হানের কাছ থেকে ছাড়া পাওয়ার জন্যে মিথ্যে কথা বলেছি। মাথার ওপর গ্যালিলিও আকাশে শাণিত রোদ্দুর। প্রচণ্ড প্রতাপে দাপট দেখাচ্ছে। প্রজার ওপর অবিবেচক জমিদারের ক্রুর দৃষ্টি। রাস্তায় পীচ গলছে। ঘরে ফেরার ইচ্ছে নেই এখন। শরাফীর ওখানে যাবো বলে ঠিক করলাম। আবার মনে হলো রেজার ওখানে গেলে মন্দ হয়না। রায়হানের ব্যাপারটা আলাপ করা দরকার। ওর চিকিৎসা প্রয়োজন।

রেজা আমাকে দেখে ওর স্বভাব অনুযায়ী হৈ হৈ করে উঠলো। পচা একটা দুর্গন্ধ হালকাভাবে আসছে। সেই সঙ্গে ফিনাইলের তীব্র গন্ধ। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছে তবু ভ্যাপসা গরম। রুমাল বের করে মুখ মুছি।

তোর খবর কি জামেরী? অনেকদিন আসিসনি?

জানি তো দেখা হলেই এই একটা কথা তুই আগে বলবি।

অভিযোগটা আগে করে নেয়া ভাল। নইলে তুই আবার এক হাত নিবি।

নারে তোর ওপর সব দাবীদাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কোন অভিযোগ নেই।

ভাল হলো না জামেরী। একটু অভিমান রাখিস সেটা আমার ভাল লাগবে।

তোর কাজের ডিস্টার্ব করছিনা তো?

ভাল করে বোস। অতো ফর্মাল হতে হবেনা।

রেজা আমাকে সিগারেট দিলো।

জানিস আমার সেই প্যারানয়ার রুগী তোকে একদিন খুঁজেছিলো।

তাই নাকি? এখনো আছে?

না। অনেকদিন হলো চলে গেছে।

আমি তখন একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে আস্তে আস্তে রায়হানের সবকথা বললাম। রেজা কোন প্রশ্ন না করে নিশ্চিন্তমনে শুনলো। আমি থামতেই বললো কেস অব সিজোফ্রেনিয়া, ভাল একজন সাইক্রিয়াটিস্ট দেখানো দরকার।

অসুখটা বুঝলাম না?

এই ধরনের রুগী প্রতি মুহূর্তে সন্দেহ করে। কেউ কথা বললে মনে করে ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, নিজে নিজে কথা বললে ভাববে কেউ বুঝি ওরা কথা আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনছে। এই ধরনের বিচিত্র ব্যাপার আর কি?

এই মানসিক অবস্থা বেশিদিন চললে পাগল হয়ে যেতে পারে?

হ্যাঁ, তা পারে। তবে ঠিকমতো চিকিৎসা হলে ভালও হয়ে যায়। আমার পরিচিত দু'জনকে ভাল হতে দেখেছি। এখন একদম নর্মাল। তবে এ ধরনের লোককে সব সময় স্বাভাবিকভাবে থাকতে দিতে হয়। যে কোন ধরনের মানসিক প্রেসারে আবার অসুস্থ হতে পারে।

রায়হানের কেসটা কিন্তু জটিল রেজা। যে ওকে স্বাভাবিক রাখতে পারবে সে ওর নাগালের বাইরে।

একথাটিই আমি তোকে বলতে চাচ্ছিলাম জামেরী। ওর সঙ্গে জড়িয়ে পড়া কি তোর ঠিক হচ্ছে? হাজার হলেও রায়হান খুনী। দেশে আইন-আদালত রয়েছে।

কিন্তু ওর যা অবস্থা ওকে আমি তাড়িয়ে দিতে পারি না রেজা। এখন পর্যন্ত ওকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়নি তখন মানসিক হাসপাতালে পৌঁছে দেয়া আমার কর্তব্য। তারপর দেশের আইন ও বুঝবে। আমি তো কোন অন্যায় করিনি।

আইনের প্যাঁচ বড় শক্ত জামেরী। কোনখান দিয়ে কি ভাবে জড়িয়ে পড়বি বুঝতেও পারবি না। একজন খুনীকে তুই প্রশ্রয় দিচ্ছিস তা ভুলে যাস না।

কিন্তু এই মুহূর্তে ও খুনী নয়, রুগী। অসুস্থ। ওকে আশ্রয় দেয়া আমাদের মানবিক দায়িত্ব। তুই হলে কি করতি? পারতি তাড়িয়ে দিতে?

কি জানি হয়তো পারতাম না। কিন্তু আইনের দিকটা ভুললেও চলবে না। জানিস তো অনেক সময় একচুল এদিক ওদিকের জন্যে বিনা অপরাধে কেউ সারাজীবন কারাগারের কাটায়। সত্যি বলতে কি এইসব ব্যাপারগুলোকে আমি ভয় পাই।

অহেতুক ঝুক্কবুড়ির ভয়ে রায়হানকে আমি ফেলে দিতে পারবো না। ওকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দেই। তারপর ওখান থেকে যদি পুলিশ ওকে ধরে আনে তাহলে আমার দুঃখ থাকবেনা।

দেখ যা ভাল বুঝিস কর।

আর একটা সিগারেট দে।

সিগারেট দিয়ে রেজা চা আনালো। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। এমারজেন্সীতে এম্বুলেন্স এলো। সেই শব্দ পাচ্ছি। কে যেনো এসে রেজাকে ডেকে নিয়ে গেলো। মনে হচ্ছে সিগারেটের ধোঁয়ায় আমি তলিয়ে যাচ্ছি। ভীষণ ধোঁয়া আমার চারপাশে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। সেই নীলাভ ধোঁয়ায় রেজা, রায়হান, শরাফী, সাইকি, মিতুল সবাই ঢাকা পড়েছে। আমি কাউকে খুঁজে পাচ্ছি না। একে একে সবাই তলিয়ে গেলো। কেবল আমি একলা ধোঁয়ার ভেতর সাঁতার কাটছি।

কি রে কি ভাবছিস? চা জুড়িয়ে ঠাণ্ডা। সিগারেট টেনেছিস বলেও তো মনে হয় না।

আমি হাসলাম। রেজা আবার চা আনতে বললো। আমার মুখটা তেতো হয়ে গেছে। কিছু ভাল লাগছে না। হঠাৎ রেজা বললো, জামেরী একটা মেয়ে দেখ না বিয়েটা সেরে ফেলি।

আমারে দেখায় তুই বিয়ে করবি কেন? পরস্পরের জানাশোনা না থাকলে বিয়েটা আমার ভীষণ হাস্যকর মনে হয় রেজা। তুই কি করে বুঝবি যে যাকে তুই বিয়ে করছিস তার মন-মেজাজের সঙ্গে তোর মন-মেজাজ খাপ খাবে? সে একান্তই তোর বাধ্যগত হবে?

উঃ, বক্তৃতা থামা। তোর কথা সব বুঝলাম। কিন্তু জানাশোনা করবার মতো সময় আমার কৈ?

সময় না থাকলে মুখে বুড়ো আঙুল পুরে চুপচাপ থাক।

একদম হৃদয়হীনের মতো কথা বলছিস। বুঝেছি, তোকে দিয়ে হবে না। অন্য কাউকে ধরতে হবে।

তাই ধর।

তোর কি খবর বল? আর কতকাল ঝুলে থাকবি?

ঝোলাঝুলি এবার শেষ করছি। সামনের মাসের দশ তারিখে বিয়ে।

কংগ্রাচুলেশন।

রেজা আমাকে জড়িয়ে ধরলো। রেজার বুকের উত্তাপে বড় আরাম পেলাম। মাঝে মাঝে বড্ড হতাশ হয়ে যাই। তখন এ ধরনের অনুপ্রেরণায় উৎসাহ পাই।

তোর বিয়ের খবরে আমার নিজেরই খুশী লাগছে আমেরী। ভাবতে ইচ্ছে করছে যে, খবরটা তোর নয়, আমার।

আমি হো হো করে হাসি। রেজার সরলতা আমাকে নির্মল আনন্দ দেয়।

চল, ওয়ার্ডে ঘুরে আসি।

ওয়ার্ডে হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হয়, সব রুগীর চেহারা আজ আমি অন্যরকম দেখছি। সবার মুখে যেনো একটা আলগা খুশীর আমেজ। এমন কি স্যালাইন দেয়া অচেতন রুগীর মুখটিও। রেজা প্রতিটি রুগীর খবরাখবর নিচ্ছে। কেউ শুধু মাথা নেড়ে জবাব দিচ্ছে। কেউ ডাক্তার পেয়ে গল্ গল্ করে কথা বলতে চাচ্ছে। কষ্টের কথা। শারীরিক যন্ত্রণার কথা। কবে ছাড়া পাবে, তার কথা। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি। কথা বলি না। বেরিয়ে এসে রেজা একটু অবাক হয়, তুই আজ একটা কথাও বললি না যে?

আজ আমার দেখতেই ভাল লাগছিলো রেজা। সবার চেহারায় আমি যেনো নতুন জন্মের আলো দেখেছি। ওরা কেউ অসুস্থ নয়।

পাগল।

রেজা হাসলো। ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি যখন পথে নামলাম, তখন পড়ন্ত বিকেল। সারাদিনের গুমোটের পর এখন ফুরফুরে বাতাস বইছে। অক্টোবরের মাঝামাঝি। দিন ছোট হচ্ছে। অথচ সে তুলনায় ঠাণ্ডা পড়েনি। রিক্শা নিলাম অফিসে যাবার জন্যে।

আমার কথায় রেজা আমাকে পাগল বললো। আসলে ও বুঝতে পারলো না এমনি করেই আমরা দুঃখ থেকে পালাই। অন্তত পালাতে ভালবাসি। এমন করে কখনো কখনো অন্য কোথাও আশ্রয় নিলে জীবনটা বোঝা মনে হয় না। যাদের আমি হাসপাতালে দেখে এসেছি, তারা কেউ কেউ মরে যাবে। কেউ ভাল হবে। অথচ সবাইকে আমার সুস্থ ভাবতে ভাল লাগলো। এই ভাল লাগাটাই আমার ক্ষণিকের মুক্তি। বেঁচে থাকার টুকরো টুকরো দ্বীপ। এই সমস্ত সবুজ দ্বীপের সমন্বয় আমাদের আলো দেয়, হাওয়া দেয়, অলৌকিক গান শোনায়। আমরা সেই গানের আকর্ষণে পাগলের মতো ছুটি। তখন মনে হলো না রেজা এক অর্থে পাগল শব্দটা ঠিকই ব্যবহার করেছে। কখনো কখনো পাগল হওয়া আমাদের জন্যে ভীষণ প্রয়োজন।

শুক্রবার দশটার দিকে মিতুলকে নিয়ে বেরুলাম। ওকে কেমন ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চোখ বসে গেছে। চোখের নীচে স্পষ্ট কালো দাগ। ও যেনো বহুকাল ধরে রাত জেগে ডিউটি করেছে। ও যেনো অনন্তকালের হাসপাতালের নার্স। তাই চেহারায় অমন ক্লান্তির পলেস্তারা। আমার মন খারাপ হয়ে গেলো। ও আমার দিকে তাকিয়ে কেমন ফিকে হাসলো। রোদ-ঝকমক ভর দুপুরের ছায়া সে হাসিতে নেই। রিকশায় ও আমার সঙ্গে বেশি কথা বললো না। আমার দু'-একটা প্রশ্নের উত্তরে মাথা নাড়লো কেবল। বাসার সামনে রিকশা থামতে ও বললো, আমার বুকটা জানি কেমন করছে জামী।

ও কিছু না। এসো।

জামী, আমি বুঝতে পারছি না, আমি কেন এলাম?

আঃ মিতুল, এখন ওসব ভেবো না।

দরজার কড়া নাড়লাম। সেই ছেলেটি এসে দরজা খুলে দিলো। আমরা দু'জনে বসলাম। মিতুল ঘরের চারদিকে একটু নিস্পৃহ দৃষ্টিতে তাকালো। ওষুধের শিশি দেখলো, ক্যালেণ্ডার দেখলো, বিবর্ণ পর্দা দেখলো। ভদ্রমহিলা এলেন। আমরা দু'জনে উঠে দাঁড়ালাম। মিতুলকে দেখে থমকে গেলেন প্রথমে। সঙ্গে সঙ্গে সেটা কাটিয়ে সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করলেন। আমি বললাম, ও মিতুল।

বোস।

তিনজনে বসলাম। মিতুলের দৃষ্টি বিবর্ণ পর্দার গায়ে। লক্ষ্য করলাম, ওর ঠোঁট কাঁপছে। ভদ্রমহিলা মিতুলকে দেখছেন। তাঁর প্রতিক্রিয়া বুঝতে পারছি না। আমি পরিবেশ হালকা করার জন্যে বললাম, আপনার সঙ্গে একবার দেখা না করলে মিতুলের সঙ্গে আমার বিয়েটা হয় না, এজন্যে ওকে নিয়ে এলাম।

কেন?

ভদ্রমহিলা গম্ভীর মুখে ভুরু কোঁচকালেন।

এটা ওর শর্ত।

আমি একা হাসলাম। জোর করে হাসা। ওরা দু'জনে আড়ষ্ট। আমি অস্বস্তিতে পড়লাম। মিতুল কেন কথা বলছে না? যাঁকে কেন্দ্র করে ওর এতো আবেগ, তাঁকে সামনে পেয়ে ও এমন চুপ কেন? ভদ্রমহিলা বরাবরই কম কথা বলেন। তাঁর দিক থেকে আমি তেমন উচ্ছ্বাস আশা করি না। কিন্তু মিতুল আমাকে বিপদে ফেললো। ও এমন নির্বিকার হয়ে যাবে, আমি ভাবতে পারিনি।

তোমরা বোস। আমি চা নিয়ে আসি।

ভদ্রমহিলা আজ আমাকে তুমি বলছেন।

না, চা খাব না। জামী, চলো যাই।

মিতুল উঠে দাঁড়ালো।

সে কি, আর একটু বোস না!

না। চলো।

আঃ আর একটু বোস না মিতুল।

আমার শরীর খারাপ লাগছে। বমি আসছে।

মিতুলের দু'চোখে ঘৃণা। ঠিক সাইকের মতো। তখুনি ও দু'পা এগিয়ে গেলো। ভদ্রমহিলার মুখোমুখি দাঁড়ালো।

তোমার কাছে আমার একটি প্রশ্ন আছে।

মিতুলের কণ্ঠে বিদ্যুতের ঝলক। ভদ্রমহিলা কিছু বললেন না। ঠাণ্ডা মাথায়, শান্ত চোখে মিতুলকে দেখছিলেন।

তোমার কাছে বাবার কি অপরাধ ছিলো?

ভদ্রমহিলা চুপ। উত্তেজনায় মিতুলের চেহারা পাল্টে গেছে।

কথা বলছো না কেন?

এসব কথা থাক মিতুল।

আমি ওকে হাত ধরে টেনে আনতে চাইলাম। ও এক ঝটকায় আমার হাত ছাড়িয়ে নিলো। দেখলাম, ভদ্রমহিলার ঠাণ্ডা দৃষ্টি দপ্ করে জ্বলে উঠলো। দুই ভীষণ প্রতিপক্ষ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মিতুলের আচরণে আমি বিব্রত, লজ্জিত। কোনদিন বুঝতে পারিনি, মা-র প্রতি ওর এতো আক্রোশ, এতো ঘৃণা। আমার মনে হলো, মিতুলের ভেতরে একটা বাঘ বসে ভীষণ গর্জন করছে।

তুমি জবাব দেবে না?

আমি কৈফিয়তের জবাব দেই না। তাছাড়া তুমি কৈফিয়ৎ চাইতে পারো না। কেননা তোমার ওপর আমার কোন দাবী নেই।

তা আমি জানি। তবে জেনো, জোর করে ভুলতে চাইলেই ভোলা যায় না।

যারা দুর্বলচিত্তের, তারা নিজের মনে কষ্ট তৈরী করে যন্ত্রণা পায়। আমার সে ধরনের বাতিক নেই।

তুমি একটা ডাইনী। ঠিক ম্যাকবেথের তিন ডাইনীর একজন।

মিতুল চেঁচিয়ে বললো।

এসব কি হচ্ছে মিতুল? তুমি এমন করবে জানলে তোমাকে আমি কখনোই আনতাম না। তুমি কি এমন করে তোমার মাকে দেখতে চেয়েছিলে?

আমি রেগে গেলাম। হঠাৎ মিতুল আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালো, যাকে দীর্ঘকাল ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম, তাকে তো অন্তরের কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

ওর চোখে জল টলমল করছে। ও ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো। আমি অপ্রস্তুতের হাসি হেসে ভদ্রমহিলাকে বললাম, আপনি কিছু মনে করবেন না।

এ আমি জানতাম। এজন্যে আমি আপনাকে নিষেধ করেছিলাম। আপনি কেন ওর কল্পনার জগৎ ভেঙে দিলেন?

ভদ্রমহিলার রূঢ় কণ্ঠে আমি বিমূঢ়। কথা না বলে বেরিয়ে এলাম। মিতুল ততক্ষণে গলির মাথায় চলে গেছে। কেন জানি না দু'জনেই পিছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম, দরজার কপাট ধরে তিনি দাঁড়িয়ে। ভেবেছিলাম,

কুয়াশা ভেদ করে আমি বন্দরে পৌঁছবো। কিন্তু বন্দর আমার নাগালের বাইরে। ঐ বন্দরে আমি কোনদিন পৌঁছতে পারবো না। তার মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। নিজের ওপর ভীষণ বিশ্বাস ছিলো। তাই ভেতর থেকে কে যেন খোঁচাচ্ছে, কি হে লেখক, খুব না অহংকার? কৈ, পারলে না তো সে মুখের একটা রেখাও পড়তে! অন্তত এক জায়গায় ঠকে গেছো। আমি প্রসন্ন চিত্তে সে পরাজয় স্বীকার করলাম। আমার কোন গ্লানি হলো না।

রিকশায় মিতুল অনেক কাঁদলো। কিছুতেই কান্না থামাতে পারলাম না। ওকে কান্নার সুযোগ দিয়ে খানিকক্ষণ এ রাস্তা ও রাস্তায় ঘুরলাম। শেষ পর্যন্ত কাছে রেঁস্তোরায় নিয়ে এলাম ওকে। মিতুল এখন শান্ত।

কেবিনে বসে আমি ওকে রুমাল বের করে দিলাম।

মুখটা মুছে নাও।

ও শান্ত মেয়ের মতো তাই করলো। ভেবেছিলাম, যাকে দেখার পর ওর ক্লান্তি মুছে যাবে। কিন্তু ভুল। ওটা আরো গাঢ় হয়ে চেপে বসেছে।

জামী, তুমি রাগ করেছো?

না।

টেবিলের ওপর পড়ে থাকা ওর হাতটা নিজের মুঠিতে নিলাম।

জামী, আমি কেন এসেছিলাম এখানে? না এলেই তো পারতাম?

আর মন খারাপ কোর না। ভালোই তো হয়েছে। তোমার মনে আর কোন কষ্ট থাকবে না।

মিতুল মাথা নাড়লো।

না জামী, এ কষ্ট আমার চিরকালের।

মিতুল?

তুমি আমাকে ক্ষমা করো জামী।

ও মুখটা নীচু করলো।

আমি এখন থেকে সবার কথা ভুলে যাবো। বাবা—মা—তুমি—তোমার কথাও ভুলে যাবো।

মিতুল।

তুমি কষ্ট পেয়ো না জামী। দেখছো না, আমি যাকে খুঁজি, তাকে কোনদিন পাই না। দেখছো না, বাবার ভালবাসায় আমার ঘৃণা। দেখছ না—,

চুপ করো মিতুল।

আমি ধমকে উঠলাম। আমার মেজাজটা আগে থেকেই খারাপ ছিলো। সে জন্যে ধমকটা একটু বেশি জোরে হয়ে গেছে। ও চমকে উঠে থমকে গেলো। তারপর ছলছলে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

মাঝে মাঝে তোমার জন্যে দরকার চাবুক। নইলে তুমি ঠিক থাকবে না। চলো, বাড়ি ফিরবো।

বাড়ি?

ন্যাকা, কিছু বোঝ না?

আমার সারা শরীরে বুনো রাগের স্রোত। বেয়ারারা মুখের দিকে তাকিয়ে। আমি উপেক্ষা করে বেরিয়ে এলাম। মিতুল পিছু পিছু এলো। ওকে রিকশায় তুলে দিয়ে বললাম, বাসায় যাও।

তুমি যাবে না?

না।

আমী, রাগ করেছো?

বাসায় যাও বলছি।

আমার গলায় কর্তৃত্বের সুর। আর আটদিন পর মিতুল আমার বৌ হবে। সেই জোরেই আজ ওকে আমি শাসন করছি। রিকশা চলতে আরম্ভ করলে আমি সেদিকে তাকিয়ে রইলাম। মিতুল একবারও পেছন ফিরে তাকালো না। ওর ওপর রাগ করে বাসায় ফিরলাম না। এখন অনাবশ্যক ঘোরাঘুরি ছাড়া আমার কিছু করার নেই।

পরদিন সকাল থেকে পুরো বাড়ির চুনকাম শুরু হলো। মিতুলের বাবাই কাজটা করাচ্ছেন। বিয়ে উপলক্ষে কিছু কিছু আত্মীয়-স্বজনও এসেছে ওদের বাসায়। কেনাকাটা, কার্ড ছাপানো ইত্যাদি নানা কারণে মিন্টু ঘন ঘন আসা-যাওয়া করে। বুঝি সব আয়োজনই আমার বিয়ের, তবু ভাল লাগে না। মেজাজ খারাপ থাকে। সেই রাগের পর থেকে মিতুলের সঙ্গে দেখা নেই। লজ্জায় ওদের বাসায়ও যেতে পারিনা।

ঝর্ণাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, তোমার আপু কি করে?

শুয়ে আছে।

এই অসময়ে শুয়ে আছে?

কি জানি, আপুর যেনো কি হয়েছে, সব সময় শুয়ে থাকে। মা বকলে

বকাবকি করে, তবু ওঠে না। কোন কোন সময় আমি ভাত খাইয়ে দেই। আপুকে আমি খুব ভালবাসি কিনা।

অসুখ করেনি তো?

না বোধহয়। বাবাতো জিজ্ঞেস করে শরীর খারাপ কিনা? তখন বলে, না এমনি শুয়ে আছি।

তুমি একদিন বিছানায় পানি ঢেলে দিতে পারো না?

যাঃ তাকি হয়!

ঝর্ণা আমার পিঠে দুমদাম কিল বসায়।

আপনি ভারি হিংসুটে। দেখবেন বিয়ে হলে আবার আপুকে যেনো না খাইয়ে রাখবেন না?

তোমার বুঝি তাই মনে হয়?

হয়ই তো। নইলে কেউ পানি ঢালার কথা বলে?

ঝর্ণা চলে গেলো। তবু আমার মেজাজটা খারাপ হয়ে রইলো। সেদিন অহেতুক মিতুলের ওপর রাগ করেছি। রাগ করার কোন সঙ্গত কারণ ছিলো না। না ভুল। আসলে ছিলো। আমি ভেবেছিলাম মিতুল ওর মাকে দেখে আবেগে বিহ্বল হয়ে যাবে, জড়িয়ে ধরবে, কাঁদবে। দীর্ঘদিনের জমানো কষ্টটা দূর হবে। কিন্তু হলো তার উল্টো। মিতুল ওর কষ্ট নিয়ে মিতুলই রয়ে গেলো। মার সঙ্গে ও আপোষ করতে পারলো না। মুখ ফিরিয়ে চলে এলো। এই চলে আসাটা প্রাণে বড় বেজেছে। আমি মিতুলের জন্যে একটা আশ্রয় তৈরী করতে পারিনি—যেখানে বসে ও দু'দণ্ড শান্তি পাবে। আমার এ ব্যর্থতা গ্লানি হয়ে মরমে মারছে। সেজন্যেই সব রাগ মিতুলের ওপর গিয়ে পড়েছে। এখন আর পিছু হটার যো নেই। ওর সঙ্গে দেখা করার পথ নেই। ও নিজেও বেরুচ্ছে না। আমাকে কষ্ট দেয়ার জন্যেই গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। অতএব বাসর রাতের অপেক্ষায় রইলাম। আর মাত্র ক'টা দিন। মনে মনে প্রার্থনা করলাম এ প্রতীক্ষার প্রহর যেনো তাড়াতাড়ি কাটে।

অফিসের কাজ জমেছে প্রচুর। এখনো ছুটি নিতে পারিনি। বিয়ের দু'দিন আগে ছুটি নেবো। পরদিন বেশ রাত করে বাসায় ফিরলাম। চারদিক নিঝুম। রাস্তায় দু'-একটা গাড়ি হুস্ করে চলে যাচ্ছে। আমার দরজার সামনে কে যেনো বসে আছে। প্রথমে ঘাবড়ে গেলাম। পরে মনে

হলো নিশ্চয়ই রায়হান। ও ছাড়া এতো রাতে আর কে আসবে।

সিঁড়ির মাথায় উঠে দেখলাম দরজায় হেলান দিয়ে ও দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। নাক ডাকার বিদঘুটে শব্দটা সেই নির্জন রাতে আমার কানে বড্ড বেসুরো বাজলো। ওর গায়ে হাত দিয়ে ধাক্কা দিলাম।

এই রায়হান? রায়হান?

এ্যাঁ কে? কে? কোন শালার ক্ষমতা আছে আমাকে ধরবে?

ও রুখে উঠলো।

এই থাম, থাম। আমি জামেরী।

ওঃ জামেরী? তুই আমাকে তাড়িয়ে দিবি না তো?

আয়, ঘরে আয়।

আমি দরজা খুলে ঢুকলাম। ও পিছু পিছু ঢুকে আমার বিছানায় টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লো।

আমি তোর এখানে কয়েকদিন থাকবো জামেরী। অন্যকোথাও থাকতে আমার একদম ভাল লাগে না। শুধু তোর কাছে আসতে ইচ্ছে করে। তুই রাগ করেছিস?

না তুই ঘুমো। খেয়েছিস?

হ্যাঁ। পেটপুরে খেয়ে এসেছি।

রায়হান উল্টোদিকে মুখ ফেরালো। একটু পরে ওর নাক ডাকার শব্দ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুতে ইচ্ছে করলো না আমার। সিগারেট জ্বালালাম। পায়চারী করলাম। জানালায় দাঁড়ালাম। হঠাৎ মনে হলো বেশ কিছুদিন আমি কোন বই পড়িনি। তবে হ্যাঁ উপন্যাসটা গুছিয়ে এনেছি। আর দু' অধ্যায় লিখলেই শেষ হয়ে যাবে। টের পেলাম শরীরে সুস্পষ্ট বিদ্রোহ। অর্থাৎ লেখা বা পড়া কোনটাই চলবে না। অথচ সারারাত যদি চেয়ারে সিগারেট টেনে শেষ করি, তাহলে তার কোন আপত্তি থাকবে না। মাঝে মাঝে শরীরটা এমনি ছলনা করে। আকাশে চাঁদের হুজ্জত। আঁচল-মেলা আলোর হাতছানি। জানালায় মুখ রেখে সেই আলো দেখলাম। আলো কখনো সাইকির মুখ হলো। কখনো মিতুলের। রায়হানের নাক ডাকার শব্দ মাঝে মাঝে প্রবল হয়। ওর জন্যে বুকটা ভার হয়ে রইলো। অনেকটা পাথুরে-ভার। সহজে নড়ানো যায় না। কোথায় গেলো ওর সেই ঝকঝকে জীবনযাপন, কোথায় গেলো অর্থের

জন্যে মাতোয়ারা উল্লাস, কোথায় গেলো সাইকির জন্যে আত্মঘাতী ভালবাসা ? রায়হান এখন কুকুরের জীবনযাপন করছে। ও এখন আস্তাকুঁড়ের অধিবাসী। ওর হৃদয়ে প্রেম নেই। এমনি করে ভালবাসার জন্যে জীবনের অন্যসব অর্থ ফুরিয়ে যায় রায়হানকে না দেখলে আমার বিশ্বাস হতো না।

বাথরুমে জলপড়ার শব্দ হচ্ছে। টপ্ টপ্ টপ্ টপ্। জল পড়ার শব্দ আমি সইতে পারি না। মাথার মধ্যে যেনো কোটি পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে ওঠে। বাথরুমে গিয়ে ট্যাপটা খুব ভাল করে চেপে বন্ধ করলাম। ঘরে ইঁদুরের খেলা শুরু হয়েছে। এ মাথায় ও মাথায় দৌড়াদৌড়ি করছে। হাঁড়িকুড়ি ঝন্ ঝন্ করে উঠছে। আশংকিত হলাম, রায়হান আবার জেগে না ওঠে। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে দেখলাম ও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। মনে হয় অনেকদিন ও এমন নিরবিলি ঘুম ঘুমোয়নি। ওর কানের কাছে ডিনামাইট ফাটলেও জাগবে না, যতক্ষণ না ওর উত্তেজিত স্নায়ু প্রশমিত হয়।

স্যুটকেস থেকে একটা চাদর বের করে মেঝেয় পেতে শুয়ে পড়লাম। সহজে ঘুম আসতে চায় না। বিছানা বদল হলে আর রক্ষে নেই। এটা আমার অভ্যেস। উঠে সিগারেট জ্বালালাম। শুয়ে শুয়ে খানিকক্ষণ সিগারেট টানতেই আস্তে আস্তে ঘুম এলো। সকালে উঠে দেখলাম রায়হান তখনো ওঠেনি। তবে ওর ঘুম পাতলা হয়েছে। এপাশ-ওপাশ করছে। বাথরুমে বসে ঠিক করলাম, ওকে আজ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবো। বিয়ের আগেই হাসপাতালে পাঠানোর কাজটা শেষ করতে হবে। চা বানিয়ে ওকে যখন ডাকলাম, তখনো দু'চোখ ভরা ঘুম ওর।

ওঠ। চা খেয়ে নে।

আর একটু ঘুমোবো।

না, না এখন ঘুমোলে চলবে না। দুপুরে না হয় ঘুমোস। এখন একটা কাজ আছে। ওঠ।

কি কাজ ?

ওঠ না। ডাক্তারের কাছে যাবো।

ডাক্তার ? ডাক্তার কেন ?

ও লাফ দিয়ে উঠলো। আমি কথা না বলে বাথরুম দেখিয়ে দিলাম।

ও আর প্রশ্ন করলো না। কি বুঝলো কে জানে। সোজা বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। চা খেয়ে কাপড় পরার পর রায়হান আবার বেঁকে বসলো।

না আমি ডাক্তারের কাছে যাবো না। তুই যা। ডাক্তারের হাতে সুঁই দেখলে আমার ভীষণ ভয় করে। তাছাড়া আমার কি হয়েছে যে, ডাক্তারের কাছে যেতে হবে?

তোর কিছু হয়নি। আমার হয়েছে। চল।

রিকশায় সারাক্ষণ বক্‌বক্‌ করলো রায়হান। ছন্দার কথাই বেশি বললো। মাঝে মাঝে চুপ করে থাকে। আবার ঝট্‌ করে বলে, না থাক ছন্দাকে আমি ভুলে যাবো। কথার কোন প্রসঙ্গ ছিলো না। যখন যেটা মনে আসছিলো, বলে যাচ্ছিলো। রায়হানকে পেয়ে আমার যেনো একটা নতুন কাজ বাড়লো। আমি মন খারাপের কথা ভুলে গেলাম। কিছুতেই বিমর্ষ থাকতে চাই না। অথচ অজান্তেই ভাবটা এসে যায়। রায়হানের সুস্থতার জন্যে চেষ্টা করছি এই বোধ আমাকে আনন্দ দিলো।

ওকে বাইরে বসিয়ে রেখে ডাক্তারের কাছে পুরো ব্যাপারটা খুলে বললাম। কোন কথা লুকোলাম না। একবার ভেবেছিলাম খুনের ব্যাপারটা চাপা দিয়ে যাবো, পরে ভাবলাম না সেটা ঠিক হবে না। সব খুলে বলতে ডাক্তার খুশী হলেন। তিনিও আমার সঙ্গে একমত যে, বর্তমানে খুনীর চাইতে ওর বড় পরিচয় রুগী। সুতরাং তার কর্তব্য তিনি করবেন। রায়হানকে ভেতরে ডেকে নিয়ে এলাম। ডাক্তারের সামনে এসে ও ভেঙে পড়লো, সত্যি বলছি আমার কোন অসুখ করেনি ডাক্তার সাহেব, ও মিছেমিছি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।

আমি তা জানি, আপনি বসুন।

ডাক্তারের গম্ভীর কণ্ঠে ও শান্ত হয়ে গেলো। ওর মধ্যে তখনো একটা ঘুম ঘুম ভাব। একবার আমার দিকে তাকায়, একবার ডাক্তারের দিকে। যেনো আমাকে ও সন্দেহ করতে শুরু করছে। ডাক্তার ওকে কয়েকটা প্রশ্ন করে ছেড়ে দিলো। আবার আগামীকাল আসতে হবে। বাইরে বেরিয়ে রায়হান আমাকে ইচ্ছেমতো গালাগাল করলো।

বাইরে বেরিয়ে আসার আগে ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন, এ ধরনের সিজোফ্রেনিয়ার রুগী আমি অনেক ভাল করেছি। এখনো খুব সিরিয়াস হয়নি। হাসপাতালে পাঠানোর দরকার নেই। বাসাতেই থাকুক।

বাসায় ফিরে ও আমার সঙ্গে বেশি কথা বললো না। গালাগাল সব রাস্তায় শেষ করেছে দেখে আশ্বস্ত হলাম। ও চুপচাপ গিয়ে জানালার কাছে বসে রইলো। একদম একঠায়। মিন্টু বার দুই এসেছিলো। একবার জিজ্ঞেস করলো, কে? বললাম, বন্ধু। অসুস্থ। মিন্টু ওকে খুব ভাল নজরে দেখলো না। বিয়ের আর চার-পাঁচ দিন বাকী এর মধ্যে এইসব ঝামেলা, মনোভাব এই রকম আর কি? ভাবছি বিয়ের আগে ওকে ওর বোনের বাসায় রেখে আসবো। এজন্যে রায়হানের থাকা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাইনি। সে রাতেও আমার ঘুম এলো না। সারারাত এপাশ-ওপাশ করলাম। অর্থহীন অবাস্তব স্বপ্ন দেখলাম। মনে হলো আমি নিজেই সিজোফ্রেনিয়ার রুগী হয়ে গেছি। যেনো আমার চারদিকে জল থৈ থৈ করছে আর আমি প্রাণপণে পালাতে চাইছি।

পরদিন ডাক্তারের কাছ থেকে ফিরে আসার পর রায়হান আরো চুপ হয়ে গেলো। কথাবার্তা একদম বন্ধ করেছে। প্রশ্ন করলেও উত্তর দেয় না। মাথা নাড়ে শুধু। ডাক্তার অনেক ওষুধ দিয়েছে। ওর এখন বেশি করে দরকার পরিপূর্ণ বিশ্রাম। ওকে ঘুমের ওষুধ দেয়া হয়েছে। রায়হানের পকেট হাতড়ে পাঁচশ টাকা পেয়েছি। তাই দিয়ে ওষুধ কিনে নিয়ে এলাম। দুপুরে সামান্য ক'টা ভাত খেলো ও। খেতেই চায় না। খাবার দেখলে রেগে ওঠে। ওষুধ খাইয়ে দেয়ার পর বিছানায় শুয়ে পড়লো। এ কয়দিনে ওর চেহারা একদম অন্যরকম হয়ে গেছে। অসহায় শিশুর মতো দেখাচ্ছে ওকে। বিশ্রামের সঙ্গে সঙ্গে এখন ওর দরকার সেবা। কে ওকে সেবা দিয়ে, শুশ্রূষা দিয়ে মমতা দিয়ে ভরিয়ে রাখবে? তেমন কেউ নেই। আমার পক্ষেও সম্ভব না। ভাবলাম ওর বড় বোনের ওখানে রেখে আসবো। সেখানে ও যত্ন পাবে। এক একবার ভাবি, রায়হানকে নিয়ে সাইকির কাছে যাই, ওকে ডেকে দেখাই। পরক্ষণে মন সংকুচিত হয়ে আসে। থাক, সাইকি দূরেই থাক।

অল্পক্ষণে রায়হান ঘুমিয়ে পড়লো। ওকে তালা আটকে রেখে আমি বেরিয়ে পড়লাম। সকালে ওর একটা ওষুধ পাইনি। সেটা খুঁজতে বায়তুল মোকাররম যাবো। মনটা আবার খারাপ হয়ে গেলো। মনটা কেবল মিতুলের সঙ্গে দেখা করার জন্যে ছটফট করে। মিতুল যেনো একটা অদৃশ্য খোলসে ঢুকে গেছে। কোনকালে আর সেখান থেকে বেরুবে না।

গুহার মুখে দাঁড়িয়ে আমি প্রাণপণে চিৎকার করছি, ও শুনতে পাচ্ছে না। ডাকতে ডাকতে আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। মনে মনে ওকে শাসালাম। বাসর রাতে সব শোধ তুলে নেবো মিতুল। তখন মজাটা টের পাবে। ও আমার ওপর রাগ করেছে, এ বোধ আমাকে অস্থির করে দেয়।

বায়তুল মোকাররমে ওষুধটা পেলাম না। অথচ ডাক্তার বলেছে এ ওষুধটা ভীষণ প্রয়োজন। এটা না হলে হবে না। মেজাজ খারাপ। হাঁটতে হাঁটতে স্টেডিয়াম এলাম। শরাফীর সঙ্গে দেখা।

কি রে, এমন এতিমের মতো ঘুরছিস যে?

তোর ওখানে যাবো ভাবছিলাম শরাফী।

কি ব্যাপার বলতো?

চল, ঐ রেঁস্তোরায় বসি।

শরাফীকে কাছে রেঁস্তোরায় নিয়ে এলাম। ও নিজেই চা আর কাটলেটের অর্ডার দিলো।

বল তোর খবর কি? একটু শুকিয়ে গেছিস যেনো? বিয়ের আগে সবাই ফুর্তিতে থাকে। তোকে দেখে মনে হচ্ছে মরতে যাচ্ছিস? কোন ঘাপলা হয়নি তো?

আর বলিস না, মেলা ঝামেলায় আছি। শোন্ তোকে যে জন্যে খুঁজছিলাম, তাহলো বিয়ের দিন তোর বাসা থেকেই বরযাত্রী রওনা দেবে।

এ আর এমন কি। এক কাজ কর, তুই আজই আমার বাসায় চলে আয়। এখন আর ওখানে থাকার দরকার নেই। আমার বৌ-ও তাই বলছিলো। কি বলিস?

সে দেখা যাবে।

আমি ইচ্ছে করে রায়হানের ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলাম। বেয়ারা চা দিয়ে গেলো। শরাফী কাটলেট মুখে পুরে বললো, প্রস্তাবটা ভাল করেছি কি না বল?

একটু অসুবিধা আছে শরাফী। আমি বিয়ের দিনই তোর ওখানে যাবো।

হুঁ, বুঝেছি ওখানে থাকলে মিতুলকে অন্তত চোখের দেখা দেখা যাবে এই আশা তো?

আমি হাসলাম।

তোর হাসি দেখলে গা জ্বলে। বিয়ের পর তুই কেবল বৌ-র আঁচল ধরে থাকিস কি না, আমার এখন এই আশংকা হচ্ছে।

শরাফী হো হো করে হাসলো। হাসতে হাসতে বিষম খেলো। আমি গ্লাস থেকে পানি নিয়ে আচ্ছা করে ওর মাথা ভিজিয়ে দিলাম।

মিছেমিছি আমার সঙ্গে লাগতে আসিস কেন?

মিছেমিছে কিনা বিয়ের পরই দেখবো। থাকবতো আসে-পাশে। দূরে তো কোথাও যাচ্ছি না।

দেখিস। আমিও তোর নাকের ডগায় বসে বসে দেখাবো।

আর যা-ই করিস, লেখালেখিটা যেনো ছেড়ে দিস না।

বাব্বা, এখন থেকেই উপদেশ। চল উঠি।

দু'জনে উঠলাম। শরাফী ওর নিজের কাজে চলে গেলো। আমি বঙ্গবন্ধু এভেনিউতে দাঁড়িয়ে মানুষের স্রোত দেখি। একান্তই উদ্দেশ্যহীন সে দেখা। সে স্রোত আমাকে মৃত বাবা-মার কথা মনে করালো। কতোদিন তাদের কথা মনে হয়নি। আমার বুকের তলে চুপটি করে বসে আছে। বুক ফেটে কান্না আসতে লাগলো। সে জনস্রোতের মাঝে দাঁড়িয়েও উপলব্ধি করলাম, আমার চারপাশে কেউ নেই। আমার নিজস্ব কেউ নেই। যার ওপর আমার সব আবদার, সব অভিমান, সব অত্যাচার খাটবে। মিতুল ছিলো সেও এখন আমার কাছ থেকে অনেক দূরে। দৌড়ে গিয়ে কোলে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকতে পারবো না। বলতে পারবো না, মিতুল, আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে। আমি এখন কোথায় যাবো? না কি রাস্তায় ইতস্তত হাঁটবো? অনেক চেষ্টা করে একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজে পেলাম না, যেখানে গিয়ে একটুখানি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারি। মিতুল না থাকাটা আমার জন্যে ভীষণ কষ্টের। মানসিক দিক থেকে আমি তখন সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। জনস্রোত দেখতে আর ভাল লাগছে না। গলার কাছে কান্নার দলাটা চেপে বসেছে। কিন্তু কোথায় যাবো? আমার ঘরে? হায় ঈশ্বর, সেটা এখন আমার জন্যে এক সিজোফ্রেনিক ভুবন।

ছয়

ইদানীং ঘুম একদম কমে গেছে। সারারাত তিন-চার ঘন্টা ঘুমাই আমি। রায়হান রাত-দিন ঘুমোয়। ওষুধের প্রতিক্রিয়ায়। নীচে ঘুমোতে হয় বলে ওষুধ এনে ইঁদুর মেরেছি। কোথাও কোন শব্দ হয় না, তবু আমার ঘুম আসে না। কিছুক্ষণ পর টের পেলাম, বাথরুমে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। টপ্ টপ্ টপ্। মাথাটা ঝাঁ করে উঠলো। কিন্তু উঠে ট্যাপটা ভাল করে বন্ধ করার ইচ্ছে হলো না। সেই শব্দে নিজের স্নায়ুকে কষ্ট দিতে ভাল লাগলো। বাইরে মৃদু হাওয়া। ইউক্যালিপটাসের পাতা নড়ছে।

রায়হান চেঁচিয়ে উঠলো।

জামেরী, জামেরী, বন্ধ কর ঐ কড়ানাড়ার শব্দ। উঃ অসহ্য! দোহাই লাগে জামেরী, ওদের থামতে বল।

রায়হান বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি ওকে ঝাঁকুনি দিলাম। স্বপ্ন দেখেছে হয়তো।

কোথায় শব্দ?

ঐ যে শুনতে পাচ্ছিস না? উঃ, কি ভীষণ জোরে জোরে কড়া নাড়ছে! আমার মাথাটা ঘুরছে জামেরী। তোর ঘরটায় কারা যেনো চারদিক থেকে কেবল কড়া নাড়তে থাকে জামেরী। আমি কাল সকালেই এখান থেকে চলে যাবো।

এখন একটু চুপচাপ ঘুমোতো রায়হান। তুই হয়তো স্বপ্ন দেখেছিস।

স্বপ্ন নয়, সত্যি। ঐ শব্দ বন্ধ না হলে আমি কিছুতেই ঘুমোতে পারবো না।

রায়হান চুপচাপ কান পেতে শুনতে লাগলো। আমার হঠাৎ মনে হলো, জল পড়ার শব্দটা এখন আমার নিজের ভারি বিচ্ছিরি লাগছে। আর সইতে পারছি না। উঠে বন্ধ করে দিয়ে এলাম। রায়হান অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

তুই ওদের চলে যেতে বললি, না?

হ্যাঁ।

তাই তো শব্দটা থেমে গেছে। যাই, ঘুমোই গিয়ে।

রায়হান ফিরে শুয়ে পড়লো। আমি পারলাম না। উঠে আলো জ্বালালাম। একটা বই টেনে বসলাম। উদ্দেশ্য সময় কাটানো। হালকা মেজাজের বই। ছুঁড়ে ফেললাম মেঝের এক কোনায়। আসলে সবকিছুতেই এখন আমার ভীষণ বিরক্তি। জানালায় দাঁড়িয়ে পর পর কয়েকটা সিগারেট টানলাম। মেজাজটা কিছুটা ধাতে আসার পর আবার এসে টেবিলের সামনে বসলাম। এবার একটা চমৎকার উপন্যাস নিয়ে বসলাম। কবে কিনেছিলাম মনে নেই। পাতার পর পাতা আমাকে আরেক জগতে নিয়ে গেলো। কেবলই মনে হতে লাগলো, দু'দিন পর মিতুলের সঙ্গে আমার বাসর।

ভোর রাতে দরজার কড়া নাড়ার শব্দ। চমকে উঠলাম। না, এ শব্দ রায়হানের মনগড়া ব্যাপার নয়। এটা সত্যিকার অর্থে দরজা খোলার ডাক। বইটা উল্টে রেখে উঠলাম। আবার শব্দ। আর একটু জোরে। দরজা খুলতেই দেখি মিন্টু।

জাবেরী ভাই, বাবা আপনাকে ডাকছেন?

কি ব্যাপার মিন্টু?

আপা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

এ্যাঁ! বলো কি?

মাঝরাতেই আপা অজ্ঞান হয়। আমরা অনেক চেষ্টা করলাম, জ্ঞান ফিরছে না। এখন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমি আনিসদের বাসা থেকে টেলিফোন করেছি এ্যাম্বুলেন্সের জন্যে। বাবা খুব নার্ভাস হয়ে গেছেন। আপনি সঙ্গে গেলে ভাল হয়।

আমি আসছি।

তাড়াতাড়ি করুন। এখুনি এ্যাম্বুলেন্স এসে যাবে।

আমি অনুভব করলাম, আমার সমস্ত শরীর কাঁপছে। ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছি না। টেবিলটার ওপর ঝুঁকে একটুখানি দম নিলাম। মিতুল এখন আমার মন থেকে মুছে গেছে। ওকে নিয়ে আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না। ওর সঙ্গে শেষ দেখার দিন আমি রাগ করেছিলাম। সে রাগ এখন সহস্রগুণ হয়ে আমার মাথার মধ্যে জলের মতো গড়াচ্ছে। আলনা থেকে সার্ট প্যান্ট নিয়ে পরলাম। কাঁপুনি এখনো থামছে না। হাঁটু থরথর করছে। দরজায় তালা দিয়ে যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছি, তখন

নীল মুকুট মাথায় এ্যাম্বুলেন্স রাজার মতো এসে দাঁড়ালো আমার বাড়ির সামনে। তার সে বিচিত্র সঙ্গীত আমার মগজের প্রতি সেলে পিঁপড়ের মতো কুটুস কুটুস কাটছে। আহা, চারদিকে কেমন রোদ্দুরের মতো আলো। আমি সিঁড়ির শেষ ধাপে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। ওরা সবাই স্ট্রেচারে করে মিতুলকে গাড়িতে ওঠালো। আমিও উঠলাম। গাড়ি চলতে শুরু করলো।

বিচিত্র শব্দটা পাঁ-পুঁ বাজছে। মনে হলো, ওটা আমারই মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। আমার মাথায় এখন নীল মুকুট। আমি রাজা। মিতুলকে নিয়ে বাসরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। কেউ আমার চলা থামাতে পারছে না। অনন্তকালের পথে আমার যাত্রা। তারপর মিতুলের সঙ্গে আমার বাসর। সেখানে আমি ওর রাগ ভাঙাবো। কেন জানি না পাশে বসে-থাকা মিন্টুর হাতটা জোরে চেপে ধরলাম।

কি হলো আমেরী ভাই?

না, কিছু না।

লজ্জা পেলাম। স্ট্রেচারের ওপর মিতুল লম্বা হয়ে শুয়ে। মাথাটা একদিকে বাঁকানো। অন্ধকারে মিতুলের মুখটা তেমন দেখা যাচ্ছে না। এ কোন্ মিতুল আমার সঙ্গে যাচ্ছে? এ মিতুলকে আমি চিনি না। ও আমাকে একবারও স্বামী বলে ডাকেনি। মিতুলের সেই দৃষ্টিটা কই? যে দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকলে মগ্ন চৈতন্যে আমার সমস্ত প্রাণ শিস হয়ে বাজতো।

ব্যাপারটা কেমন হলো আমেরী ভাই?

কোন্ ব্যাপার?

এই যে দু'দিন পর বিয়ের সব আয়োজন শেষ—

আমি কথা বলতে পারলাম না। কি উত্তর দেবো। ওটা যে আমারও প্রশ্ন।

ছেলেবেলা থেকেই দেখছি আপা যেনো কেমন? আমি ঠিক বুঝতে পারি না। তবে মনে হয় কোথায় যেনো আপার কি নেই। এমনিতে কিন্তু মনটা খুব ভাল। চমৎকার মেয়ে। এমন মেয়ে হয় না।

মিন্টুর কষ্ট বুঝলাম। গাড়িতে ওঠানোর সময় মিন্টুকে খুব কাঁদতে দেখেছি। কাঁদছিলো মিতুলের বাবা এবং মা-ও। শুধু আমি কাঁদিনি।

কাঁদতে শুরু করি। অ্যাম্বুলেন্স এসে এমারজেন্সীতে থামলো।

মিতুলকে ডাক্তারদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমরা তিনজন বাইরে সিঁড়ির ওপর চুপচাপ বসে রইলাম। মিতুলের বাবা মাঝে মাঝে নাক মুছছেন, চোখ মুছছেন। মাঝে মাঝে ফোঁচ ফাঁচ শব্দ হচ্ছে। সে শব্দ আমার কানে বড় বিশ্রি লাগছে। কিন্টু মিতুলের ছেলেবেলার অনেক কথা স্মরণ করছে। অনেক ঝগড়া, মারামারি, অনেক মধুর দিন ইত্যাদি। আমার কিছুই শুনতে ভাল লাগছিলো না। যেনো একজন মারা গেছে আর তার সম্পর্কে কিছু খুচরো আলাপ আলোচনা হচ্ছে। আমরা তিনজন পুরুষ মিতুলের জন্যে বসে রয়েছি। তার মধ্যে আমার দাবী মিতুলের কাছে সবচেয়ে বেশি। ওর বাবা শব্দ করে কাঁদছে। ওর ভাই একটানা স্মৃতিচারণ করছে। আর আমি ওর জীবনের সব—অথচ একটা কথাও বলছি না। বরং কিন্টুর বকবকানিতে বিরক্ত হয়ে বাগানে নেমে আসি। অন্ধকারে জোনাক ঝিঁ ঝিঁ চুপ। সবুজ পাতা নিঝুম। মাথার ওপর ছায়াপথ। মিতুল অসুস্থ। আমি একজন মিতুলকে ভালবাসি সে এখন অচেতন। তার চেতনায় কোন ভালবাসার ছায়া পড়ে না। শিশির পড়ছে টুপটাপ। নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ শুরু হয়েছে। আমার মাথা গরম। শরীর গরম। হিমঝরা রাত আমার কাছে মায়াবী স্পর্শ। মিতুল তুই তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যা। মিতুলরে তোকে অসুস্থ দেখতে আমার কিছু ভাল লাগে না। আমার জন্যে উন্মুখ তোর ঐ দৃষ্টি বুঁজে আছে কেন? জোর করে খুলে দেনা। তুই কি বোকা। তুই একটা পাগল। আঃ মিতুলরে আমার গলার কাছে দলাধরা শিশির জমে আছে। তোর চোখের পাপড়ি না খুললে ওগুলো কোনদিন টুপটাপ ঝরবে না।

আমি হাঁটতে হাঁটতে গেটের কাছে এলাম। গেটের সামনে আলোর বৃত্ত। মনে মনে এক দুই গুনলাম। হস্ হস্ করে সব অদ্ভুত চিন্তা কাকের মতো তাড়ালাম। আলোর বৃত্তে পা রাখলাম। কাকটা বার বার ফিরে এসে বসে মনের ডালে। আবার তাড়াই। তাড়াতে আমার একটুও ক্লান্তি নেই। এই মুহূর্তে ঐ অদ্ভুত চিন্তার কাক তাড়ানোই আমার জীবনের লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। মিতুলকে আমি সব অমঙ্গল থেকে আড়াল করে রাখবো। কোন কাকের পাখা ঝাপটানি নয়, কোন কর্কশ কণ্ঠের শব্দ নয়—মিতুলকে আমি এসব থেকে অনেক দূরে নিয়ে যাবো। সাতজেলা ভুলে

বুড়ো নখ দিয়ে রাস্তায় আঁকিবুঁকি কাটলাম। মিতুলের নাম লিখলাম। আমার নামও লিখলাম। এ্যাম্বুলেন্সটা সাঁই করে আবার কোথায় যেনো বেরিয়ে গেলো। কড়ুই গাছটার নীচে বসে পড়লাম। সে গাছটাকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে মাথা ঠুকে কাঁদতে ইচ্ছে করছে।

মিন্টু এসে পিঠে হাত রাখলো।

ডাক্তারী ভাই, এভাবে ঠাণ্ডায় বসে থাকলে নিউমোনিয়া হবে।

আমি হো হো করে হেসে উঠলাম। মিন্টু অবাক হয়ে গেলো।

হাসছেন যে?

কত নিউমোনিয়া বুকের তলে বাসা বেঁধে থাকে, বাইরের হিমঝরা রাত তার কাছে কিছুই নয় মিন্টু।

আপনার এসব কথা আমি বুঝবো না। চলুন বাবা আপনাকে ডাকছেন।

আর কোন খবর আছে?

না এখনো জ্ঞান ফেরেনি। অক্সিজেন দেয়া হচ্ছে।

তুমি যাও মিন্টু। আমি একটু পরে আসছি।

মিন্টু চলে গেলো। ও বেশ লম্বা হয়েছে। পাতলা ছিপছিপে শরীরের ছায়া কাঁপতে কাঁপতে ওর সঙ্গে মিলিয়ে গেলো। আমি কড়ুই গাছের নীচে বসে শিশির ঝরার শব্দ শুনছি। অন্ধকারে দৃষ্টি ঠিকমতো প্রসারিত করা যায় না। লাইটপোস্টের নীচে কেবল আলো। আর সর্বত্র ঝুপো ঝুপো অন্ধকার। আমি জানি মিতুলের এ অসুস্থতা আকস্মিক কোন ব্যাপার নয়। এ অসুখ ওর অনেক আগের। আজকে হলো তার শেষ জানাজানি। আমার বুকটা বার বার ফুলে ফুলে ওঠে। বাসরের কথা আর মনে থাকে না। মিতুলের ওপর আমার প্রচণ্ড অভিমান। আঃ মিতুলরে আমি যদি ঐ অক্সিজেনের মতো তোর শরীরে ঢুকতে পারতাম। মিতুল ছাড়া কোনকিছু এখন আর আমি ভাবতে পারছি না।

সকালে বাসায় এলাম। বিশেষ করে রায়হানের জন্যে আমার আসতে হলো। মিন্টু রইলো হাসপাতালে। রিকশায় আলী আহমদ সাহেব আমার সঙ্গে একটি কথাও বলেননি। এমন কি রিকশা থেকে নেমে বাসায় ঢোকার সময়ও না। তার দৃষ্টি কেমন উদভ্রান্ত ছিলো। উপরন্তু রাত জাগার ক্লান্তি তাকে পেয়ে বসেছিলো। আমি তালা খুলে ঘরে ঢুকলাম। রায়হান জানালায় মুখ রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। আমাকে দেখে কেমন

যেনো একটা ভঙ্গি করলো।

তোকে আমি কতো খুঁজেছি জামেরী? চিৎকার করে ডেকেছি। তুই কোথায় গিয়েছিলি?

একটু বাইরে গিয়েছিলাম।

আমাকে রেখে তুই আর কোথাও যাস না জামেরী। আমার বড্ড ভয় করে।

শোন রায়হান, চল তোকে তোর বোনের বাসায় রেখে আসি।

না, না আমি কোথাও যাবো না। তোকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। কারো কাছে থাকতে আমার ভাল লাগে না জামেরী।

কিন্তু এখানে তোর যত্ন করবে কে? ঠিকমতো ঔষুধ খাওয়াবে কে? আমি তো সারাদিন বাসায় থাকবো না।

আমি যত্ন চাই না। ঔষধ খাবো না। আমার জন্যে কিছু করতে হবে না।

তা কি হয়। ডাক্তার বলেছে—

ডাক্তার? ডাক্তারকে আমি খুন করবো।

কথাটা বলেই কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেলো রায়হান। আমার দিকে অপলক চেয়ে রইলো। দেখলাম ওর হাত কাঁপছে। আমি ওকে বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তখন ও ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। ওকে কাঁদতে দিয়ে অবসন্নের মতো চেয়ারে বসে রইলাম। কোন কিছু করার ইচ্ছে নেই। রায়হানের ওপর এখন আমার বিরক্ত ধরছে। ওকে সুস্থ করার জন্যে অনেক ধৈর্যের প্রয়োজন। অতো ধৈর্য কি আমার আছে? তাছাড়া আমি বাসায় কতক্ষণ থাকতে পারবো? আমাকে যে সব সময় মিতুলের পাশে বসে থাকতে হবে। আমি চাই, ও চোখ খুললে প্রথম দৃষ্টি বিনিময়টি আমার সঙ্গেই হোক।

রায়হানের কান্নার ফাঁকে গোসল সেরে চা বানালাম। ওকে ডেকে চা-বিস্কিট খাইয়ে ওষুধ খাওয়ালাম। ওর জরুরী ওষুধটা আর কেনা হয়নি। ওষুধ খেয়ে রায়হান গিয়ে আবার শুয়ে পড়লো। ওকে তালা দিয়ে বেরুলাম। আমি হাসপাতালে গেলে মিন্টু আসবে। মিন্টু এসে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান বাতিল করবে। কাল রাতে ওরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাকেও জিজ্ঞেস করেছিলো। আমি জোর করে না

করতে পারিনি। আর ঐ একদিনে মিতুল সুস্থ হয়ে উঠবে বলে মনে হয়না। সুস্থ হলেও এই মুহূর্তে বিয়ে সম্ভব না। অতএব বাতিলই সই।

ধবধবে শাদা বিছানায় মিতুল শুয়ে। এখনও অচেতন। বিছানার ধারে দাঁড় করানো আছে এক কৃত্রিম শ্বাস দেবার যন্ত্র। হিসহিস শব্দ বেরুচ্ছে যন্ত্রটা থেকে। মিতুলের মুখটা কালো দেখাচ্ছে। ঠোঁটজোড়া শুকনো। ফাটা ফাটা। চোখের পাপড়িতে কোন কাঁপুনি নেই। মিতুলের হৃৎপিণ্ড এখনো ধুকধুক করে। কিন্তু আমি সে শব্দ আর শুনতে পাইনা। ধবধবে শাদা বিছানা আমার চোখের সমনে এক অনির্দিষ্ট শূন্যতায় পর্যবসিত হয়।

সেদিন মিতুলের জ্ঞান ফিরলো না। পরদিনও না। তার পরদিনও না। ডাক্তাররা চিন্তান্বিত। মিতুলের জন্যে মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। আমি কখনো মিতুলের বিছানার পাশে, কখনো রেজার টেবিলের সামনে গিয়ে বসি। কোথাও স্বস্তি পাই না। রেজা আমার সঙ্গে নানা ধরনের কথাবার্তা বলে। হাসি-ঠাট্টা করে। আমার কাছে সব কেমন কৃত্রিম এবং বানানো মনে হয়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে রেজাকে চেয়ার ছুঁড়ে মারি। আমি রেগে গেলে রেজা চুপ করে থাকে। কিছুই বলে না। ও বোঝে আমাকে। কিন্তু রেজার ঐ শান্ত্বনা দেয়ার ভঙ্গিটা আমার ভাল লাগে না।

ইদানীং রায়হান বেশ শান্ত হয়ে গেছে। একটানা সাত আটদিন ঘুমোনোর পর ঘুমটাও কমেছে। মনে হচ্ছে, রায়হান আরোগ্যের পথে। এখন আর অতোটা অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে না। বললেও খুব কম। যখন-তখন চমকে ওঠে না। ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে। ডাক্তার বলেছে, ওকে খুব কেয়ারে রাখতে হবে এবং প্রায় বছরখানেক ওষুধ খেয়ে যেতে হবে। ওষুধ ছাড়লে আবার বেশি হতে পারে। আমি ওকে তালা দিয়ে বেরিয়ে আসি। রাতে ফিরি। কথাবার্তা খুব একটা হয়ও না। তবে ওর সুস্থতায় আনন্দ পাই। ভাল লাগে। মিতুলের রোগাক্রান্ত মুখটা কিছুক্ষণের জন্যে হলেও মন থেকে মুছে যায়।

চার পাঁচ দিন পর মেডিক্যাল বোর্ডের রিপোর্ট বেরুলো। মিতুল তার জীবনের সচেতনতা হারিয়ে ফেলেছে। কৃত্রিম শ্বাস দিলে তাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। কিন্তু ভাল হবার কোন আশা নেই।

তার কোন অনুভূতি নেই, চেতনা নেই। সে এখন এক ভিন্ন জগতের বাসিন্দা।

রিপোর্টটা শোনার পর আমি সোজা বাসায় চলে আসি। মিতুলের বাবা হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে। কাঁদে অন্য আর সবাই। তার ফাঁকে আমি সরে পড়ি। আসলে এমনি হয়। যাকে কেন্দ্র করে এতো আবেগ, তার কোন বোধ নেই। বাসায় ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়ি।

কি হয়েছে জামেরী?

কথা বলিস না রায়হান।

আমার সমস্ত শরীরে আগুন। আমি এখন বিধ্বস্ত হিরোশিমা। পারমাণবিক বোমার ছাই এখন ব্ল্যাক রেইন হয়ে আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ আঁধার করে রেখেছে। আমার হৃদয়ে কেবল ব্ল্যাক রেইনের বর্ষণ। শুয়ে থাকাও অসহ্য মনে হলো। লাফ দিয়ে বিছানা থেকে উঠে গালিবকে টেনে বের করলাম। চিৎকার করে পড়তে লাগলাম আমার প্রিয় শের ঃ

"গোলাপের কলিগুলো
পাপড়ি মেলেছে
বিদায় জানাবার জন্যে;
হে বুলবুল, চলো এবার,
চলে যাচ্ছে বসন্তের দিন।"

খবরের কাগজে মিতুলের অসুখ নিয়ে খুব লেখালেখি হচ্ছে। ছবি উঠছে। আমি দিশেহারা হয়ে যাই। প্রতিদিন হাসপাতালে গিয়ে বসে থাকি। মিতুলের মুখটা দিন দিন বদলে যাচ্ছে। চেহারায় শক্ত ভাঁজ পড়েছে। চুলের গোছা লালচে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। কৃত্রিম শ্বাস দেবার যন্ত্রটি হিস্ হিস্ শব্দ তুলে গলা বেয়ে মিতুলের ফুসফুসে বাতাস পৌঁছিয়ে দিচ্ছে। 'ভেজিটেটিভ স্টেট'-এর রুগী মিতুল। কৃত্রিম শ্বাস না দেয়া হলে অন্তত পনেরো দিন আগে মারা যেতো। মৃত্যু শব্দটা আমার বুকে সঙ্গীতের মতো বাজে। না, মৃত্যু আমার শত্রু নয়, প্রিয় সখী। ওকে শত্রু করলে মিতুলকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। মৃত্যু আমার বুকেই থাক। আর মিতুল বাঁচুক, হাজার বছর বাঁচুক। পরক্ষণে মাথাটা বোঁ করে ওঠে। মিতুল আর কোনদিন সচেতনতা ফিরে পাবে না। হাসবে না। গভীর চাউনিতে আমাকে বিবশ করবে না। মিতুল এমনি করে কৃত্রিম জীবন

নিয়ে বেঁচে থাকবে। আঃ, তাই থাকুক। আমি নিজেকে শান্তনা দেই। মিতুলকে কিছুতেই মরতে দিতে পারি না।

আমি ঘন্টার পর ঘন্টা মিতুলের বিছানার পাশে বসে থাকি। একমনে ঐ যন্ত্রটা দেখি, যেটা মিতুলের বেঁচে থাকার জন্যে অপরিহার্য। দেখতে দেখতে আমার সেই স্বপ্নের কথা মনে হয়। না, সেই স্বপ্নটা আমি আর দেখি না। সেটা আমার অবচেতন থেকে পালিয়েছে। এখন চেতনে সেই স্বপ্নটা সত্যি। বড় আশা নিয়ে মিতুলের দিকে তাকাই। ও যদি একবার নড়ে ওঠে। জামী বলে গলা জড়িয়ে ধরে। যদি বলে, আমি কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জামী? তুমি আমাকে ডাকনি কেন? উঃ, এটা সত্যি হয় না কেন? মিতুলের খাটের ঠাণ্ডা রডে মাথা রাখি। মনে হয় শুধু মিতুল নয়, ঐ যন্ত্রটা হিস্ হিস্ শব্দে গলা বেয়ে আমার ফুসফুসেও বাতাস পেঁৗছিয়ে দিচ্ছে। এখন আমার শ্বাস নিতে বড় কষ্ট।

মাঝে মাঝে রেজা এসে আমাকে উঠিয়ে নিয়ে যায়। ওর রুমে বসি। ও চা আনায়। নানরকম কথা বলি। কখনো শুনি। কখনো শুনি না। রেজা ধমক দেয়।

তুই এতোটা ভেঙে পড়বি আমি ভাবতে পারিনি জামেরী।

ভালবাসার কাছে আমি ক্রীতদাস রেজা।

দেখ জামেরী, তোকে শান্তনা দেবার ভাষা আমার নেই। কিছু বলাও বৃথা। তবে—

ওসব কথা রাখ। কৃত্রিম শ্বাস দিয়ে একজন মানুষকে কতো বছর বাঁচিয়ে রাখা যায়?

সেটা বলা শক্ত। কেউ তা বলতেও পারবে না। এ ব্যবস্থা অনির্দিষ্ট-কালের জন্যে চলতে পারে।

আমি চুপ করে থাকি। বুঝতে পারি আমার চারদিকে বাতাস ভারী হয়ে এসেছে। কোথাও কোন সুবাতাস নেই। আমি যদি পারতাম পারমাণবিক মহাশূন্যযানযোগে আন্তঃগ্রহ ভ্রমণে চলে যেতে? আইনস্টাইনের মতে, "ভ্রাম্যমাণ ঘড়ি স্থিতিশীল ঘড়ির চেয়ে ধীরে চলে। ঘড়ির যন্ত্রপাতির সঙ্গে এই গতির কোন সম্পর্ক নেই। এই তত্ত্ব পরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। পারমাণবিক মহাশূন্যযানযোগে আন্তঃগ্রহ ভ্রমণের সমস্যার সমাধান হলে কেউ যদি সেই মহাশূন্যযানের ঘড়ির সময়ের

হিসেবে এক মাসের কোন সফর থেকে ফিরে আসেন, তাহলে তিনি দেখতে পাবেন, তাঁর ফেলে যাওয়া শিশুপুত্রটির বয়স পিতার চেয়ে বিশ বছর বেশি হয়ে গেছে।" আমার জীবনে এমনটি ঘটলে আমি ফিরে এসে ঠিক দেখবো, মিতুল আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। ওর ভিজে চুল থেকে টপ্ টপ্ করে পানি ঝরছে। সারামুখে ভোরের শিউলির স্নিগ্ধতা। দৃষ্টিতে যেনো রাতের শিশির।

কি ভাবছিস?

ভাবছি, পারমাণবিক মহাশূন্যযানে যদি আন্তঃগ্রহ ভ্রমণে যাই, তবে কেমন হয়?

সেই যানটি কোথায় পাচ্ছিস? না, তোকে নিয়ে পারা যাবে না। তুই কি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবি নাকি? শালা, তোর লেখক হওয়াই ভুল হয়েছে।

তাইতো ভাবছি রেজা, লেখক না হয়ে যদি পারমাণবিক মহাশূন্যযান তৈরীর চেষ্টা করতাম, তাহলে জীবনটা এতো জটিল হতো না।

জীবনের তত্ত্ব এতো সহজ নাকি জামেরী? আইনস্টাইনের মতো বিজ্ঞানীর ভালবাসাও কিন্তু ধোপে টেকেনি। তবুও তিনি তাঁর মানসিক যন্ত্রণা অতিক্রম করেছিলেন।

এসব কথা বোঝাতে আসিস না।

আমি রেগে উঠি। রেজা চুপ করে যায়। আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেটটা ঠেলে দেয়।

আর এক কাপ চা আনতে বল।

সিগারেটের টানে মাথাটা একটু হালকা হয়। বেয়ারা চা নিয়ে আসে।

মিতুলের অসুখের ব্যাপারটা কিছুতেই আমার মাথায় ঢোকে না রেজা।

মিতুলের ব্রেন ডেথ হয়েছে জামেরী। অথচ কোন অবস্থাতেই তাকে মৃত বলা যাবে না। ডাক্তারদের ধারণা, তার মস্তিষ্কের চারটি এলাকার যে কোন একটি অকেজো হয়ে গেছে। অথবা চারটিই। মস্তিষ্কের এ চারটি এলাকা আমাদের সচেতনতা, স্মৃতি, যুক্তি, স্পর্শ, কষ্ট, উত্তাপ, হিম প্রভৃতি অনুভূতি সমগ্র শরীরে প্রবাহিত করে। সবচেয়ে বড় কথা কি জামেরী, গার্ড সেল একবার নষ্ট হয়ে গেলে তা আর কখনো সুস্থ হয় না।

বিশ্বাস করি না।

আমি টেবিলে ঘুঁষি মেরে চিৎকার করে উঠি।

রেজা শান্ত গম্ভীর গলায় বলে, তুই আবেগ দিয়ে অবিশ্বাস করতে পারিস কিন্তু যুক্তি দিয়ে নয়।

উঃ রেজা, চুপ কর।

তোর জানা উচিত, বর্তমান মানুষের জানা আছে এমন কোন চিকিৎসা দিয়ে মিতুলের মস্তিষ্ক সুস্থ করা সম্ভব নয়। বিদেশে পাঠিয়েও কিছু হবে না।

শালা তুই থামবি কিনা?

রেজাকে মারতে উঠে আমি নিজেই লজ্জিত হয়ে যাই। রেজা আমার হাতটা চেপে ধরে। মৃদু হাসে। আমার চোখে পানি আসে। চোখটা মুছে ফেলি।

রেজা, আমি যদি পারতাম আমার জীবনের পরিবর্তে মিতুলকে বাঁচাতে!

তাহলে কি হতো? মিতুলও এমনি করে মরতে চাইতো। তোর কষ্টটা আমি বুঝি জামেরী, কিন্তু কিছু তো করার নেই। চল, বাগানে গিয়ে বসি।

শেষ বিকেলের আলোয় রেজা আমাকে বাগানে নিয়ে আসে। হাসপাতালের ওষুধের গন্ধ এখন আর আমাকে তেমন আকর্ষণ করে না। বমি আসতে চায়। গা ঘুলিয়ে ওঠে। বাগানেও কোন স্বস্তি নেই আমার জন্যে। মনে পড়ে, রায়হানের সেই জরুরী ওষুধটা আর কেনা হয়নি। কতোদিন হলো ওকে আর আমি ওষুধ খাওয়াই না। ও নিজে নিজেই খায়।

তোর উপন্যাসটা কি শেষ হয়েছে জামেরী?

না।

এবার সেটা শেষ করে ফেল?

লিখতে ইচ্ছে করে না।

তোর না ভারি আত্মবিশ্বাস ছিলো?

তুই তো বুঝতে পারছিস না ধাক্কাটা কতো ভয়ানক। আচ্ছা, চলি রে রেজা।

হঠাৎ করেই রেজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি। গেটের সামনে রিকশার জন্যে দাঁড়াতেই একটা পরিচিত মানুষ সামনে এলো।

মিতুলের মা। আমার শরীরটা শিরশির করে উঠলো। ভদ্রমহিলা নিজেই কথা বললেন।

আপনি এখানে?

এমনি দাঁড়িয়ে আছি। আপনি?

আমার বড় ছেলেটা অসুস্থ।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো যে, মিতুলও অসুস্থ।

জানি। আমি ওকে দেখেছি। আচ্ছা, আসি।

ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। নাকি আমার সামনে থেকে পালালেন? গলাটা একটু ভার মনে হলো। আহ, উনি যদি ওদিন মিতুলকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন? মেয়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিলেই বা কি ক্ষতি হতো? এখন গলা ভার হয়ে আসে, চোখের কোনা ভিজে যায়।

আমি নিজেকে আর কষ্ট না দিয়ে তখুনি তাকে মন থেকে তাড়ালাম। ন্যু'মার্কেটে নেমে বইয়ের দোকানে ঢুকলাম। কিন্তু কোথাও মন বসাতে পারলাম না। ঘুরে-ফিরে মনে হতে লাগলো, মিতুলের এ অবস্থার জন্যে ওর মা-ই দায়ী। দূর, আমি কি যা-তা ভাবছি। আসলে এ ধরনের সংকটের মূল আরো অনেক গভীরে নিহিত। ব্যক্তিবিশেষকে দোষারোপ করে লাভ নেই। তবে তিনি বেশ যুক্তিবাদী মহিলা, তাতে সন্দেহ নেই। মিতুলকে তাঁর জীবন থেকে অনায়াসে ছেঁটে ফেলে দিয়ে স্বর্গীয় সুখ সন্ধানে ব্যস্ত। বেশ, অপানি সুখেই থাকুন। হে কৃতী মহিলা, আপনার সুখ অক্ষয় হোক। মিতুল কোনদিন আর আপনাকে বিরক্ত করতে যাবে না। অবার আমি নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠি। কি ভূতে যে আমাকে পেয়েছে। যা আমি সচেতনভাবে তাড়াতে চাচ্ছি, সেটাই আমাকে পেয়ে বসেছে।

স্যার আপনার কি হয়েছে?

দোকানের ছেলেটি অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো।

কৈ, কিছু না।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে হাসি। এ দোকানে আমার নিয়মিত যাতায়াত। ও আমাকে ভাল করে চেনে।

আজ কিছু বই নেবেন না?

না, ভাল লাগছে না।

ও কি বুঝলো কে জানে। বললো, স্যার বাকীতে নিয়ে যান?

না রে আজ থাক। আর একদিন আসবো।

দোকান থেকে বেরিয়ে অহেতুক সারা ন্যুমার্কেট চক্কর দিলাম। আলো ঝলমল দোকানে সুবেশ নরনারীর ভীড়। সবাই কেনাকাটায় ব্যস্ত। আমি কি কিনবো? না, আমার কিছু কেনার নেই। কোন কিছুতেই আমার কোন প্রয়োজন নেই বলেই মনে হচ্ছে। অনেক শখ করে মিতুলের জন্যে বেনারসী কিনেছিলাম, কসমেটিক্স কিনেছিলাম। ধুত, আমি এসব ভাবতে চাই না। আমি এককোণায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে লোক চলাচল দেখি। দেখতে দেখতে আমার মনটা বদলে যায়। আমি নিজের মধ্যে তারুণ্যের শক্তি অনুভব করি।

ঘরে যখন ফিরলাম তখন প্রায় রাত দশটা। রায়হান আজ জেগে বসে আছে। চেহারায় আতঙ্ক। অবাক হলাম। ঘরের মেঝে সিগারেটের টুকরোয় নোংরা। আমাকে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, তুই সারাদিন কোথায় থাকিস জামেরী?

কেন? কি ব্যাপার বলতো? তোর খারাপ লাগে?

আজ কারা যেনো এসেছিলো।

কারা?

তাতো জানি না। দরজায় কড়া নাড়ছিলো। কথা বলছিলো। মনে হলো অনেক লোক এসেছিলো।

অনেক লোক কেন আসবে? সব তোর মনের ভুল।

হতে পারে না। আমি ঠিক শুনেছি।

আচ্ছা এখন ঘুমো তো। আবার এলে না হয় দেখা যাবে।

আমার ওষুধ ফুরিয়ে গেছে।

তাই নাকি আগে বলিসনি কেন?

আজই ফুরলো।

ঠিক আছে কাল নিয়ে আসবো।

তুই আমাকে এমন করে আটকে রেখে যাস যে, আমার ভয় করে।

তাহলে চল তোকে তোর বোনের বাসায় রেখে আসি?

না, আমি ওখানে যাবো না। কাল থেকে তুই আমাকে আটকে রাখিস না, কেমন? আমি ভেতর থেকে দরজা আটকে শুয়ে থাকবো। তোর

ঘর খোলা রেখে কোথাও যাবো না।

আচ্ছা।

তোর ছন্দার সঙ্গে দেখা হয় জামেরী?

নাতো।

ছন্দাকে দেখতে আমার বড্ড ইচ্ছে করে। একদিন ছন্দাদের বাসায় যাবো। তুই কি বলিস?

ছন্দা যদি তোর সামনে না আসে? যদি পুলিশে খবর দেয়?

ধুত ছাই কিছু ভাল লাগে না। যাই ঘুমোই।

রায়হান সোজা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। কথাটা হয়তো ওর মনে লেগেছে। আমার বলা উচিত হয়নি। আবার ভাবলাম ভালই হয়েছে। ছন্দা সম্পর্কে ওর মোহটা আস্তে আস্তে কেটে যাওয়া দরকার। রায়হান ভাল হয়ে উঠুক, ওর সেই ঝকঝকে জীবনযাপনে ফিরে যাক, এটাই এখন আমার একমাত্র কামনা।

একটু একটু শীত পড়া শুরু হয়েছে। সূর্য-ওঠার আগে নীল কুয়াশায় ঘাসের শরীর ডুবে থাকে। জানালায় দাঁড়িয়ে শিশির-ভরা ইউক্যালিপ-টাসের পাতা দেখি। দূরের গাছের হলুদ পাতার নিঃশব্দ ঝরে যাওয়া মনে দাগ কেটে যায়। ঘুম আসতে চায় না। কে এলো আমার খোঁজে? নাকি রায়হানের ভুল। ইদানীং ও তো বেশ সুস্থ হয়েছে। এতোটা ভুল আর করে না। ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি। সকালে উঠে হাসপাতালে যাই। মিতুলের নিমীলিত চোখের পাতায় জীবন খুঁজি। আমার জন্যে অমৃতভরা ঠোঁট জোড়া কালচে, শুকনো। কোন আবেদনে আর সাড়া দেবে না। মিতুল তুই কি পাষাণ। একবার চোখ খোল। আমি জামী রে। তোর ঐ ডাকটুকু শোনার জন্যে বুকটা ফেটে যেতে চায়। তোর যে শরীরটা আমার জন্যে ছিলো শ্যামল দেশ, তার বিবর্ণ হতশ্রী অবস্থা আমি আর সইতে পারি না। আমি এখন কোথায় যাবো তুই বল? আমার যে কোথাও যাবার জায়গা নেই?

দুপুরে রায়হানের জন্যে একগাদা ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরি। হঠাৎ করে আজ ওর জরুরী ওষুধটা পেয়ে যাই। মনটা খুশী হয়ে ওঠে। এই ওষুধটা আগে পেলে ওর আরো উপকার হতো। সন্ধ্যায় ওকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। গত তারিখে যাওয়া হয়নি। নিজেকে

বকলাম। ওর প্রতি আমি অমনোযোগী হয়ে গেছি। খুব অন্যায় করছি। অথচ সামান্য অবহেলার কারণে বড় কিছু হয়ে যেতে পারে। মিতুলের প্রতি আমি সেই অবহেলাটা করেছি। বুকটা কালো বেদনার বিড়াল হানা হয়ে গেলো। এখন অবোধ মিঁউ মিঁউ ডাক ছাড়া আর কিছু করার নেই।

ঘরে ঢুকতেই রায়হান আমার হাত চেপে ধরে।

জামেরী আজ আবার ওরা এসেছিলো। আমার নাম ধরে ডেকেছিলো। আমি একটুও ভুল শুনিনি। ওরা বলছিলো, রায়হান সাহেব এখানে থাকেন নাকি ?

তুই কি বললি ?

আমি কিছু বলিনি। চুপ করে ছিলাম।

ঠিক আছে। দেখি কি হয়। দরকার থাকলে ওরা আবার নিশ্চয় আসবে।

দরজাটা বন্ধ করে দে।

না, খোলাই থাক।

রায়হানের হাতে ওষুধগুলো দিলাম। ও খাটে বসে প্যাকেট খুলতে লাগলো। আমি স্টোভ জ্বালিয়ে ভাত বসালাম। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। বাথরুমে ঢুকতে যাবো ঠিক তখুনি খাকী পোশাক-পরা লোকগুলো এলো। সদম্ভে ঘরে ঢুকে দাঁড়ালো। আমার বুকে শিরশিরে কাঁপুনী। রায়হান বাথরুমের দিকে ছুটে যেতে চাইলে ওরা পথ আটকালো। ভয়ে, আতঙ্কে রায়হানের মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুচ্ছে না। চোখে অস্বাভাবিক দীপ্তি। একজন রায়হানের হাতটা মুচড়ে ধরেছে। আমি সামনে এগিয়ে এলাম।

আপনি একজন খুনের আসামীকে দিনের পর দিন আপনার ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন ?

ও অসুস্থ। সিজোফ্রেনিয়ার রুগী।

সব ভান।

এই দেখুন ওষুধ, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন।

ঐ সব আমরা বুঝি। আপনি একজন লেখক ?

হ্যাঁ।

আমরা এইরকম রিপোর্টই পেয়েছি।

রিপোর্ট ?

হ্যাঁ, খুনী আপনার সঙ্গেই থাকে। খুনীর সঙ্গে আপনাকে দেখা গেছে। আপনি ওকে প্রতিদিন তালা বন্ধ করে বেরিয়ে যান।

বিদ্যুৎ ঝলকের মতো আমার সাইকির মুখটা মনে পড়লো। একদিন রাস্তায় দেখা হয়েছিলো। হঠাৎ করে আমি মনের জোর ফিরে পেলাম।

ওর বিচার ও নিজেই করেছে। ও এখন পাগল।

সেটাই বড় কথা নয়। দেশের আইন আছে। খুনীর বিচার দেশের আইন করবে। আপনি তাকে লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন ?

লুকিয়ে রাখিনি। ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলাম।

ওকে থানায় দেননি কেন ? আপনি তো সব ঘটনা জানেন।

একজন অসুস্থ লোককে কি করে থানায় দিয়ে আসবো ?

আইনের যুক্তিতে একথা টিকবে না। কাজটা আপনি ভাল করেননি।

আমি তো কোন অন্যায় করিনি ?

নিজে নিজে যুক্তি খাড়া করলে ওরকম অনেক কিছুই ন্যায় মনে হয়। আচ্ছা চলি।

ওরা রায়হানকে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো। ও চিৎকার করলো, জামেরী আমি যাবো না। আমি যাবো না। আমি তোর কাছে থাকবো।

আমি সমস্ত পারিপার্শ্বিক ভুলে গেলাম। খাটের ওপর ধপ্ করে বসে পড়লাম। রায়হানের জরুরী ওষুধটা পড়ে রইলো হাতের কাছে। সাইকি রিপোর্ট করেছে। আমার সম্পর্কে ওর কাছে অনেক গল্প করতো রায়হান। মনে পড়ছে রায়হান ওর কাছে আমাকে লেখক বলেই পরিচয় করিয়ে ছিলো। সাইকি তোমার অবিশ্বাসী ঘৃণায় আমার স্বচ্ছন্দ অবগাহন। আমি কিছুতেই ডুবে যাবো না সাইকি। সাইকির বড় বড় চোখের পাতায় ছবির মতো লেখা, "হে বুলবুল, চলো এবার, চলে যাচ্ছে বসন্তের দিন।"

বড় বড় গোঁফঅলা লোকটা চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছিলো। মাটিতে পা ঠুকছিলো। হিংস্র বাঘের মতো আমার কলজেটা টেনে বের করবার জন্যে উসখুস করছিলো। তেমন একটা দৃষ্টি আমি সবসময় অনুভব করেছি। কাজটা আমি ভাল করিনি। বুকটা দপ্ করে জ্বলে উঠলো।

আমি মনে করি আমার ভাল-মন্দ বোধ অন্য দশজনের চাইতে আলাদা। উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। যা ভাল বুঝেছি, তা করেছি। কারো কাছে জবাবদিহি করতে পারবো না। উঃ বলে কিনা নিজে নিজে যুক্তি খাড়া করলে? রায়হানের মতো হাতটা আমার নিসপিসিয়ে উঠলো। পরক্ষণে মনটা ফাঁকা হয়ে গেলো। রায়হান শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমার কাছে থাকতে চেয়েছিলো। আমি রাখতে পারিনি। রায়হানকে ধরে রাখার ক্ষমতা আমার ছিলো না। মিতুল? মিতুলও তো আমার কাছেই থাকতে চেয়েছিলো। কৈ রাখতেতো পারলাম না। কাউকে ধরে রাখার আমার কোন ক্ষমতা নেই। দু'হাতে মাথাটা চেপে ধরলাম। কপালের শিরা দপ্‌দপ করছে। মনে হচ্ছে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বিরাণ জনপদ। খাঁ খাঁ জনমানবহীন আমি একা একা পথ হাতড়ে চলি।

জানালার পাশে দোয়েলটা কিচমিচিয়ে ওঠে। চমৎকার ভঙ্গিতে নাচানাচি করে। ইউক্যালিপটাসের পাতার ফাঁকে গনগনে দুপুর। গ্যালিলিও আকাশ আমার আলোর উৎস। ছায়াপথ দিগদর্শনের মতো কাজ করে। তবু মাঝে মাঝে দিকভ্রান্ত হই। স্টোভের ওপর টগবগিয়ে ভাত ফুটছে। ভাত ফোটা দেখি আর দোয়েলের গান শুনি। ইউক্যালিপটাসের হলুদ পাতার ঝরা দেখি। দেখতে দেখতে নিজস্ব শক্তিতে ফিরে আসি। বিশ্বাস মৌলিক শর্ত হয়ে কাজ করে।

অনেকদিন উপন্যাসটা লেখা হয়নি। কতোদিন? জানি না। দিন-ক্ষণের হিসেব ভুলে যাই। তবে উপন্যাসের শেষ অধ্যায় লেখার সময় হয়েছে। রায়হান নেই, মিতুল নেই। আমি একটা নিদিষ্ট বিন্দুতে এসে পৌঁছেছি। আর কি। এবার আমার ঝটপট লিখে ফেলার পালা। নইলে মেঘে মেঘে দিন ফুরিয়ে যাবে।

ডিম ভেজে গরম ভাত খেলাম। খাকী পোশাক-পরা লোকগুলো এখন আর আমার মাথায় নেই। লিখতে বসে নিজের বিশ্বাসটা ফিরে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, আমার ভেতরে অফুরন্ত শক্তি। প্রচণ্ড গতিতে কাজ করতে পারবো। একটানা কুড়ি পৃষ্ঠা লিখলাম। অবিশ্বাস্য মনে হলো। কোনদিন এক সঙ্গে আমি কুড়ি পৃষ্ঠা লিখতে পারিনি। সন্ধ্যার দিকে যখন লেখা থামালাম, টের পেলাম মেরুদণ্ড টনটন করছে। হাতের আঙুল বাঁকা হয়ে আসছে। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললাম। চুমুক দেবার আগে শুনলাম

দরজায় টুকটুক শব্দ। খুব আস্তে। কেউ যেনো দীনভঙ্গিতে আমার দরজায় আবেদন জানাচ্ছে।

দরজা খুলতেই দেখলাম, মিতুলের বাবা। ভদ্রলোক বেশ বুড়িয়ে গেছেন। মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। আমার দিকে তাকিয়ে জোর করে হাসলেন।

কেমন আছো বাবা?

ভাল। বসুন।

মিতুলের বাবা টেবিলের ধারে চেয়ারে বসলেন। আমি চা দিলাম। তিনি যেনো অন্য কিছু ভাবছেন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। চায়ের পেয়ালা সামনে দিতে আপত্তি করলেন।

না থাক, চা খাবো না।

অল্প একটু?

না, ডাক্তার বারণ করেছে। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

আপনি হয়তো বেশি চিন্তা করছেন?

তিনি আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

আমার জীবনের একটা অধ্যায় যেনো শেষ হয়ে গেলো জামেরী।

আমি চমকে উঠলাম। এ দিকটা কখনো ভাবিনি। মিতুল তার ফেলে আসা অতীতের একটা যোগসূত্র ছিলো।

মেয়েটাকে আমি কখনো বুঝতে পারিনি জামেরী। ও ঠিক ওর মা-র মতোই ছিলো।

একটু থেমে আবার বললেন, তুমি কিছু মনে কোর না বাবা। তুমি লেখক তো, এজন্যে এসব কথা বলছি।

আলী আহমদ সাহেব আমাদের সম্পর্কের কথা ভুলে গেছেন। মিতুল সুস্থ থাকলে তিনি কোনদিন এসব কথা আমার সামনে বলতেন না। সম্পর্কের একটা নিরাপদ দূরত্ব বাঁচিয়ে চলতেন। মিতুলের অসুস্থতা তাকে আমার অনেক কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এখন আমি তার বন্ধুর মতো।

আমি ভেবেছিলাম, ওর মায়ের স্বভাব থেকে আমি ওকে আড়াল করে রাখতে পারবো। কিন্তু পারিনি। আমি বুঝতাম ওর জ্বালা কোথায়। কিন্তু আমার কিছু করার ছিলো না। যার রক্তে আগুন, তাকে আমি কেমন

করে বাঁচাবো বলো?

আমি ক্রমাগত বিস্ময়ের অতলে ডুবে যাচ্ছি। মিতুলের বাবা ওকে এমন গভীরভাবে বুঝতো, এটা আমরা দু'জনের কেউই কোনদিন টের পাইনি। কোন আচরণেই তিনি তা প্রকাশ করতেন না। অথবা করতেন। কিন্তু যথাযথ পথে প্রকাশের আবেদন ছিলো না। ফলে ভুল ব্যাখ্যা হতো। মিতুল যেটাকে মায়ের ভালবাসা বলতো। তার হঠাৎ করে বুড়িয়ে যাওয়া গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি গজিয়েছে। দৃষ্টি ঘোলাটে। ব্যথিত। আমি কোন কথাই বলছিলাম না। আমার ইচ্ছে উনি আজ প্রাণ খুলে কথা বলুন। আমি শুনি। উঠে বাতি জ্বালালাম। উনি আপত্তি করলেন।

বাতিটা বন্ধই থাক না জামেরী। এই আঁধারটা বেশ লাগছে। আবার বাতি বন্ধ করলাম। দু'জনে ঘরে চুপচাপ।

মিতুলের মা-রও একটা সূক্ষ্ম মন ছিলো জামেরী। যেটা কোনদিন ধরতে পারিনি। মিতুলের মা আমাকে কোনদিন সহ্য করতে পারে নি জামেরী। সব সময় মনে করতো আমি তার উপযুক্ত নই। আমার ভেতর নাকি কোন শিল্পী মন নেই। বাস্তবটা বড় বেশি বুঝি। আর এসব ছোটখাটো কথায় প্রায় ঝগড়া হতো। তারপর সে নিজের পথ নিজেই বেছে নিলো। চলে গেলো আর একজনের সঙ্গে। তাই ওর চলে যাওয়াটা আমার প্রাণে তেমন লাগে নি। মনে হয়েছিলো, ভালই হয়েছে। নিরুত্তাপ জীবনের চাইতে এই ভাল। কিন্তু তাতে কি মুক্তি পেয়েছি? ভুলতে পারলাম কৈ? মিতুলের মতো যদি আমারও সেরেব্রাল করটেক্স অকেজো হয়ে যেতো? চমৎকার হতো। স্মৃতি। প্রতারক স্মৃতি আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাঁশী বাজাতো না। জানো জামেরী একটা চিনচিনে অপমানের যন্ত্রণাই বয়ে বেড়ালাম সারাটা জীবন। এখন মনে হয় গ্রহণের ক্ষমতা যদি তীক্ষ্ণ না হয় তাহলে কারো ভালবাসাই অকেজো থ্যালমাসের মতো কোন অনুভূতি সারা জীবনে রিলে করে পাঠায় না।

একটানা কথা বলে আলী আহমদ সাহেব চুপ করলেন। ইউক্যালিপটাসের মাথার ফাঁকে ঝুপঝুপিয়ে আঁধার নামছে। প্রগাঢ় হচ্ছে রাত্রির দীর্ঘশ্বাস। আলী আহমদ সাহেবকে বলার মতো কোন কথাই আমার নেই। আমি শুধু শুনতে জানি।

আচ্ছা জামেরী, মেয়েটা এভাবে কতোকাল থাকবে?

কেন, যতোদিন রাখা যায়।

না, না তা কি করে হয়। আমি সহ্য করতে পারছি না। এ কৃত্রিম জীবন আমার কাছে অসহ্য।

কি বলছেন আপনি?

এভাবে বাঁচিয়ে রেখে কি লাভ? এভাবে বাঁচিয়ে রাখা তো ধর্মবিরোধীও। আমি কি করবো বুঝতে পারছি না।

আমার সমস্ত শরীর শিরশির করে উঠলো। কি বলছে ভদ্রলোক? আমি একদৃষ্টে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না যে, কথাগুলো মিতুলের স্নেহময় পিতার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। শ্বাস প্রত্যাহার মানেই তো মৃত্যু। অসম্ভব। এভাবে যতোদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় ততোদিনই বাঁচবে মিতুল। ধর্মের নামে কোন বিরুদ্ধ শক্তির কাছে নতি স্বীকার করা যাবে না।

তুমি তো জানো জামেরী মিতুলের জীবন ফিরে পাবার আর কোন আশা নেই।

তবু শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের দেখতে হবে।

আমার দৃঢ় কণ্ঠে আলী আহমদ সাহেব কিছু বললো না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে, নিঃশব্দে উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলে গেলো। আমার মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। আমি কোনকিছুই ভাবছি না। মনে হচ্ছে পায়ে শিকল বাধা আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে পর্বতের সুউচ্চ চুড়োয়। আমার বুকে অনন্তকালের গোঙানী।

পরদিন কাগজে রায়হানের ছবি বেরুলো। বড় বড় করে খবর ছাপা হলো। এতোদিন পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারেনি। জনৈক লেখক বন্ধুর সহযোগিতায় সে আত্মগোপন করেছিলো। খবরটা পড়ে আমার সমস্ত অনুভূতি হিম হয়ে গেলো। বুঝতে পারলাম ভীষণ ষড়যন্ত্রের জাল আমার দিকে ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে। সুযোগ পেলেই টেনে তুলবে। যাকগে সেটার আমি পরোয়া করি না। রায়হান এবং মিতুল দু'জনেই খবর হয়েছে। খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় ওদের কথা লোকে আগ্রহের সঙ্গে পড়ে। তিন চারদিনের মধ্যে মামলা শুরু হবে। রায়হানের ওষুধগুলো ওর কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে আমার। ডাক্তার বলেছে, ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে। অন্তত এই একটি জায়গায়

আমি হেরে যেতে রাজী নই। রায়হানকে সুস্থ করবোই।

মাঝে মাঝে শরাফী আসে। খুব সাবধানে মিতুলের কথা বলে। পাছে আমি আঘাত পাই। মিন্টু একদিন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো, এই খুনী লোকটাকে আপনি জায়গা দিয়েছিলেন জামেরী ভাই? আমি ওর কথার উত্তর দেইনি। ও ছেলেমানুষ। ওকে কোনকিছু বোঝানোর আমার দরকার নেই। ওকে অন্য কথা বলি। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল ভাবি, মিতুল বেঁচে আছে। কিন্তু অর্থপূর্ণ জীবন ফিরে পাবার আশ্বাস নেই। কখনো গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হই। তখন দুশ্চিন্তা নিরাশা হতাশা আমাকে স্পর্শ করতে পারে না। আমি ঝরঝরে বোধ করি। প্রচণ্ড কাজ করার তাগাদা অনুভব করি। অফিসের টেবিলে সারারাত কাটিয়ে দেই। একটুও ক্লান্তি ঘায়েল করে না। উপন্যাসটা প্রায় শেষ করেছি। আর কয়েক পৃষ্ঠা লিখলেই হয়। প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। ছাপার কাজ শুরু হয়েছে। অন্য আর একটি উপন্যাসের ছক মাথার মধ্যে ঘুরছে। কিছু কিছু নোট করেছি। এটা শেষ হলে ওটা ধরবো। হাসপাতালের বিছানায় মিতুল ক্রমাগত শীর্ণ হচ্ছে। মুখের লাবণ্য নিঃশেষ। মরা চামড়া উঠছে। আমি এখনো হাসপাতাল গিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা মিতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি। দেখতে ভাল লাগে। এতো আমার অন্য মিতুল। প্রকৃতির মতো বদলে যাচ্ছে। মিতুলের জীবনে ঋতু বদলের খেলা জমেছে। ও আবার বসন্ত হবে। হ্যাঁ নিশ্চয় হবে। আমি নিজেকে মিথ্যে শান্তনা শোনাতে শোনাতে বিহ্বল হই। চোখের কোণা চিক্‌চিকিয়ে ওঠে।

তখন রেজা এসে ঘাড়ে হাত রাখে।

চল।

আমিও বিনা প্রতিবাদে ওকে অনুসরণ করি। ওর টেবিলের সামনে বসে থাকি। কোন কথা খুঁজে পাই না। চায়ের স্বাদ তেতো লাগে। সিগারেট বিস্বাদ। ধোঁয়া যেনো দম আটকানো। রেজা গালাগাল করে।

শালা তুই একটা হারামী। তোকে কিছু বোঝানোর সাধ্য কি আমার আছে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে তোকে ধরে ট্রেনের তলে ফেলে দেই। মরে ভূত হয়ে যা শালা।

আমি হাসি। রেজা আরো ক্ষেপে যায়। কতো অজস্র কথা বলে।

আমি শুনি না। রেজা আমাকে ওয়ার্ডে নিয়ে যাবার জন্যে টানাটানি করে। আমি যাই না। মনে হয় এখন আমাকে জীবনের ভিন্ন অর্থ খুঁজতে হবে। যে পথে আমি এতোকাল চলে এসেছি সে পথের সামনে এখন বিরাট দেয়াল। ডিঙোবার কোন উপায় নেই। এখন আমার বাঁক বদলের পালা। এতোকাল বড় সহজ রাস্তায় এসেছি। সে রাস্তার ধারে মৌসুমী ফুলের বাগান ছিলো। এখন নামতে হবে পাথুরে পথে। সেখানে কোন বাগান নেই। ঝর্ণা নেই। সবুজ ঘাস নেই।

রেজা হঠাৎ করে বলে, জানিস জামেরী, ডঃ জাকের মাঝে মাঝে মেশিনের সাহায্য ছাড়া মিতুলকে শ্বাস নিতে অভ্যস্ত করাবার চেষ্টা করেন। তার ফলে মিতুল কখনো স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সক্ষম হয়েছে।

তার মানে মিতুল ভাল হবে?

অতো উত্তেজিত হোস না। বোস। এটা একটা পরীক্ষা। ভাল হবে কিনা, তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

তাহলে আর কি।

আমি আবার অন্ধকারে ফিরে আসি। মাথাটা ঝিমঝিম করে। রাগ হয়। অকারণ রাগ। রেজাকে কিছু না বলে চলে আসি। তখন সমস্ত শহরটা সমুদ্র হয়ে যায়। আমি একটা সবুজ দ্বীপ খুঁজে ফিরি। শরাফীর মেয়ের কথা মনে হয়। ন্যু'মার্কেটে নেমে একগাদা ফল কিনি। সোজা শরাফীর বাসায় চলে আসি। মেয়েটাকে কাছে ডেকে পাগলের মতো আদর করি। ও অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকায়, কাকু তোমার কি হয়েছে?

জানিনা তো কি হয়েছে?

আমি ওকে বুকে চেপে রাখি। কিছুক্ষণ পর ও ছটফটিয়ে ওঠে।

জানো কাকু, আমার মুরগীটা আজ একটা ডিম পেড়েছে। সেটা আমি তোমাকে দেবো। মা না, আজ আমার লাল মোরগটা জবাই করেছে। কালু যখন ওটাকে ধরার জন্যে দৌড়াদৌড়ি করছিলো, আমি কতো বললাম, পালাও, পালাও। মোরগটা পালাতে পারলো না। কালু ধরে ফেললো। আজ আমি মায়ের সঙ্গে আড়ি নিয়েছি।

বেশ করেছো।

আমি এক টুকরো মাংসও খাইনি। মা অনেক সেধেছিলো।

ভাল করেছো। মায়েরা সব সময় ভীষণ দুষ্টু হয়।

তুমি আমার মা হলে কতোই না মজা হতো। তুমি আমার সব কথা শুনতে, না কাকু?

হ্যাঁ। একদম তোমার কথামতো চলতাম।

জানো কাকু, আব্বু না আমাকে খুব আদর করে। আমি যেটা বলি, সেটা শোনে।

তুমি এই ফলগুলো খাও দেখি মামণি।

আমি ওকে কমলার খোসা ছাড়িয়ে দেই। ও খেতে খেতে অজস্র কথা বলে। শরাফী এক ফাঁকে বলে, রামীন বুঝতে পেরেছে যে, আজ তোর মনে ঝড়। নইলে ঐ মেয়ে তো কোনদিন এতো কথা বলে না।

সব শিশুরাই বড়দের জন্যে শান্তনার ঠাঁই।

শরাফীর বৌ চা নিয়ে আসে।

কোথায় গিয়েছিলেন?

হাসপাতাল থেকে ন্যু'মার্কেট। তারপর এখানে।

প্রায়ই তো এই একটা কথাই শুনি। আর কি কোথাও যাবার জায়গা নেই?

আপাতত নেই।

চলুন, আমরা সবাই মিলে কক্সবাজার থেকে ঘুরে আসি। সময়টা ভাল। যাবেন?

আপনারা যান।

আচ্ছা জামেরী, তুই কি এমন পাগল হয়েই থাকবি?

তুই কি চাস আমি এখান থেকে চলে যাই?

আমি রাগ হয়ে বলি।

না বাপু, বোস।

তোরা বরং তোদের কাজ কর গিয়ে। আমি রামীনের সঙ্গে একটু কথা বলি।

শরাফী আর ওর বৌ দু'জনেই চুপ করে যায়। আমি চায়ে চুমুক দেই। রামীন এক কোঁয়া কমলা মুখে পুরে বলে, কাকু, এবার থেকে তুমি আমাদের বাসায় থাকো। আমি রোজ তোমার দাঁত ব্রাশ করে দেবো, জুতো মুছে দেবো। তোমার কান থেকে ব্যাঙ বের করে দেবো।

ব্যাঙ?

হ্যাঁ। জানো না? মা আমার কান থেকে রোজ ব্যাঙ বের করে আনে। আমার একটা ছোট্ট কাঠি আছে, ওটা দিয়ে তোমার কান থেকেও ব্যাঙ বের করে আনবো।

আমরা তিনজনে হেসে উঠি। ও একটু বিব্রত হয়। তারপর লজ্জা পায়।

যাঃ হাসছো কেন? তুমি একটুও ভাল না কাকু!

না, ঠিক আছে, আর হাসবো না। এই দেখো, গম্ভীর হয়ে গেলাম।

আচ্ছা, কাকু, মুরগী ডিম পাড়ে কেন?

শরাফী আর ওর বৌ হেসে ফেলে।

কি জানো না বুঝি?

না তো মামণি!

আমি জানি শোন? আমরা ছোটরা ডিম খেতে ভালবাসি তো। আর মুরগীও ছোটদের ভালবাসে। তাই রোজ রোজ ডিম পাড়ে।

ঠিক বলেছো। আচ্ছা রামীন, তুমি আর কি জানো?

অনেক কিছু। তোমাকে সব শেখাবো। তুমি আমাদের বাসায় থাকবে তো?

হ্যাঁ, থাকবো।

ঠিক আছে, কাল থেকে তোমাকে শেখাবো। যাই খেলি গে।

রামীন লাফাতে লাফাতে চলে গেলো। আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠলাম। শরাফী এক সেমিনারে যাওয়ার জন্যে বললো। ভাল লাগলো না। ওর বৌ কি যেনো রসিকতা করলো, তাও শুনলাম না। হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরলাম। অতোটা পথ আমি একটানা অনেকদিন হাঁটিনি। ঘরে ফিরে ধুলোমাখা জুতোসুদ্ধ বিছানায় শুয়ে পড়লাম। রোদে ধরেছে। মাথার শিরা দপ্ দপ্ করছে। ড্রয়ার ঘেঁটে একটা নোভালজিন পেলাম। সেটা খেয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম। সন্ধ্যায় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভাঙলো।

মিন্টু হাসলো।

ঘুমোচ্ছিলেন জামেরী ভাই? আমি আরো একবার এসে ঘুরে গিয়েছি। তখন আপনি ছিলেন না। একটু পর বাসায় একটা মিলাদ হবে।

আপনি আসবেন?

আচ্ছা।

মিন্টু চলে গেলো। মাথাটা এখন একটু হালকা লাগছে। চোখের জ্বালা কমেছে। হেঁটে না এলেই পারতাম। কেন যে ইচ্ছে করে নিজের ওপর এ ধরনের অত্যাচার করি বুঝি না। তখন এক ধরনের একরোখা জেদ চাপে। ফলাফল ভাবতে ইচ্ছে করে না। একটু পরে প্রকাশকের কাছ থেকে লোক এসে একগাদা প্রুফ দিয়ে গেলো। বইটা দ্রুত ছাপা হচ্ছে। শেষ অধ্যায়টা এখনো লিখতে পারলাম না। চা খেয়ে প্রুফ নিয়ে বসলাম।

নীচ থেকে অনেক লোকের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছি। আলী আহমদ সাহেবের সেদিনের কথার পর থেকে মনটা আমার বিরূপ হয়ে আছে। তাই যাবো না বলেই ঠিক করলাম। মিতুল মরে গেছে আর ওরা শোক করছে, সারা বাড়িতে এমন একটা ভাব। ওখানে গেলে আমার দম আটকে আসতে চায়। মাঝে মাঝে ভাবি, আলী আহমদ সাহেবকে বাড়ি ছেড়ে দিতে বলি। সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্যে এই পরিবেশটা আমার কাছে দূষিত হয়ে উঠেছে। আমি যেনো এক বিপন্ন বসতির ঘেরাটোপ বাসিন্দা। প্রুফ দেখা শেষ করেছি, তখন দরজায় আবার শব্দ।

জামেরী ভাই, বাবা আপনাকে ডাকছেন।

অগত্যা মিন্টুর পিছু পিছু নামতে হলো। না করার উপায় নেই।

মিলাদে এলে না যে বাবা?

একটা জরুরী কাজ ছিলো।

মিতুলের জন্যে মিলাদ পড়ালাম।

আমি কিছু বললাম না। মনে মনে ভাবলাম, মিতুলের জন্যে আমার নিজস্ব প্রার্থনার ভাষা আছে। ওটা লোক দেখানোর কোন ব্যাপার নয়। লোক জড়ো করে আনুষ্ঠানিকতায় সে প্রার্থণা জোরালো হয় না। আলী আহমদ সাহেব একটুক্ষণ আমার মুখটা জরিপ করলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ঝর্ণা আমার জন্যে এক প্লেট মিষ্টি নিয়ে এলো।

সব খেতে হবে কিন্তু?

এতো মিষ্টি—

এতো কৈ? কয়েকটা মাত্র।

এতো মিষ্টি খেলে রাতে আমার ঘুম হবে না।

যাঃ, কি যে বলেন।

খাও বাবা, খাও। শরীরটা একদম অর্ধেক হয়ে গেছে তোমার। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে একটু নজর দিও। অসুখবিসুখ হলে দেখবার তো কেউ নেই।

আলী আহমদ সাহেব কথাগুলো কেন বললেন বুঝতে পারলাম না। স্নেহ না ভান, চতুর কণ্ঠস্বরে তা ধরা পড়ে না। মিতুলের অবর্তমানে এ পরিবারে আমার কোন জোরালো অধিকার নেই, এ সত্য আমি মর্মে মর্মে অনুভব করি। তখন আমার এখান থেকে ছুটে বেরিয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। দু-একটা জিলাপী খেয়ে উঠে পড়ি।

সে কি বাবা, উঠলে যে, আর একটু বোস না?

জামেরী ভাইয়া এলেই কেবল যাই যাই করেন।

আলী আহমদ সাহেবের কথায় নয়, ঝর্ণার অনুযোগে আমাকে বসতে হলো। আমি এ বাড়ির মালিক। ওরা আমার ভাড়াটিয়া। এর বাইরে ওদের সঙ্গে আমার আর কোন গভীর সম্পর্ক নেই। আলী আহমদ সাহেব আমার কাছে সরে এসে বসলেন।

মিতুলের ব্যাপারটা নিয়ে আর কি কিছু ভেবেছো বাবা?

না ভাবার কি আছে!

আর কতোকাল ও এমন করে বাঁচবে? আমি কিছু ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারছি না।

আমার কণ্ঠ রূঢ় হলো।

আপনি কি এখনই ক্লান্ত হয়ে গেছেন?

ক্লান্তির ব্যাপার নয় বাবা, ধর্মেরও একটা প্রশ্ন আছে। আজকে সে রকম আলোচনাই হলো।

আপনি নিজের মনকে শক্ত করুন। এ ধরনের কোন কিছু প্রশ্রয় দেয়া ঠিক নয়। এখন শ্বাস প্রত্যাহার মানে মিতুলের মৃত্যু। সে মৃত্যুর জন্যে আমরা সবাই দায়ী হবো। আমরা হবো খুনী।

তুমি একটা আস্ত নাস্তিক।

আলী আহমদ সাহেব রেগে গেলেন।

ঠিক আছে, চলি।

. . .

আমি গটগট করে বেরিয়ে আসি। মিতুলের মা-র কণ্ঠস্বরে বারান্দায় একটুক্ষণ থমকে দাঁড়াই। ভদ্রমহিলা জোরে জোরে বলছেন, মিতুলের ব্যাপার নিয়ে ওর সঙ্গে আলোচনা করার কি আছে। ও মিতুলের কে?

মাথাটা আমার বোঁ করে ওঠে। কোনমতে পা টেনে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসি। আমার জীবনে মিতুলের কোন সামাজিক স্বীকৃতি নেই। মিতুল আমার বৌ নয়। চক্রাকারে কথাগুলো মাথার মধ্যে ঘুরছে। বাতি বন্ধ করে দেই। এখন অন্ধকারই ভাল। চিৎকার করে উঠলাম, মানি না সমাজ। মিতুলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক জন্ম-জন্মান্তরের। হ্যাঁ, মিতুল আমার বৌ। একশোবার আমার বৌ। আমি পাগলের মতো জানালার শিকে মাথা ঠুকি।

রাতে আমার ভাল ঘুম হলো না। আজেবাজে স্বপ্ন দেখলাম। মাথাটা ভার হয়ে রইলো। ভোরবেলা জানালার ফাঁকে রোদ ওঠা দেখলাম। অনেকদিন অন্ধকার-ভোরে মিতুল আমার দরজায় কড়া নেড়ে ঘুম ভাঙিয়ে খুনসুটি করেছে। রাগ করেছে। কখনো আমার আশ্রয় থেকে বেরিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। এখন মিতুলের সমস্ত শরীরে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিলে একবারও চোখ তুলে চাইবে না। বলবে না, উঃ জামী তোমার সঙ্গে আর পারি না। তুমি একটা ইয়ে।

মনে পড়লো আজ দশটায় রায়হানের সঙ্গে দেখা করতে হবে। অনেক চেষ্টা করে একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়েছি। রায়হানের ওষুধগুলো পৌঁছাতে পারবো না। কড়া নিষেধ। এটা আমার জানা ছিলো না। ওর বিচার এখনো শুরু হয়নি। কেন দেরী হচ্ছে জানি না। বালিশের নীচ থেকে ঘড়ি বের করে সময় দেখলাম। দশটার এখনো তিনঘণ্টা বাকী। এই দীর্ঘ সময় আমার কিছু করার নেই দেখে খারাপ লাগলো। ইউক্যালিপটাসের ডালে দোয়েলটা এলে হয়তো ভাল লাগতো। নীচে কোলাহল, গাড়ির হর্ণ শুনতে পাচ্ছি। ছকবাঁধা জীবনের শুরু। আপাতদৃষ্টিতে কোথাও কোন ত্রুটি নেই। অথচ এর মাঝে কেউ কেউ পিছিয়ে পড়েছে। কারো চলা থেমে গেছে। আমরা আর কতোজনের খোঁজইবা রাখি? আমি জামেরী জীবনের সবধরনের গতিবেগ বুকের মধ্যে পুষে রেখেও কেমন অথর্ব হয়ে গেছি। চলাটা মাঝে মাঝে বিরক্তিকর মনে হয়। বুঝি এটা হওয়া উচিত নয়। কিন্তু অবসাদ যখন রাস্তার পীচের মতো আঁকড়ে

ধরে, কিছুতেই নিস্তার পাই না। ছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে কোথাও, কোন শান্তির আশ্রয়ে যা আমার জন্যে স্বস্তির শাদা আলো জ্বেলে রাখবে। সবকিছুর মধ্যে একটা আনন্দ বইটা দ্রুত ছাপা হচ্ছে। একটু পর প্রকাশকের লোক আসবে প্রুফগুলো নিয়ে যেতে। নিজেকে ধমকালাম। জামেরী তোমার হয়েছে কি? বয়সের তারুণ্য উপেক্ষা করে তোমাকে কেন বুড়োমিতে পেয়েছে? ভাল নয় জামেরী। বুকটান করে সোজা হয়ে দাঁড়াও দেখি? জীবনের সবটাই ব্যর্থতা আর হতাশা নয়। সেখানে শাদা ছোট জুঁই ফুলও আছে। স্নিগ্ধ গন্ধ বেঁচে থাকাকে মোহিত করে। তুমি সব বোঝ জামেরী, তবু মাঝে মাঝে পিছিয়ে পড়ো। এই পিছিয়ে পড়াটা তোমাকে অতিক্রম করতে হবে।

নিজেকে শাসন করে কিছুটা চাঙা হলাম। হাতমুখ ধুয়ে যখন রাস্তায় বেরুলাম তখন বেশ সজীব মনে হলো। মনে হলো আমি যেন এই জনস্রোতেরই অংশ। আমার হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি অগণিত পায়ের শব্দে সঙ্গীতের মতোই বাজে এবং সেই বাজাকে বেঁচে থাকা বলে। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে মিতুলের জন্যে গাদা গাদা জিনিস কিনি। একদিন একটা লাল কিউটেক্স কিনেছিলাম। ভাল হয়ে ও অবাক হয়ে যাবে। জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে ভাল লাগে। বেনারসীটার একটা ভাঁজও ভাঙিনি। ভাবতে ভাবতে যখন জেল-গেটে এলাম তখনো দশটা বাজার দশ মিনিট বাকী। রাজ্যের হাঙ্গামা শেষ করে রায়হানের জন্যে অপেক্ষা করতে আমার খারাপ লাগেনি। ও যখন এলো অবাক হলাম। খোঁচা খোঁচা দাড়ির মাঝে চোখজোড়া আশ্চর্য জ্বলজ্বল করছে। ঠিক সেই আগের রায়হানের মতো। লাবণ্যের বদলে পৌরুষত্ব। আকস্মিক ঘা খেয়ে রায়হান দ্রুত সুস্থ হয়ে গেছে। ভেবেছিলাম ভেঙে পড়বে। ওকে বুঝি আর ভাল করতে পারবো না। দেখলাম হিতে বিপরীত হয়েছে। আমার জন্যে আনন্দের খবর। রায়হান জেগে উঠছে। বর্ষায় ডুবে যাওয়া নদীর চরের মতো। আরো উর্বর, আরো ঐশ্বর্যশালী হয়ে। আমি একটু থমকে ওকে দেখলাম। ও আমাকে দেখে গম্ভীর চাপা গলায় বললো, তুই কেন এসেছিস জামেরী?

কেন, কি হয়েছে?

বিপদ হতে পারে?

দূর বোগাস। কিছু হবে না।

আমি হাসলাম।

না জামেরী ভাল করিসনি।

আঃ চুপ কর। তোর একটা দরকারী ওষুধ আনতে চেয়েছিলাম। পারলাম না।

পারবি না সে তো জানা কথা। তবে জানিস জামেরী, আমি এখন অনেক ভাল হয়ে গেছি। আগে মনে হতো আমার মাথার দরজা জানালাগুলো যেনো বন্ধ হয়ে আছে। বন্ধ ঘর কেমন গুমোট হয়ে থাকে অনেকটা তেমনি। এখন একদম হালকা। সারাজীবন তোর কেনা গোলাম হয়ে থাকবো জামেরী। ভাগ্যিস সময়মতো চিকিৎসা করিয়েছিলি। তুই ওষুধ না খাওয়ালে আমি বোধহয় পাগল হয়ে যেতাম।

এখন এসব কথা বলতে নেই। তোকে এক বছর ওষুধ খেয়ে যেতে হবে রায়হান। তোকে দেখে আমার কি যে আনন্দ হচ্ছে। মনে হয় বহুদিন এমন আনন্দের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ ছিলো না।

এ জন্যেই তুই আমার প্রাণের বন্ধু।

রায়হান শব্দ করে হাসে।

জানিস জামেরী, আমি একজন খুনের আসামী, তবু আমার একটুও ভয় করে না। দিব্যি ঘুমোতে পারি।

আমি তো এটাই চাই। তোর স্নায়ু যেনো সব সময় শান্ত থাকে। উত্তেজনা তোর জন্যে খারাপ হবে। অসুখ বাড়তে পারে।

আমার জন্যে তোর আর একটুও ভাবতে হবে না রে।

রায়হান গরাদের ফাঁকে হাত দু'টো জড়িয়ে ধরে। ও যেনো অনেককাল আগে ডুবে যাওয়া টাইটানিকের একমাত্র বেঁচে যাওয়া যাত্রী। ঝকঝকে দৃষ্টিতে আশ্চর্য কৃতজ্ঞতা। আমি সেই দৃষ্টিতে অভিভূত হয়ে যাই। আমার মনে হয় আমি যেনো মিতুলের ভালবাসার স্পর্শ পাচ্ছি।

ছন্দাকে আমি আমার করবোই জামেরী। দরকার হলে কিডন্যাপ করে এনে লুকিয়ে রাখবো।

সেটা তোর ব্যক্তিগত ব্যাপার।

তুই আমাকে এড়াতে চাইছিস?

না।

আমার সিদ্ধান্ত থেকে আমি একটুও নড়িনি।

আমি চুপ করে থাকি। এ কথার উত্তর হয় না। রায়হান এখন খুনের আসামী। বিচারে ওর ফাঁসী হতে পারে। তবুও স্বপ্ন দেখছে। সিদ্ধান্তের কথা সদম্ভে ঘোষণা করছে। স্বাভাবিক জীবনের তৃষ্ণা বুকে। ও সেই আগের রায়হান হয়েই আত্মপ্রকাশ করছে।

কি ভাবছিস জামেরী? ভাবছিস খুনের আসামীর মুখে এ কি কথা? না?

রায়হানের চাপা ফিসফিস কণ্ঠে আমি চমকে উঠি। আমার বিচলিত মুখের দিকে তাকিয়ে রায়হান হাসে। হাসির মাঝে সময় ফুরিয়ে যায়।

আবার কবে তোর সঙ্গে দেখা হবে জানি না রায়হান। অনেক ঘোরাঘুরির পর আজকের তারিখটা দিয়েছিলো ওরা।

না, তুই আর আসিস না। আমি এখন ভাল আছি রে। চিন্তার কোন কারণ নেই। তাছাড়া শীগগিরই বোধ হয় বিচার শুরু হবে।

শেষ কথায় রায়হানের মুখে পলকা ছায়া খেলে যায়। আমি কথা বলতে পারি না। গরাদের ফাঁকে রায়হানের হাত ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসি। এখন আর ওর জন্যে কোন কিছু করার নেই।

বুকে একগাদা আবেগ নিয়ে কিছু করতে না পারার যন্ত্রণাটা বড় মর্মান্তিক। রিকশা নিয়ে সোজা হাসপাতালে চলে আসি। মিতুল তেমনি শুয়ে আছে। কোন নড়াচড়া নেই। আমি আলতো করে ওর হাতটা ধরি। চাপ দেই। ঠোঁটে আঙুল বুলোই। গায়ের ওপরের শাদা চাদরটা গলা পর্যন্ত টেনে আনি। মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে মিতুলের হালকা শরীরটা দু হাতে উঠিয়ে নিয়ে চলে যাই। ওকে বুকে নিয়ে সারা শহরটা ঘুরে বেড়িয়ে সেই সমুদ্রে চলে যাবো, যার নীচে চমৎকার একটা পৃথিবী আছে।

কখনো ভাবি আমি নিজেই বুঝি সিজোফ্রেনিয়ার রুগী হয়ে যাচ্ছি। এ কেস অব সিজোফ্রেনিয়া। আমি সেইসব জগতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডুবে থাকি, বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই। রায়হানের চাইতেও বড় পেসেন্ট আমি। আমি সুস্থ ঠাণ্ডা মাথায় চমৎকার কৌশলে তলিয়ে যাই। আমার মনে হয়, আমরা যারা লিখি তাদের সবার সিজোফ্রেনিয়া থাকা উচিত। নইলে ভিসুয়ালাইস করা যায় না। নিজেকে সমর্থন করতে পেরে কিছুটা স্বস্তি পেলাম। আত্মতৃপ্তিও বটে। আমার সামনে মিতুলের হিমশীতল দেহ ক্রমাগত নীরেট বরফ হচ্ছে। আর আমার সিজোফ্রেনিক

ভুবন আমার জন্যে এক নিরাপদ আশ্রয়। রায়হানের তৈরি সেই জগৎ আমার জন্যে ছিলো দমবন্ধ করা, অথচ নিজের গড়া এই জগতে আমি অবলীলায় ছুটতে পারি। এমনি করেই আমরা বাঁচতে শিখি। বাঁচাটাকে আনন্দঘন করি। যে যন্ত্রটা মিতুলকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ওটাকে আমার এখন খুব পবিত্র মনে হয়। একটু পর রেজা এসে ঘাড়ে হাত রাখে।

কি রে কতোক্ষণ?

এই তো কিছুক্ষণ হলো। রেজার জন্যেই মিতুলের এখানে আমার অবাধ যাতায়াত। ও আমাকে এই হাসপাতালেরই একজন করে ফেলেছে।

এখানে বসবি না আমার রুমে যাবি?

এখানেই বসি।

রেজা মিতুলের বিছানার ওপর বসে।

তোর ঐ প্যারানয়ার রুগীটিকে আমার মাঝে মাঝে দেখতে ইচ্ছে করে রেজা।

হাসপাতাল থেকে যাবার পর আমিও আর ওকে দেখিনি। কেন বলতো?

না এমনি। কোন কারণ নেই।

তোর উপন্যাসটা শেষ হয়েছে?

আর একটু বাকি।

বিয়েটা বোধহয় আর করা হলো না জামেরী।

কেন?

মনের মতো মেয়েই পাচ্ছি না।

দেখিস ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে না যায়।

সত্যিরে আমি ভীষণ ইনডিসিসনে ভুগি। চোখ বুঁজে কোথাও জড়িয়ে না পড়লে বোধ হয় এমনি হয়।

ওর কথায় না হেসে পারি না। যেনো একটা পুঁচকে মেয়ে ন্যাকামি করে কথা বলছে। শুনলে গা জ্বলে। অকারণেই আমি ওর ওপর বিরক্ত হই। রেজার আদেখলাপনা আমার ভাল লাগে না। আমি উঠে পড়ি।

যাই। একটু কাজ আছে।

শালা তুই ইদানীং যেনো কেমন হয়ে যাচ্ছিস। তোর নাগালই পাওয়া যায় না।

আসিস একদিন বাসায়।

ওকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে বেরিয়ে আসি। পৌষের দুপুর আমার প্রেয়সী হয়ে যায়। হাঁটতে ভাল লাগে। ইচ্ছে করে একবার ভাঁতখান লেনে যাই। আবার মনটা বিমুখ হয়। হাসপাতালের সামনের বড় বড় গাছের ছায়ায় নীরবে হাঁটি। আর খানিকটা হাঁটলেই ভাঁতখান লেন পাবো। কিছু করার নেই এখন। গেলে মন্দ হতো না। শীতের দুপুরের প্রশান্তি আমার মনে। আসলে কারো ওপর রাগ করা আমার পোষায় না। আস্তে আস্তে সেটা নিজের ওপর এসে বর্তায়। হাঁ এবং না এই শব্দের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে আমি গলির সামনে আসি। তারপর খুব দ্রুতপদে বাড়ির সামনে। দেখলাম, দরজায় বড় একটা তালা ঝুলছে। দরজার জন্যে তালাটা বেমানান ভাবে বড়। আমি দমে গেলাম। কিছুক্ষণ অকারণে কড়া ধরে নাড়লাম। কড়া নাড়তে আমার ভাল লাগছিলো। পাশের বাসায় একটি ছেলে বেরিয়ে বললো, দেখছেন না তালা?

দেখছি তো।

ছেলেটি হেসে ফেললো। আমিও।

আসলে দরজায় নয়, আমি নিজেকেই নাড়া দিচ্ছিলাম। দেখছিলাম কেমন বাজে।

বাবুরা দেশের বাড়িতে গেছে।

ও।

আমি হাঁটতে থাকি। ছেলেটা আমাকে শুনিয়ে বললো, পাগল নাকি? আমি কথাটা গায়ে মাখলাম না। আমার তখন মনে হচ্ছিলো, আমরা কিছুদিন শহরে থাকি। আবার গাঁয়ে যাই। আবার ফিরি। আবার যাই। যাওয়া-আসাটাই খেলা। ছুটোছুটি করতে না পারলে মেদ জমে। তারপর খুব তাড়াতাড়ি রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। মিতুলের মা-র সঙ্গে কেন আমি দেখা করতে এসেছিলাম, সেটা নিজের কাছেও খুব স্পষ্ট নয়। মুখোমুখি হলে হয়তো আমি কোন কথা বলতে পারতাম না। অথবা এমন প্রশ্ন ওঠাতাম, সেটা নিয়ে আমি আগে থেকে কোনদিন ভাবিনি। তার সঙ্গে আমার প্রচণ্ড ঝগড়াও হতে পারতো। কোনটাই অসম্ভব ছিলো না। এখন যুবতী মিতুলের বদলে সেই ছেলেবেলার মিতুলের কথা আমার জানতে ইচ্ছে করছে। মিতুলের শৈশবের জন্যে আমি হীরের

সেতার বানাচ্ছি, সেখানে টুং-টাং সুর তুলবো। জীবনের এক পর্যায়ে ও এখন স্তব্ধ। আর কোন ঘটনা ঘটাতে পারবে না। তাই শৈশবটা আমাকে টানছে। দিন বা রাত্রির কোন ক্ষণে ওর জন্ম, ওজন কতোটুকু ছিলো, লম্বা কতোটুকু, গাল ফুলিয়ে কি কি কথা বলতে শিখেছিলো ও? কেমন করে ঘুমোতো, বেশি কাঁদতো না চুপচাপ থাকতো, রাত্রিবেলা জাগতো কিনা, কয় শিশি দুধ খেতো, আগে কোন শব্দটা বলতে শিখেছিলো—বাবা না মা? কি কি রঙের জামা ছিলো, লাল জুতো ছিলো কিনা? আরো কতো কি আমার জানতে ইচ্ছে করে। মিতুলের কথা যদি তেমন একটা ঠাকুর মা-র ঝুলিতে পাওয়া যেতো, কি আনন্দই না হতো। হাঁটতে হাঁটতে আমি আবার হাসপাতালের সামনে চলে আসি। তখন কিশোরী মিতুল আমাকে আচ্ছন্ন করে। বয়ঃসন্ধিক্ষণের সময়টাকে বড় বেশি ভাল লাগে। মিতুল কবে থেকে চোখে কাজল দিতে শিখেছিলো, কবে ও কথা বলতে গিয়ে লাল হয়েছিলো, প্রথম কাকে দেখে ওর বুক কেঁপেছিলো, কে ওর হাত ধরেছিলো, মিতুল কি আমার আগে ইচ্ছে করে কাউকে চুমু খেয়েছিলো? কয়টা প্রেমপত্র পেয়েছিলো ও? তেমন কাউকে যদি পাই, তাহলে রাতভর মিতুলের কথা শুনতে রাজী আছি। গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কারো কাছে কোনকিছু জানার উপায় নেই। মিতুলের বাবার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করে না। চোখ বুঁজে বড় করে শ্বাস নিলাম। বুকটা বড্ড ভার ঠেকছে। মিতুলের শৈশব এবং কৈশোরের দরজায় একটা বিরাট তালা ঝুলছে। বেমানান ভাবে বড় তালা। সে তালার চাবি হারিয়ে গেছে।

আমাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে দু'চারজন লোক সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে। ভাবছে আমি হয়তো কোন মতলবে দাঁড়িয়ে আছি। ভঙ্গিটা ওদের কাছে সুবিধে ঠেকছে না। এটা টের পেয়ে আমি পা-টা আরো একটু ফাঁক করে গাঁট হয়ে দাঁড়াই। সিগারেট জ্বালাই। অনেকদূরে দৃষ্টি ফেলে রাখি। নিজেকে মাস্তান মনে হয়। নিজেকে গুণ্ডা-বদমাশ ভাবতে এখন আমার খারাপ লাগছে না। বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী পড়েছিলাম যে, জনৈক বিজ্ঞানী একটা ওষুধ আবিষ্কার করেছিলো। যখন তার ভেতর কু-প্রবৃত্তি প্রবল হতো তখন সে ওষুধটা খেয়ে নিতো। অমনি বদলে যেতো তার ভালোমানুষী সুন্দর চেহারা। সে রূপান্তরিত হতো কুৎসিত কদাকার

এক খর্বাকৃত বামনে। তখন সে তার কু-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতো বিভিন্ন ভাবে। সেটা ফিরিয়ে আবার ওষুধ খেয়ে তার মানুষ হয়ে যেতো। এ নিছকই গল্প। গল্পটা মনে পড়ায় আমার ভীষণ হাসি পেলো। হঠাৎ দেখলাম সাইকি। রিকশায় করে আমার সামনে দিয়ে পেরিয়ে গেলো। অনেক শুকিয়ে গেছে। চোখে অবাক দৃষ্টি। ওর চাউনিতে ঘাবড়ে গেলাম। না ঘৃণা নেই। একটা আত্মসমর্পনের ভাব। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত সৈনিকের দৃষ্টি ওর দু'চোখে। আমি একটুও দুঃখ দেখিনি। এতক্ষণে নিজের আচরণের জন্যে লজ্জিত হলাম। কি যা তা ভাবছিলাম আমি। সাইকি কি ভাবলো কে জানে। সামনে একটা খালি রিকশা পেয়ে উঠে পড়লাম। যোগফল মেলালাম বসে বসে। সাইকি নেতিয়ে পড়েছে। রায়হান তার স্ব-শক্তিতে ফিরে আসছে। আবার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। তাতে কোন লাভ হবে বলে মনে হয় না। বিচারে রায়হানের ফাঁসী হবে। অবধারিত মৃত্যু। আমার সমস্ত অনুভূতি ঝরা পাতার মতো শীতের উত্তুরে বাতাসের মতো কাঁপলো। রায়হানকে নিয়ে আমি আর বেশি কিছু ভাবতে চাইলাম না। ঘুরে-ফিরে শরাফীর বাসায় এসে নামলাম।

শরাফীর বৌ দরজা খুললো।

কেমন আছেন ভাবী?

আপনার বন্ধুর যন্ত্রণায় কি ভাল থাকার জো আছে।

কেন কি হলো? কিছু ঘটিয়েছে নাকি?

আসুন, দেখবেন।

রাজীন কোথায়?

ঘুমিয়েছে।

ওদের শোবার ঘরে এলাম। শরাফী লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। আমাকে দেখে হাসলো।

বেশি নড়তে-চড়তে পারবো না কিন্তু, পায়ে ব্যথা।

আমি হো হো করে হাসলাম।

খোঁড়াইটা দিলো কে? রাতে চোর তাড়াসনি তো?

আর বলিস না। হাটখোলার ওখানে ফুটপাত দিয়ে হাঁটছিলাম হঠাৎ একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এলো। চমকে গিয়ে দৌড় দিলাম। পাশে রাস্তা খোঁড়া হচ্ছিলো। হয়তো গ্যাসলাইনের জন্যে। তার মধ্যে পড়ে

গেলাম। ব্যস। আর কি, কান্না-পানিতে একাকার।

তারপর?

তারপর লোকজন এসে ওঠালো। চোট পেয়েছি অনেক।

শারীরিক পতনে লোকজন ওঠাতে পারে। কিন্তু আত্মিক পতনে কেউ ওঠাতে পারে না শরাফী।

এই দর্শন শুরু করলি। এখন কোন কিছুর কচকচি আমার অসহ্য। চুপচাপ শুয়ে থাকাটা ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করতে পারলে খুশী হতাম।

এপাশ-ওপাশ করতে পারো না, আবার ব্যায়াম?

ভাবী ফোড়ন কেটে ওঠে।

পারি না বলেই তো আকাঙ্ক্ষা। যা পারি না সেটার দিকে মন ছোটানোই তো আমাদের স্বভাব। কি বলিস আমেরী?

দর্শন কিন্তু তুইও কম জানিস না।

সবাই হো হো করে হেসে ওঠে।

সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি ভাবী। দেখুন না হাঁড়িতে কিছু আছে নাকি? শাকপাতা যা কিছু?

বলেন কি? এতোক্ষণ বলতে হয়?

বলবে কেন? মুখ দেখে তোমার বোঝা উচিত ছিলো।

আহা, আমি তো আর তোমাদের মতো সাহিত্য করি না যে, দর্শনেই চোখের ভাষা বুঝবো?

ইস্, ভাষাটা তো দেখছি খুব ভাল বললেন ভাবী। এবার আপনিও আমাদের সঙ্গে কলম হাতে নেমে পড়ুন ময়দানে।

ওটা আপনাদের দখলেই থাক।

শরাফীর বৌ হেসে বেরিয়ে যায়।

ঘরে ফিরে রাত জেগে উপন্যাস শেষ করি। মাত্র কয়েকটা পৃষ্ঠা কিছুতেই লিখতে পারছিলাম না। অসহ্য যন্ত্রণা। বুকের ভেতর নষ্টামি। ছিনালী চিন্তাকে বাগে আনতে পারি না। ফেরার নামিয়ে আর ধরা দিতে চায় না। গত মাস দু'য়েক ধরে এই শেষ পৃষ্ঠা ক'টা আমাকে কখনো কেটে কুটি কুটি করেছে, কখনো পাথরে পিষে থেঁতলে ফেলেছে। আমার বুকে ট্যান্টালাসের পিপাসা। কিছুতেই জলস্পর্শ করতে পারছিলাম না।

শেষ পর্যন্ত আমি অভিশাপমুক্ত হয়েছি। 'মগ্ন চৈতন্যে শিস' আমার রক্তের দলা থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা নষ্টামি। হাঁ এটাকে আমি নষ্টামি ছাড়া আর কিছু বলতে পারবো না। এ নষ্টামি আমার ভালবাসার, আমার চেতনার, আমার সংস্কারের, আমার যৌনতার। আমি জামেরী দুর্গন্ধে ভরপুর পিচ্ছিল রক্তের বীজ থেকে এই নষ্টামি টেনে বের করেছি। সে যন্ত্রণার কথা কি করে ভুলবো। বাকী রাত আমার কিছুতেই ঘুম এলো না। আমি অনবরত সিগারেট টেনে এবং পায়চারী করে কাটিয়ে দিলাম। কাল ভোরে যদি দেখি আমার মাথার চুল সব শাদা তাহলে একটুও অবাক হবো না। মাঘের শীতের রাতে আমি সব জানালাগুলো টান টান করে খুলে রাখলাম। বন্ধ জানালা আমি সইতে পারি না।

পরদিন সকালে কাগজ হাতে নিয়ে থমকে গেলাম। এমনিতেই মাথা ভার। চোখে জ্বালা। বুকের ভেতর প্রেসার অনুভব করছি। মিতুলের অসুস্থতা নিয়ে চিঠিপত্র কলামে দুটো চিঠি ছাপা হয়েছে। দু'টোই কৃত্রিম শ্বাস প্রত্যাহারের পক্ষে। আমি কাগজ হাতে অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। কারা এতো হিতাকাঙ্ক্ষী? পরক্ষণে মন থেকে সব ঝেড়ে ফেললাম। এর জবাব আমাকে দিতে হবে। এই মুহূর্তে দুর্বল হলে ওরা পেয়ে বসবে। বাথরুমে বসে যুক্তি তৈরী করলাম। ভেবেছিলাম, দুপুর পর্যন্ত একটানা ঘুমোব। কিন্তু হলো না। উত্তেজনায় পেয়ে বসেছে। বড় করে একটা চিঠি তৈরি করলাম। পরদিন কাগজে সেটা ছাপা হলো। দুপুরের পর আলী আহমদ সাহেব এলো। চুপে চুপে। অনেকটা চোরের মতো। আমি চেয়ার এগিয়ে দিলাম। ধপ্ করে বসলো। নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিয়েছিলো। আমাকে কোনকিছু বলার আগেই তার স্যাঁতসেঁতে দু'চোখে পাহাড়ী বৃষ্টি নামলো। আমি বিরক্ত হলাম। অথচ কিছু বলতে পারছিলাম না। কেন এসেছে, সেটাও আমার কাছে স্পষ্ট নয়। ক্যাঁচ-কোঁচে কান্নার মাঝে বিকৃত স্বরে বললো, আমি আর সইতে পারছিনা জামেরী। ওর মরে যাওয়া ভাল। মিতুলের কোন ব্যাপারে এখন আমি চট করে আবেগ-তাড়িত হই না। আমার তরল অনুভূতি ক্রমাগত পাথুরে কাঠিন্যে রূপান্তরিত হচ্ছে। আলী আহমদ সাহেবের কথায় আমার খুব একটা প্রতিক্রিয়া হলো না। জানি, কারা তাকে নাচাচ্ছে। কেন সে পিতার ভূমিকা থেকে সরে গেছে। তাঁর বুকের ওপরে যারা হাডুড়ি

মারতে পারে, আমার ওপর অতো সহজে পারে না। আলী আহমদ সাহেবের জন্যে আমার করুণা হলো। মিতুলের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক ছিলো, আমি মিতুলের সবচেয়ে কাছের লোক, এ বোধটাও ভুলতে পারে না। সেজন্যে ঘুরে-ফিরে আমার কাছে আসে। আশ্রয় চায়। নিজের বিবেকের কাছ থেকে যে চ্যুত হয়েছে, আমি তাকে আশ্রয় দেবার কে?

তুমি কিছু বলছো না কেন জামেরী?

এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কোন কথা বলতে চাই না। আপনি তা জানেন। চা খাবেন?

চা? হ্যাঁ, দাও।

বুঝলাম, উনি এখন কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে কাটাবে। ভেতরে তাঁর প্রচণ্ড শূন্যতা। বিরুদ্ধশক্তির সঙ্গে লড়াইয়ে হেরে গেছে। সে গ্লানির ভার বহন করতে পারছে না বলে আমার কাছে ছুটে এসেছে। মিতুলের অসুখের পর থেকে খুব দ্রুত বুড়িয়ে যাচ্ছে। নইলে স্বাস্থ্যটা এতো তাড়াতাড়ি ভাঙার কথা ছিলো না। ফ্লাস্ক থেকে চা ঢেলে দিলাম। জামার হাতায় চোখ মুছে চায়ে চুমুক দিলো আলী আহমদ সাহেব। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, অবিন্যস্ত পোশাক ইত্যাদিতে তাকে অনেকটা চা বাগানের মজুরের মতো দেখাচ্ছে। জানি না এ উপমাটা কেন আমার মনে এলো। আসলে তার ঐ স্যাঁতসেঁতে দৃষ্টি আমাকে ঘৃণায় ভরে রেখেছিলো। আমি তার দিকে স্বাভাবিকভাবে তাকাতে পারছিলাম না। যেনো একটানা বর্ষণ তার দৃষ্টিকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। সেখানে আর কোনদিন রোদের জায়গা হবে না। আসলে গ্লানি-পড়া দৃষ্টি আমার সহ্য হয়। কিন্তু সততার কাছে পরাজিত দৃষ্টি সইতে পারি না। কথা না বলে আপনমনে চা শেষ করলো।

তোমার কাজের তাড়া আছে নাকি বাবা?

না।

তাহলে একটুক্ষণ বসি?

বসুন।

জানো বাবা, ছোটবেলা থেকেই মেয়েটা একদম একলা একলা থাকতো। দু'বছর বয়সেই একা একা পুতুল খেলতো। বেশি কাঁদতো না। কাউকে বিরক্ত করতো না। মাঝে মাঝে আমি কোলে নিতে চাইলে দূরে সরে

যেতো। এমন করে তাকাতো যেনো ও আমাকে কোনদিন দেখেনি। আমি এক অপরিচিত লোক। ওর বাবা নই। অথচ কতো ছেলেমেয়ে দেখলাম, বাবা-মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে কেঁদে ভাসায়। ওর মা যাবার পর ক'দিন খুব কেঁদেছিলো। তারপর একদম চুপ। কারো মুখের দিকে তাকিয়ে কাঁদতো না। আমার কাছেও আসতো না। তখন থেকেই ও আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছিলো। শুধু আমি বুঝতে পারিনি।

আমার মনে হলো আমি এক আদিম গুহায় বসে গল্প শুনছি। ভেতরে আগুন-জ্বালানো গরম। বাইরে কনকনে শীত। তুষার ঝরছে। ঝড়ো বাতাস বইছে। বাঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে। কখনো কাছে। কখনো অনেক দূরে। আমার পিতা পাথরে ঘষে বল্লম শানাচ্ছে। শিকারে বেরুতে হবে তার। বাঘের গর্জনে হাত নিসপিসিয়ে ওঠে। মা আগুনে হরিণের মাংস ঝলসায়। অথচ দাদীর মুখের গল্প আর ফুরোয় না। শুনতে শুনতে আগুনের পাশে ঘুমিয়ে পড়ি। জিভে হরিণের ঝলসানো মাংসের স্বাদ। স্বপ্ন দেখি, বরফের ওপর দিয়ে এক মায়া হরিণের পেছনে ছুটছি। ছুটতে ছুটতে কতো চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে যাচ্ছি। ধরা আর হয় না।

আলী আহমদ সাহেব আবার জামার হাতায় চোখ মুছলো। নীচু হয়ে সর্দি ঝাড়লো। ব্যাপারটা খুব নোংরা মনে হচ্ছিলো আমার। গা ঘিন ঘিন করছিলো। অথচ আমার বুকে গল্পের পিপাসা। আদিম পৃথিবীর গল্প। যেনো ধৈর্য আর রাখতে পারছি না। ক্রমাগত অসহিষ্ণু হই।

মিতুলের কাছে আমি চিরকাল অপরিচিতই রয়ে গেলাম জামেরী। ও কোনদিন আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে কেঁদে ভাসায়নি। খুব কাছে এসে দাঁড়ায়নি। আমি ওর মাথায় হাত রাখতে গেলে দেখেছি, ও শক্ত হয়ে যায়। ও যেনো আমার মিতুল নয়। কোনদিন কোন প্রয়োজনের কথা আমাকে বলেনি। অথচ আমি প্রতি মুহূর্তে চাইতাম, ও আমার কাছে সহজ হোক। আব্দার করুক। আমার জন্যে স্বস্তি বয়ে আনুক। কিন্তু হয়নি। আমার চাওয়া আমার ভেতরে গুমরে মরেছে। তবে ওকে আমি বুঝতে পারতাম। এখন আর চিনতে পারছি না। ও অপরিচিত হয়ে গেছে। আমার পিতৃত্বের গৌরবকে পায়ে মাড়িয়ে ও রহস্যের অন্তরালে চলে গেলো। এর চাইতে মরে গেলেই শান্তি পেতাম বেশি।

আমি এক দুরন্ত বেপরোয়া বালক, কারো কথা শুনি না, অথচ এক

আশ্চর্য গল্পে এখন একদম বশীভূত। ঠিক এইভাবে আমি দিন-রাত পার করতে পারি। কেউ আমাকে নড়াতে পারবে না। মিতুলের কথা শুনতে আমি বড় বেশি ভালবাসি। সেইসঙ্গে পরাজিত পিতার নির্জলা কনফেসন।

ওর ছয় বছর বয়সে আমি যখন আবার বিয়ে করি, তখন ও আমাকে একটা প্রশ্ন করেছিলো জামেরী। আমি আজো তা ভুলিনি। ছয় বছর বয়সে জেনেছিলো, ওর মা নেই। নতুন মাকে পেয়ে ও খুশী হয়েছিলো। কিন্তু পরে, চুপি চুপি বলেছিলো, তোমাকে আমার খুঁজে পেতে কষ্ট হয় কেন বাবা? ঐ কথায় প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছিলাম আমি। ও কি বুঝেছিলো জানি না। তবে তখন থেকে আমি বিশ্বাস করতাম, আমার মিতুল ছয়টা ইন্দ্রিয় নিয়ে ঘোরা-ফেরা করে। ওর ঐ একা থাকার স্বভাব কিছুতেই ঘোচাতে পারিনি। ও কোনদিন কাউকে আপন ভাবতে শেখেনি। শুধু তোমার সম্পর্কে দুর্বল ছিলো বলে আমি খুব খুশী হয়েছিলাম জামেরী। তোমাদের মেলামেশায় আমার কোন আপত্তি ছিলো না। ভেবেছিলাম, এভাবে ও যদি কিছুটা স্বস্তি পায় তো পাক। বাবা হয়ে আমার এতোটুকু উদারতা থাকা উচিত।

বৃদ্ধ আবার চোখ মুছলো। দেখলাম, তার হাত কাঁপছে। ঠোঁট নড়ছে। হঠাৎ মনে হলো হয়তো ভয়ানক কিছু বলতে পারে। আগ্নেয় লাভা ক্রমাগত বিস্তারিত হচ্ছে তার বুকের সমতলে।

কিন্তু তুমিও—তুমিও ওকে বাঁচাতে পারোনি জামেরী। ওকে ধরে রাখার ক্ষমতা তোমার হয়নি।

আমার সামনে যেনো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো। আক্রমণটা নিজের ওপর আসবে সেটা ভাবতে পারিনি। কিছুটা হকচকিয়ে গেলাম। আহমদ সাহেব উঠে আমার সামনে এলো। চোখে চোখ রাখলো, ঘোলাটে স্যাঁতসেঁতে দৃষ্টিতে পাহাড়ী ধ্বস। আমার বুকটা কেঁপে গেলো।

সুস্থ থাকতে যাকে তুমি ধরে রাখতে পারোনি, এখন কেন তাকে ধরে রাখার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছো?

যা করতে পারিনি, সেটা তোলার জন্যে কি আমরা ক্রমাগত ব্যর্থতার মধ্যে তলিয়ে যাবো? তা হয় না।

আমার উত্তরে তার চোখে দপ্ করে আলো জ্বললো। সঙ্গে সঙ্গে তা

নিভেও গেলো। ফিরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসলো। তখনো তার শিথিল হাত কাঁপছে। ভেতরে কি ধরনের উত্তেজনা, আমি তা জানি না। আমার দিকে না তাকিয়ে বললো, তুমি যা পারো আমি তা পারি না।

কন্ঠে ধু ধু উদাসীনতা।

তোমার তারুণ্য, তোমার ভালবাসা তোমার শিক্ষক। আমার পাশে কেউ নেই।

আপনার স্নেহ?

নেই। বড় বেশি দুর্বল। তাকে সম্বল করে এগুতে পারি না। পিছিয়ে পড়ি। তার চাইতে ওদের যুক্তি অনেক প্রবল। তার সামনে দাঁড়ানো যায় না। সেটা বিশ্বাস করতে মন চায়।

তারপর বিড়বিড় করে বললো, বড় ক্ষণস্থায়ী এ জীবন। তার জন্যে কেন এতো মায়া? তাকে ছেড়ে দেয়াই মঙ্গল।

না।

আমি চেঁচিয়ে উঠি। আলী আহমদ সাহেব চমকে ফিরে তাকায়।

মিতুলের কাছে তুমি হেরে গেছো জামেরী। আমি ভেবেছিলাম, মিতুলকে তুমি জয় করবে। দেখলাম ভুল। মিতুল যা ঠিক, তাই রয়ে গেলো। ও কারো আপন হবার জন্যে জন্মায়নি।

বিশ্বাস করি না।

তাহলে হারিয়ে গেলো কেন?

হারায়নি। ও আবার সুস্থ হবে।

তুমি বড় গোঁয়ার ছেলে জামেরী। কিন্তু কি জানো গোঁয়ার্তুমি কখনো কখনো বড্ড কষ্ট দেয়। তার চাইতে বিশ্বাসে আত্মসমর্পন ভাল। মনে শান্তি থাকে।

ওটা দুর্বল লোকের সম্বল।

বৃদ্ধ মাথা নাড়লো। কোন অর্থে, সেটা আমি বুঝতে পারলাম না। আর কিছু বললোও না। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলো। আমি জানি, তার মনে দ্বন্দ্ব। দুটো শক্তি তার ভেতর কাজ করছে। তবে বাইরের শক্তির কাছে নতজানু হয়েছে। তাই মিতুল তার জীবন থেকে হারিয়েছে। আমি দেখছি, আমার জীবনে মিতুলের অস্তিত্ব প্রবল হয়ে উঠছে। আমি তার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। মনে হচ্ছে, তার দৃষ্টি

থেকে ক্লান্তির মেঘটা সরে গেছে। আমার চোখে চোখ ফেললো। তখুনি ধূর্ত শয়তানের মতো কে যেনো ভেতর থেকে কথা বলতে শুরু করলো। আমি এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলাম না।

ছোটবেলায় মিতুলের লাল জুতো ছিলো?

মনে নেই।

ও কয় বোতল দুধ খেতো?

মনে নেই।

ও শান্ত ছিলো, না দুষ্টু?

জানি না।

ও প্রথমে কাকে ডাকতে শিখেছিলো?

আঃ জামেরী, তুমি একটা আস্ত বদমাশ। তোমার মতো ধুরন্দর ছেলে আমি দেখিনি।

শৈশব, কৈশোর, যৌবন একজন মিতুলের রূপান্তর। ও বার্ধক্য দেখেনি। দেখবে না। শৈশবের লাল জুতো, কৈশোরে এক মুঠি ঝিনুক, যৌবনে তা শাদা রাজহাঁস। আঃ, আমরা কতো দ্রুত চলতে পারি। মনেই থাকে না পেছনের কথা।

জীবন বড় ক্ষণিকের জামেরী।

না।

একজন মিতুল জীবনের শেষ কথা নয়। জীবন মানেই পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানো। খোসার পরে খোসা। প্রতি খোসার অন্তরালে নতুন জীবন। জামেরী, তুমি এগিয়ে যাও। একজনের থেমে পড়ায় আরেকজনের চলা থামতে পারে না। প্লিজ জামেরী।

বৃদ্ধের মুখে ইবলিশের হাসি। মানুষের সামনে নতজানু না হওয়ার ঔদ্ধত্য। আমার নিশ্বাস দ্রুত হয়। আমি চোখ বড় করে তার দিকে তাকিয়ে থাকি। বৃদ্ধ উঠে এসে হাত ধরে।

তুমি আর কাগজে লেখালেখি কোর না জামেরী। তোমার দোহাই লাগে। দয়া করো—আমাকে দয়া—

আমি তাকে ঠেলা দিয়ে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেই। বৃদ্ধ পড়তে পড়তে টাল সামলে নেয়। চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি আঙুল উঁচিয়ে দরজা দেখিয়ে দেই। বৃদ্ধ নড়ে না। আমি চেঁচিয়ে উঠি।

বেরিয়ে যান।

কাজটা ভাল কোরছো না জামেরী।

আপনি বেরিয়ে যান।

তোমার কাছে অনুরোধ জামেরী, তুমি ব্যাপারটা নিয়ে নাড়া-চাড়া কোর না। চুপ করে থাকো। আমি ডাক্তারদের কাছে অনুরোধ জানাবো, শ্বাস প্রত্যাহারের জন্যে।

আমি আর কোন কথা না বলে তাঁকে হাতে ধরে টেনে দরজা দিয়ে বের করে দেই। বৃদ্ধের চোখে জল। আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। কিছুক্ষণ পর মিন্টু এসে চেঁচামেচি করে, আপনি বাবাকে অপমান করেছেন জামেরী ভাই, আমিও আপনাকে দেখে নেবো। খুব সাহস হয়েছে আপনার। তাছাড়া যার ওপর আপনার কোন অধিকার নেই, তাকে নিয়ে হৈ চৈ করতে লজ্জা করে না? চরিত্রহীন কোথাকার? আমাদের সব জানা আছে। একটা খুনী লোককে দিনের পর দিন ঘরে লুকিয়ে রেখেছিলেন? ভণ্ড, প্রতারক?

তুমি যদি বেরিয়ে না যাও, আমি তোমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবো।

যাচ্ছি। কিন্তু মনে রাখবেন, আমিও ছাড়বো না।

ও চলে যেতে দরজাটা বন্ধ করে দেই। মনের মধ্যে এখন আর কোন উত্তেজনা নেই। মিন্টুর পরিবর্তনে আমি অবাক হই না। শুধু আমার সামনে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের উঁচু এক দেয়াল অনুভব করছি। এখন আর বেশি ঘর থেকে বের হই না। অফিস যাই। কিছুক্ষণ হাসপাতালে থাকি। তারপর আবার ঘর। রেজার সঙ্গে সমস্যাটা আলাপ করেছিলাম। ও হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, আমরা ডাক্তার। আমাদের কাজ মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনকে ধরে রাখা। যে কেউ বললেই আমরা সেটা মেনে নেবো কেন? মিতুলের ব্যাপারে কেউ যদি চাপ সৃষ্টি করতে আসে, আমরা তার মোকাবিলা করতে প্রস্তুত। আমাদের ওপর কথা বলবে কে?

শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হই। ও পিঠ চাপড়ে বলে, তুই নির্বিবাদে উপন্যাস লেখ, মিতুলের কিছু হবে না।

রেজা যতো সহজে বললো, লেখার কাজটা কি আসলে অতো সহজ! নষ্টামি করার জন্যেও তো বিশেষ চরিত্রের দরকার হয়। সবাই কি সেটা

পারে? মিতুলের বেঁচে থাকাটা একটা যন্ত্রণা, অতএব তাকে মেরে ফেলো। মিতুলের বেঁচে থাকাটা বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অতএব তাকে মেরে ফেলো। আমরা এমনই দুর্বল। যন্ত্রণার মুখোমুখি হতে চাই না। নিয়মের বাইরে পা ফেলতে হাঁটু কাঁপে। আমরা চাই শামুকের মতো নিজস্ব গণ্ডিতে গুটিয়ে বসে থাকা। না, আমি তা পারবো না। যন্ত্রণা আমার আনন্দ। নিয়ম ভাঙাটা প্রয়োজন। দুটোই সমান অপরিহার্য। পালাতে আমি শিখিনি। আমি কি অন্যায় করেছি যে, জীবনের দিকে পিঠ দেখিয়ে ছুটতে হবে? যতো ক্ষণিকের হোক প্রতিটি মুহূর্ত মূল্যবান। মুহূর্তের ঝিনুকে আমি মুক্তো জমাই।

আর দু-একদিনের মধ্যে আমার বইটি বেরিয়ে যাবে। ছাপা শেষ। অফসেটে প্রচ্ছদ ছাপা হচ্ছে। একটা চাপা আনন্দে বুকটা আলোকিত হয়ে থাকে। নতুন উপন্যাসের ছক করে ফেলেছি। সঙ্গীতের ওপর কিছু পড়াশোনা দরকার। যত পড়ি ততোই এক অনাবিষ্কৃত মহাদেশ দৃষ্টিগোচর হয়। একটু একটু এগোই। যতই সামনে যাই বুকটা ফুলে ওঠে। বরফ ঢাকা সে মহাদেশের হদিস আগে কখনো পাইনি। সে উপন্যাসে আমি একটি মিশরীয় রূপকথাকে প্রতীক গল্পে রূপান্তরিত করবো। আমার নায়ক হবে একজন গায়ক। দেশ হবে তার সঙ্গীতের উৎস। আবার আমার মধ্যে নষ্টামির রক্ত ছলকে উঠছে। আমি কিছুতেই সুস্থ থাকতে পারি না। নিজেকে দুমড়ে-মুচড়ে কখনো আবর্জনায় ফেলি, কখনো সমুদ্রের মোহনায়। আমি একটা আস্ত শয়তান হয়ে জীবনের গলিতে গলিতে হাত রাখি। সে হাতে কখনো নরম পলিমাটি পিণ্ড করি, কখনো ঝাঁঝালো বানোয়াট বালুচরে ডুবিয়ে রাখি। ইচ্ছে করে সেই ইবলিশ হয়ে যাই, ধূর্তোমির সব ভাষা যার আয়ত্তে। রেজা আমাকে কতো অনায়াসে উপন্যাস লিখতে বলে, আমার হাসি পায়। রেজা, তুই তো জানিস না নিজেকে কতোখানি ধ্বংস করে আমি একটা ভ্রূণের জন্ম দেই। কখনো আমার মন, আমার শরীর বিদ্রোহ করে। কখনো ছলনা করে কোন্ অতলে যে তলিয়ে যায়— এক লাইনও তখন বের করতে পারি না। তুই তো জানিস না রেজা, একটা উপমার জন্যে, একটা শব্দের জন্যে কতোদিন ফুঁপিয়ে কেঁদেছি, হাত কামড়েছি। সারারাত পায়চারী করে শরীরটাকে শাস্তি দিয়েছি। ছিনালীর জন্যে যেমন আলাদা চরিত্রের দরকার, এও

তেমনি। তাই তো বলি রেজা, তোর অনায়াস বলার মতো লেখাটাও যদি অনায়াস হতো, তাহলে কেমন হতো?

পরদিন ভোরে ভীষণ শাদা কুয়াশায় চারদিক ডুবে রইলো। দু গজ দূরের কোনকিছু পরিষ্কার দেখা যায় না। এমন কুয়াশা আগে কখনো দেখেছি কিনা মনে পড়লো না। আমি জানালার ফাঁকে মুখ রেখে বসে রইলাম। সেই কুয়াশায় খুব আনন্দ হলো। জমাটবাঁধা গ্লানি যেনো বরফ হয়ে গলতে শুরু করেছে। ঝর্ণার মতো ঝরছে। দু-একটা গাড়ি যাচ্ছে। রিকশাও নেমেছে। আমার নিজেরও ছুটে যেতে ইচ্ছে করলো। কিছুক্ষণ ফুটপাথ ধরে হাঁটলে খারাপ লাগতো না। বেরুবার মুখেই হকার কাগজ দিয়ে গেলো। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাগজ দেখলাম। হেডলাইন বাজে। পড়ার মতো খবর নেই। শেষ পৃষ্ঠায় দৃষ্টি আটকে গেলো। আগামীকাল থেকে রায়হানের বিচার শুরু হবে। বুকটা কেমন ফাঁকা হয়ে গেলো। মিতুলকে নিয়ে আরো দুটো চিঠি ছাপা হয়েছে। পড়ার ইচ্ছে হলো না। কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এলাম।

কুয়াশা চুলের গোছায় আসন পাতলো। মুখটা ভিজে ভিজে লাগছে। তবুও সেই স্পর্শ শরীরে মেখে হাঁটতে ভারি ভাল লাগছে। চারদিকে যেনো কিসের গন্ধ। নিঃশ্বাস নিলে বুক ভার হয়ে যায়। রায়হান আর কোনদিন ওর ঝকঝকে জীবনযাপনে ফিরে আসতে পারবে না। ও মরবে। মৃত্যু ওর দোরগোড়ায় চুপিসারে দাঁড়িয়ে। সেদিনের পর রায়হানের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করে। কি ভাবছে ও এখন? আমি আবেগে বিহ্বল হয়ে যাই। যন্ত্রণার বিশাল গহ্বরটা আগ্নেয়গিরি হয়ে মুখ খুলে রেখেছে। আমাকে কোনক্রমেই টিকতে দেবে না। অনেকক্ষণ হাঁটাহাঁটির পর ঘরে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে হাঁচির আক্রমণ টের পাই। বেশ হয়েছে জামেরী শরীরটাকে কষ্ট দিতে তুমি না বড্ড ভালবাস? হ্যাঁ ভালবাসি, ভালবাসি। হাঁচির মধ্যে আমি চেঁচিয়ে উঠি। আমার তখন কেবল চেঁচাতে ইচ্ছে করে। কাঁপতে কাঁপতে চা বানাই। দু গ্লাস চা খেয়ে লেপের নীচে ঢুকে পড়ি।

কতোক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না। দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে যায়। সমস্ত মাথা ভার হয়ে আছে। উঠতে ইচ্ছে করে না। ভাবলাম, যে এসেছে সে ডেকে ডেকে ফিরে যাক। এখন কারো সঙ্গ

আমার ভাল লাগে না। কিন্তু কড়া নাড়া আর থামে না। দরজা খুলতেই দেখি শরাফী।

কি রে, সারারাত মদ গিলেছিস নাকি? চোখ-মুখ অতো ফোলা ফোলা কেন?

আয়। বোস।

আমি আবার লেপের নীচে ঢুকি।

কি ব্যাপার রে, শরীর খারাপ?

না। মাথাটা কেবল ভার হয়ে আছে।

জ্বর আসেনি তো?

না।

তাহলে একটা কিছু গড়বড় হয়েছে। রাত জেগেছিস নাকি?

সকালে অনেকক্ষণ কুয়াশার সঙ্গে প্রেম করেছিলাম।

ও তাই বল।

শরাফী হো হো করে হাসে।

ও একটা সিগারেট জ্বালায়। আমাকেও দেয়।

প্রেম করার জন্যে আর কোন মানুষ খুঁজে পেলি না?

পেলাম কৈ? অমন যাদুর বাঁশি আর কি কেউ বাজাতে পারে?

তা বটে। কোথায় যে কখন তোর কোন্ বস্তুতে আকর্ষণ, বোঝা দায়।

শরাফী একমুখ ধোঁয়া ছাড়ে।

সত্যি, বুঝতে পারলে বেঁচে যেতাম।

তুই কি ঘর থেকে বের হওয়া ছেড়ে দিয়েছিস নাকি?

এক রকম তাই। ভাল লাগে না ঘুরতে।

মিতুলকে নিয়ে খুব লেখালেখি হচ্ছে।

জানি।

রায়হানের বিচার শুরু হচ্ছে।

দেখেছি।

তোর কোন অসুবিধা হবে না তো?

কি আর হবে!

আমি শরাফীর দিকে না তাকিয়ে ধোঁয়ার রিং বানাই। ও আমার জন্যে চিন্তা করছে। কিন্তু নিজের জন্যে আমি অতোটা ভাবছি না। যেমন

করে একটা পর্যায় থেকে আরেকটা পর্যায়ে ঢুকে যাচ্ছি, এ জীবনের আর এক বিচিত্র গোলকধাঁধা। আমি এখানে ডিডেলাস। সৃষ্টির আনন্দে বিভোর।

আমার বৌ তোর জন্যে ভাবছে জামেরী। মিতুলের পক্ষে চিঠিটা বেনামীতে ছাপলেই পারতি। ওরা বেশ আঁটঘাট বেঁধে নেমেছে। তোকে অনবরত নাস্তিক বলে গালি দিচ্ছে।

আঃ শরাফী, তুই কি মেয়েলি কাঁদুনি গাইছিস? আমি এসব নিয়ে ভাবি না।

সবকিছু অমন উড়িয়ে দিস না জামেরী।

তোর উপদেশ মনে থাকবে।

শরাফী জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আর একটা সিগারেট জ্বালায়। আমার টেবিলের সামনে যায়। বইপত্র নাড়া-চাড়া করে। আবার আমার হাঁচি শুরু হয়। কয়েকটা হাঁচির পর মাথাটা হালকা লাগে।

একটু চা বানাবি শরাফী?

সে তো বুঝতেই পারছি যে, সেবা করতে হবে। একটা কিছু না বাধাতে পারলে তো সুস্থ থাকতে পারিস না।

দেখ, বহুদিন কোন অসুখ করেনি।

হ্যাঁ, এখন সেই আনন্দেই ধেই ধেই করে নাচ।

ক্ষেপিস না শরাফী। তুই ক্ষেপলে বাঁচবো না।

আমি বালিশের নীচ থেকে সিগারেট বের করি। কুয়াশা কেটে গেছে। চারদিকে এখন ঝকঝকে রোদ। ইউক্যালিপটাসের পাতা শিশির-মাখা। সবটা শুকোয়নি। টুকরো টুকরো শাদা মেঘ ভেসে যাচ্ছে। একটা যদি আমার জানালায় এসে ঢোকে, তাহলে মন্দ হয় না। গত সাতদিনে মিতুলের ওখানে যাইনি। এখন আমি স্বেচ্ছা নির্বাসনে। বৃহন্নলা হয়ে থাকতে সুখ পাই।

শরাফী দু কাপ চা নিয়ে আসে।

তোর বইটার কি হলো?

কালকে বাঁধাই হয়ে আসবে।

খুব ভাল। আজ বেরুবি নাকি?

বিকেলে হাসপাতালে যাবো।

বৌ বলছিলো তোকে নিয়ে যেতে। ক'দিন আমার ওখানে থাকবি?

যাবো এক সময়। আজ থাক। রামীন কেমন?

ভাল।

মাহমুদের খবর কি রে? অনেকদিন কবিতা দেখিনি?

সকালে ওর ওখানে গিয়েছিলাম। ব্যবসায় মন্দা, গাড়িটা খারাপ হয়েছে, ফ্রিজ চলছে না ইত্যাদি কারণে মন খারাপ।

অথচ দেখ শরাফী, কবি হিসেবে ওর যে মৃত্যু হয়েছে এজন্যে মন খারাপ হয় না।

তা ঠিক, এ বোধ ওকে তেমন কষ্ট দেয় না।

নতুন বই কিছু আছে নাকি জামেরী?

খুঁজে দেখ।

শরাফী বইয়ের গাদায় ঝুঁকে বই খোঁজে। আমি চুপচাপ শুয়ে থাকি। দোয়েলটা আসে ইউক্যালিপটাসের ডালে। মুহূর্তে পাখিটা আমার চোখের সামনে জেমস জয়েসের নায়ক স্টিফেন হয়ে যায়। একপাদা ছেলের সঙ্গে হল্লা করতে করতে স্কুল থেকে ফিরছে।

পরদিন একটা বেনামী চিঠি পাই। যতো রকমে সম্ভব শাসিয়েছে আমাকে। নিশ্চয় মিন্টুর কাজ। চিঠিটা টুকরো টুকরো করে বাইরে ফেলে দেই। চরম কিছুর মুখোমুখি হওয়ার জন্যে আমাকে প্রস্তুত থাকতে বলেছে। কেমন মেঘ ঘনিয়ে আসে। চারদিকে একটা ঝড়ো হাওয়া। মিতুলকে নিয়ে পত্রিকার বাদ-প্রতিবাদ সমানে চলছে। ব্যাপারটা এখন শুধু কেবল আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিতর্কটা ছড়িয়ে গেছে অনেকের মধ্যে। সংক্রামক ব্যাধি যেনো। মহামারীর হিড়িক চলছে। চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েও স্বস্তি পাই না। মাথার মধ্যে একটা কাঁটা খচখচ্ করে। প্রকাশক দশ কপি বই দিয়ে গেছে। খুলে দেখিনি। মিতুল হয়তো আর কোনদিন বলবে না, তোমার শরীরে নতুন বইয়ের গন্ধ জামী। ছাই গন্ধ। সে গন্ধটা শুধু কেবল তোর নাকেই ছিলো মিতুল, আর কোথাও না। শরাফীর অপেক্ষায় আছি। ও এলে দুজনে বই নিয়ে বেরুবো। সমালোচনার জন্যে পত্রিকার অফিসে দিতে হবে। কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিলাম। রায়হানের বিচার এখন পত্রিকার পৃষ্ঠার মুখরোচক খবর। যেখানে যাই, বিচার নিয়ে আলাপ শুনি। অনেকে

জেনেছে আশ্রয়দাতা লেখক বন্ধু আমি। কেউ বাঁকা করে তাকায়। কেউ উপদেশ দেয়। আমি চুপচাপ শুনি। কখনো রাগ করি। পরক্ষণে আবার শান্ত হয়ে যাই। বুঝি রাগারাগি করার সময় নয় এটা।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর শরাফী এলো না। হয়তো কোথাও আটকে গেছে। দমে গেলাম। বইয়ের প্যাকেট তেমনি পড়ে রইলো, আমি বেরিয়ে পড়লাম। ফুটপাথ ধরে হাঁটতে ভাল লাগছে আজ। রিকশা নিলেই আজেবাজে চিন্তা পেয়ে বসে। হাঁটার জন্যে কিছু সচেতনতার দরকার হয় বলে চিন্তার অবকাশ কম। এই মুহূর্তে কোন রকম চিন্তার প্রশ্রয় দিয়ে নিজেকে দুর্বল করতে রাজী নই আমি। চারদিকে বারুদের গন্ধ স্পষ্ট টের পাচ্ছি। হাঁটতে হাঁটতে হাসপাতালে এলাম। মিতুলের মুখটা অবিকল তেমনি আছে। রোজ যা দেখি। যন্ত্রটা হিস্ হিস্ শব্দ করছে। বিছানার চাদর বদলে দিয়েছে আজ। শাদা ধবধবে পাটভাঙা চাদরে মিতুলকে নতুন বৌয়ের মতোই মনে হলো আমার।

রেজার সঙ্গে দেখা হতেই ও হাসলো।

তোর জন্যে খবর আছে জামেরী।

কেমন?

মিতুলের শ্বাস প্রত্যাহারের আবেদন জানিয়ে আলী আহমদ সাহেব মেডিক্যাল বোর্ডের কাছে আবেদন করেছে।

বোর্ডের কি মত?

এখনো কোন ডিসিশন হয়নি। তবে আমি তো সবার মনোভাব জানি, কেউ এটা মেনে নেবে না। আমাদের কর্তব্য জীবনকে ধরে রাখা। সেটা যেভাবেই হোক না কেন। মিতুলের অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে চিকিৎসা শাস্ত্রের কোন নতুন পদ্ধতি হয়তো আবিষ্কার হতে পারে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে যেতে দোষ কি! শেষদিন পর্যন্ত আমরা চেষ্টা করে যাবো। দেখবো জীবন মৃত্যু সম্পর্কিত রহস্য আমরা উন্মোচিত করতে পারি কিনা।

ঠিক বলেছিস।

আমি রেজাকে জড়িয়ে ধরি।

ছাড় ছাড়। এই আবেগ তোকে খেলো।

তোর কথাগুলো বড্ড ভাল লাগলো রেজা। আমার নিজের অন্তরের প্রতিধ্বনিই যেনো শুনলাম।

ডাক্তারী বিদ্যা শুধু ওষুধ দিয়ে রুগী ভাল করাই নয় জামেরী। সেটা একটা গবেষণাও। নইলে তো আমাদের অগ্রগতি নেই। যারা মিতুলের শ্বাস প্রত্যাহারের জন্যে চেঁচামেচি করছে, আমি মনে করি এই বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে তাদের বেঁচে থাকাটাও খুব একটা জরুরী নয়। তারাই বা সমাজের কি কাজে লাগছে? অহেতুক গোলযোগ সৃষ্টি করা ছাড়া?

উঃ রেজা, তুই একটা শুয়োরের বাচ্চা। এতো ভাল ভাল কথা আজ কেমন করে বলছিস! আমি তোর এই পয়েন্টের ওপর একটা আর্টিকেল লিখবো। মনে হচ্ছে, নতুন করে শক্তি পাচ্ছি।

রেজা হো হো করে হাসে।

পাম্প করা হচ্ছে! তোর সঙ্গে কি আমার তুলনা চলে! তুই হলি গিয়ে একজন চিন্তাবিদ।

তুইও কম নোস। জায়গা পেলে ঠিকমতো কথা বলতে পারিস।

বাদ দে ওসব। বেশি বিনয় আবার ভাল নয়। তুই একটু সাবধানে থাকিস।

কোনকিছুতেই আমার ভয় নেই। ওঃহো, উপন্যাসটা বেরিয়েছে। তোর জন্যে কপি আনা হয়নি।

শালা, আসল কাজে ভুল। সন্ধ্যায় বাসায় যাবো। থাকিস।

ঠিক আছে আয়।

চলি রে।

আমি মাথা নাড়ি। শাদা এ্যাপ্রোন গায়ে দেয়া রেজা ওয়ার্ডে ঢুকে যায়। আমি অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। কোন ওয়ার্ড থেকে যেনো কাতর চিৎকার ভেসে আসছে। কানফাটা চিৎকার। বুকটা ধপ্‌ধপ্‌ করে। মুচড়ে ওঠে। সইতে পারি না। দ্রুত বারান্দা পেরিয়ে নেমে আসি। মনে হয় পেছন থেকে কে যেনো আমায় তাড়া করছে।

বাসায় ফিরে রেজার পয়েন্টের ওপর একটা আর্টিকেল তৈরি করে ফেললাম। অবশ্য সেটা আমাকে চিঠির আকারে ছাপতে হবে। মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী নন বলে এই কলামটা সুবিধাজনক। লিখে ফুর্তি লাগলো। মনটা পাখির পালক হলো। ফুরফুরে। ঝরঝরে। উড়াল দেবার আকাঙ্ক্ষায় মাতোয়ারা। অনেকক্ষণ গুনগুনিয়ে গানও

গাইলাম। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বই খুঁজতে গিয়ে হাতের কাছে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের জীবনী পেলাম। সেটা নিয়েই শুয়ে পড়লাম। বুকের ওপর রেখে পড়তে আমার বেশ লাগে। আস্তে আস্তে চোখ বুঁজে আসাটা ম্যাজিকের মতো। যাদুর কাঠি ছুঁইয়ে দিয়ে কেউ আমাকে ঘুম পাড়ালো যেনো। আমি একান্তভাবেই তার ক্রীতদাস। কিন্তু প্ল্যাঙ্কের কথা পড়তে পড়তে আমার স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে এলো। চোখ বুঁজে আসার পরিবর্তে ঘুম ছুটে গেলো। 'আলো টুকরো টুকরো তেজের সমষ্টি' প্ল্যাঙ্কের এ আবিষ্কার আমার মাথায় ঢুকলো না। 'প্ল্যাঙ্কের তত্ত্ব আধুনিক পারমাণবিক কণা বিজ্ঞানের ভিত্তি' এ বক্তব্যেও আমার প্রতিক্রিয়া হলো না। আমি শুধু অবাক হয়ে দেখছি যে, তিনি কখনো হিটলারের বর্বরতার নিকট নতি স্বীকার করেননি। আমি চোখ বুঁজলেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে হিটলারের জার্মানীর চিত্র দেখতে পাচ্ছি। পটটা যেনো বদলে গেলো। প্ল্যাঙ্ক নয়, আমি এখন সে জার্মানীতে। সৈন্যদলের মার্চপাস্টের মাঝ দিয়ে ধেই ধেই নাচতে নাচতে চলেছি। রাইফেল উঁচিয়ে রেখেও ফায়ার করার ক্ষমতা ওদের নেই।

দুই স্ত্রীর গর্ভে সাতটি সন্তান ছিলো ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের। শেষ পর্যন্ত একটিও বাঁচেনি। বড় ছেলে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে মারা যায়। দু'জন যমজ মেয়ে এক বছরের ব্যবধানে মারা যায়। শেষ জীবিত সন্তান আরউইন হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দায়ে অপরাধী। ১৯৪৪ সালে নাজীরা ৮৬ বছরের এই বৃদ্ধ বিজ্ঞানীর নিকট হাজির হয়। তাঁকে বলে, আনুগত্যের শপথ নামায় স্বাক্ষর দিন, তাহলে আমরা আপনার ছেলেকে মুক্তি দেবো। সে হিটলারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের দায়ে কারারুদ্ধ। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক অসম্মতি জানান। ফলে তাঁর আদরের ছেলেটি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। এই ঘটনার পরই জার্মানীতে বোমা বর্ষণের ফলে তাঁর বাড়ি ও লাইব্রেরী ধ্বংস হয়ে যায়। তবুও ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক জীবিত ছিলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করেছেন। এসব ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে নিজেকে ভয়ানক তুচ্ছ মনে হলো। যে মানসিক যন্ত্রণার স্বীকার আমি নিজে হয়েছি, তার জন্যে আমার কোন ত্যাগ নেই। আমি কোন বড় ধরনের ক্ষতির সম্মুখীন হইনি, অথচ কতো তুচ্ছ কারণে ভেঙে পড়ি। সামান্য ঝাপটায় পায়ের নীচে আর কোন মাটি খুঁজে পাই না। ভেঙে পড়ার লজ্জা এবং গ্লানি দুটোই আমাকে

পেয়ে বসে। আত্মধিক্কারে জর্জরিত হই। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক আমার সামনে এক আদিগন্ত সমুদ্র হয়ে যায়। তার কোন কূল নেই, কিনার নেই। আমরা অতিশয় ক্ষুদ্র বলে বুঝতে পারি না যে, এখনো সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রশ্মি স্পর্শ করে সমুদ্রের জল। এমন এক একটি প্রাণের জন্ম হয়, যারা কোটি প্রাণের শক্তি নিজ দেহে ধারণ করে রাখে। তাদের ক্ষয় নেই, বিনষ্টি নেই। দৃষ্টির অভাব কেবল আমাদের যোজন যোজন দূরে রাখে।

সন্ধ্যায় অফিসে যাবার আগেই শরাফী আসে।

ইউনিক জামেরী।

ও আমাকে জড়িয়ে ধরে।

আগে বলবি তো কি হয়েছে ?

বই। বই। তোর নতুন উপন্যাস। একদম খোল-নলচে সব বদলে ফেলেছিস। পড়তে পড়তে মনে হলো, এ তোর নতুন জন্ম। অনেকদিন পর একটি ভাল উপন্যাস পড়লাম। জানিস, বইটা পড়া শেষ করে ছুটে এসেছি তোর কাছে। এখনো সে স্বাদ বুকের-জিভে আটকে আছে।

ওর উচ্ছ্বাসে আমার হাসি পায়। আসলেই শরাফী আমার প্রকৃতই বন্ধু। ওর মনটা বড় সরল।

হাসছিস কেন শালা ?

না। এমনি।

সত্যি, তোর দৃষ্টির প্রশংসা না করে পারি না।

তাহলে তো ডারউইনের কথা বলতে হয়।

কি ?

ঐ যে উনি বলেছিলেন, "আমার মনে হয় পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ থেকে আমি শ্রেষ্ঠ। যেসব জিনিস, সহজেই অপরের নজর এড়িয়ে যায়, সেগুলোকে আমি সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করি।" আমি সবসময় একটু স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণের পক্ষপাতি।

হুঁ বুঝেছি। কেল্লা ফতে।

মানে ?

মানে অহমিকায় পাচ্ছে তোকে।

পাগল। তুই তো চিনিস আমাকে। এই বইটা নে। পড়ে দেখিস।

ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের জীবনী। পড়লে বুঝবি সাধনায় আমরা কতো তুচ্ছ। সত্যি বলছি, শরাফী, সাধনার ভাষা আমরা জানি না। সামান্য একটু নাম হয়ে গেলে মনে করি অসাধ্য সাধন করলাম। যাকগে, চা খাবি ?

না, অন্যত্র যাবো। কাজ আছে।

তুই বেরুবি নাকি ?

হ্যাঁ, অফিসে।

তাহলে চলি।

শরাফী নেমে গেলে দেখলাম নীচের বারান্দায় মিন্টুর সাঙ্গ-পাঙ্গদের জটলা। ওরা আমার দিকে তাকিয়ে কি যেনো বলছে। আমি গুরুত্ব না দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেই। গতমাসে আলী আহমদ সাহেব বাসা ভাড়া দেয়নি। আমিও চাইনি। ওরা কি চিন্তা করেছে কে জানে। দেখা যাক কতোদূর এগুতে পারি। তখুনি রেজা এলো।

বইটা দে।

বোস না। চা খা।

না সময় নেই। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

বইটা বগলদাবা করে রেজা নেমে যায়। বই বেরুলে ওকে এক কপি না দিয়ে উপায় নেই। কাপড় পরে তৈরি হতেই মনে হলো, আজ অফিস থাক। মিতুলের কাছে যাই। মিতুলের শাদা ধবধবে বিছানা, শ্বাস যন্ত্রের হিস্ হিস্ ধ্বনি আমাকে ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়। মনে হয়, আমি যেনো এক শাদা রাজহাঁসের পিঠে চড়ে বসেছি। হলুদ পায়ে সাঁতার কেটে ও আমাকে নিয়ে যাচ্ছে—নিয়ে যাচ্ছে। হাসপাতালের ওয়ার্ডে ঢুকতেই রেজার মুখোমুখি হলাম। ও অবাক।

তুই ?

এমনি এলাম।

আমার সঙ্গে এলেই পারতি ?

তখনো ভাবিনি যে, এখানে আসবো।

আমি হেসে রেজার পাশ কাটিয়ে চলে আসি। ওর সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছে নেই। এমনিতেই ওর ভ্রু কোঁচকানো দেখেছি। মিতুলের বিছানায় বসে ওর হাতটা টেনে নেই নিজের মুঠিতে। মিতুল তোর মন্দির আজ আমার জন্যে বন্ধ। কতোদিন জুতো নিয়ে ঢুকে পড়তাম। আবার পিছু

হটতে হতো। জুতো খুলে ঢুকতে আমার প্রবল আপত্তি ছিলো। তুই মানতি না। বলতি, মন্দির মানেই পবিত্র স্থান। ছাই। আমার এখন কিছু ভাল লাগে না রে মিতুল। আমি তো একটা মন্দিরই জানি। সেটাই সাধনা। সেখানে আমি অবলীলায় যেতে চাই। ধুলোমলিন অবস্থায় অথবা ধব্‌ধবে শাদা কার্পেটে পা রেখে। কোন সংস্কার আমার ভাল লাগে না। সংস্কার জীবনের প্রাপ্তিকে ছোট করে আনে। তুই যেমন সহজে আমার কাছে এসে দাঁড়াতি তেমন কেন হয় না রে মিতুল। অথচ দেখ মাঝে মাঝে তুই এসে আমার কাছে দাঁড়ালেও মনে হতো হাত বাড়ালেই পাবো না। তখন বুঝিনি বুকের ভেতর থাকলেও অনেক কিছুই হাত বাড়িয়ে পাওয়া যায় না। পাওয়ার জন্যে যোগ্যতা অর্জন করা চাই। অনেকদিন তোকে জিজ্ঞেস করতাম, কেমন আছিস মিতুল? তুই বলতি, তোমার ভালোবাসায় ভালই আছি। এখন বুঝি মিছে বলতি। কেন মিছে বলতি মিতুল? আমাকে শান্তনা দেয়ার জন্যে? সবটাই তোর বেলেল্লাপনা। তুই মহা হারামী। আস্ত ডাইনী। আমার ভালবাসায় যদি ভালই থাকবি, তবে কেন তোকে ধরে রাখতে পারলাম না। আসলে তোকে পাওয়ার মতো যোগ্যতা আমার ছিলো না। তুই বড় অসময়ে আমার জীবনে এসেছিলি। অসময়ের ফল বেশিদিন টেকে না। মা এটা সব সময় বলতেন। তবে কোন মহত্তর সম্ভাবনাকে আমি অবিশ্বাস করি না মিতুল। তোর জীবনের বিনিময়ে যদি কোন আবিষ্কার হয়, সেটাই হবে আমার শান্তনার কারণ।

মিতুলের কাছ থেকে ঘরে ফিরে আমি কিছুতেই নিজেকে ধরে রাখতে পারি না। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদি। কাঁদতে আমার ভাল লাগে। এতোদিন বুকটা যেনো চাপা গুমোটে ভ্যাপসা হয়েছিলো। আজ আমি দরজা খুলেছি। কাঁদতে কাঁদতে হালকা হয়ে নিজেই এক সময় থেমে যাই। মাঝে মাঝে এমনি হয়। ঘটনা কখনো নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তখন সেটাকে নিজের মতো ছুটতে দেয়াই মঙ্গল। বেড়া ভেঙে সবজি ক্ষেতে ঢুকে পড়া গরুর মতো উদ্বেল আনন্দকে তছনছ করা যায়।

সারা সন্ধ্যা আমি কিছু খাইনি। খাবার জন্যে তেমন কোন চাড় নেই। খিদেটা যখন এমন করে হঠাৎ উবে যায়, তখন ভালই লাগে। রান্নাটা আর যা-ই হোক খুব সুখকর নয়। বাথরুমে ঢুকে চোখে-মুখে জলের

ঝাপটা দেই। টেবিলে এসে বসি। নতুন উপন্যাসটা মোটামুটি তৈরি করে ফেলেছি। লেখা শুরু করলেই হয়। পড়াশোনার বাকি কাজটা লিখতে লিখতে শেষ করা যাবে। জলের স্পর্শে কিনা জানি না, লেখাটা এই মুহূর্তে ভীষণ পবিত্র কাজ বলে মনে হয়। জুতো খুলে মন্দিরে ঢোকা যেনো। ধ্যানীর মতো নির্বিকার হতে না পারলে, বুঁদ হয়ে পড়ে না থাকতে পারলে স্রষ্টা হওয়া দুষ্কর। অন্য সময় যতো চিত্তচাঞ্চল্যই থাক, গড়ার আগে ধ্যানস্থ হওয়াটাই প্রথম শর্ত। নইলে সৃষ্টির গায়ে ফাটল থেকে যায়। সেই সাধনাকে এখনো আয়ত্ত করতে পারিনি। ভাবতে ভাবতে টেবিলের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি। সারারাত ঘরে বাতি জ্বলে। সকালে হকারের কড়া নাড়ায় ঘুম ভাঙে। আজ আমার সেই চিঠিটা বের হবার কথা। কাগজটা নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ি। হ্যাঁ, বেরিয়েছে। হুবহু ছেপেছে আর্টিকেলটা। ভীষণ খুশী লাগলো। নিজের লেখাটা বার দুই পড়ে প্রথম পৃষ্ঠায় আসতেই মেডিক্যাল বোর্ডের সিদ্ধান্তের খবরে চোখ পড়ে। উঃ বিধাতা এতো খুশী আজ রাখবো কোথায়? আলী আহমাদ সাহেবের দরখাস্তের আবেদনকে ওরা পুরোপুরি নাকচ করে দিয়েছে। যুক্তিগুলো কি চমৎকার, কি জোরালো! আমি অভিভূতের মতো বার বার পড়ি। পড়তে আমার ক্লান্তি লাগে না। যেনো আমি স্কুলের ছেলে, পরীক্ষার পড়াটা মুখস্থ করছি।

একটু পরে রেজা আসে।

শালা, তোকে অভিনন্দন জানাতে এলাম। রাত জেগে তোর বই শেষ না করে পারলাম না। করেছিস কি? মনে হলো, লেখা যেনো তোর না, অন্য কারো। পড়া শেষ করে তোর বিরুদ্ধে খানিকক্ষণ খিস্তিখেউড় আউড়েছি। মনে হলো একমাত্র গালগাল করলেই তোকে অভিনন্দন জানাতে পারবো। অন্য কোন ভাষায় নয়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্ বক্ করবি, না একটু বসবি?

বসার সময় নেই। ডিউটিতে যাচ্ছি। বইটা পড়ার পর তোর মুখ না দেখে আর হাসপাতালে যেতে পারলাম না। দে, পায়ের ধুলো দে?

আহ্, করছিস কি?

চলি রে জানেমনী। পারলে আসিস।

রেজা তড়বড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। আমি আবার কাগজটা টেনে

বসলাম। রায়হানকে আজ কোর্টে আনা হবে। উত্তেজিত বোধ করলাম। সাইকির সঙ্গেও দেখা হতে পারে। জানালায় দাঁড়ালাম। রায়হানের মৃত্যু স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। ওকে সুস্থ করেছিলাম। কিন্তু বাঁচাতে পারলাম না। দরজায় শব্দ হতে চমকে ফিরে দেখি আলী আহমদ সাহেব ঢুকছে। আমার বুকটা কেঁপে গেলো। নিজে নিজেই বললো, এই এমনি এলাম। তোমার এখানে আসতে মন চায়। কিন্তু পারিনা। মিন্টু, মিন্টুর মা রাগ করে। আজ ওদের ফাঁকি দিয়েছি। ফাঁকি কি আর সহজে দেয়া যায়? মিতুল যেমন জীবন দিয়ে ফাঁকি দিলো।

বসুন।

চেয়ার এগিয়ে দিলাম।

তুমি কেমন আছো?

ভাল। আপনার শরীর?

আমার আর থাকাথাকি। যেভাবে আছি ওটাকে থাকা বলে না। তুমি তো লেখক, অনেক বেশি বোঝ। হ্যাঁ ভাল কথা তোমার নতুন বইটা পড়লাম। মিন্টু এনেছিলো।

আমি চুপ। কথা বলি না। কিছু বলার নেই।

ধর্মের বিরুদ্ধে আক্রমণটা বেশি হয়েছে।

ধর্মের বিরুদ্ধে নয় ফ্যানাটিক লোকজনের বিরুদ্ধে।

ঐ একই কথা হলো। তবে সব মিলিয়ে বইটা ভাল। চমৎকার। আমার মিতুলকে তোমার বইয়ে নতুন করে দেখলাম। এতো কথা আমি জানতাম না। তবে খুনী লোকটাকে যে মেরে ফেলেছো তাতে আমি খুশী হয়েছি। বৃদ্ধ একটু থামে। আমি জানালার দিকে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে থাকি।

নায়ককে কেমন লাগলো?

তার ওপর আমি বিরক্ত। সব ব্যাপারেই বাড়াবাড়ি।

আমি মনে মনে হাসি। চতুরালিতে অপনি বেশ ওস্তাদ আলী আহমদ সাহেব। কিন্তু ভাণ করে কি আর সমস্যা এড়িয়ে যাওয়া যায়? ওটা আবার ফিরে এসে নিজের গায়েই লাগে।

মেডিক্যাল বোর্ডের সিদ্ধান্ত দেখেছো?

দেখেছি।

এবার আমি কেস করবো।

কেস?

হ্যাঁ।

তোমাকেও ছাড়বো না। আজকের কাগজে তোমার চিঠিটা দেখলাম। তোমাকে আমি আগেও সাবধান করেছিলাম। জানি, শুনবার ছেলে তুমি নও। কাজেই ফল ভোগ করতে হবে। আমার কি করার আছে বলো?

বৃদ্ধ বড় চোখে আমার দিকে তাকায়। আমি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকি। উত্তর দেই না।

বোস না তুমি?

দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগছে।

মিতুল তোমাকে বড্ড ভালবাসতো না?

জানি না।

তুমি জানো?

না, আমি জানি না।

তার মানে তুমি বলবে না?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে আলী আহমদ সাহেব। আমি অবাক হই। মিতুল আমাকে ভালবাসতো এই সূত্র ধরে কি সে মিতুলকে হাতড়ে বেড়াচ্ছে? নাকি মিতুলের ভালবাসা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলাম বলে আমাকে সহ্য করতে পারছে না? কোন্‌টা? কি তার মনের ভাব। এই মুহূর্তে আমি তার মুখের রেখা পড়তে পারছি না। সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে যদি একটা ধারণা হয়, পর মুহূর্তে সেটা বদলে যায়। বৃদ্ধ মুখ নীচু করে কাঁদে। শরীর কাঁপে। হঠাৎ মনে হলো হয়তো পারিপার্শ্বিকের চাপে তার মন খোলার জো নেই, তাই আমিই তার শেষ আশ্রয়। কিন্তু তা কি করে হয়? নিজের বিশ্বাস না থাকলে প্রতি পদক্ষেপ ভুল হিসেবে পড়তে পারে না। বিশ্বাসটাই মৌলিক শর্ত। তখন আমার রাগ হলো। বৃদ্ধের কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলাম।

কাঁদছেন কেন?

কাঁদতে মানা নাকি?

মানা নেই। তবে কাঁদার কারণ থাকবে তো?

প্লিজ আমেরী, তুমি আমাকে একটু বুঝতে চেষ্টা করো।

আমি তাকে ছেড়ে দিয়ে জানালার কাছে আসি। আমি যেনো তেমন একটা নাটক দেখছি, যার লিখিত পাণ্ডুলিপি নেই। না থাকার দরুন পাত্র-পাত্রীর ইচ্ছে মাফিক সংলাপ আমার মাথার মধ্যে লাফাচ্ছে। বিচ্ছিরি ব্যাপার। কেন যে বৃদ্ধ এমন ঘুরে-ফিরে আমার কাছে আসে।

জাগেরী, তোমাকে আমি বড্ড ভালবাসি।

আমাকে কেসে জড়াচ্ছেন?

হ্যাঁ, সেটা করবো।

তাহলে ভালবাসা কি? ভালবাসা প্রিয়জনকে বিপদে ঠেলে দেয় না।

সে তুমি বুঝবে না।

আমার হাসি পায়। মানুষ বোধ হয় সব সময় নিজেকে আরেকজনের চাইতে বিজ্ঞ ভাবতে ভালবাসে। এই ভাবার মধ্য দিয়ে ক্ষণিকের জন্যে হলেও নিজের সমগ্র জীবনের সুখছবি কল্পনা করে।

তোমার কোথাও যাবার তাড়া আছে নাকি বাবা?

হ্যাঁ। একটু বাইরে যাবো।

তাহলে যাই। তোমার এখানে এলে বড় আরাম পাই।

যখন ইচ্ছে হয় আসবেন।

সে তুমি না বললেও আমি আসবো। তবে তুমি আমাকে মাঝে মাঝে বড্ড অপমান করো।

তার সঙ্গে বেশি কথা বলতে আমার একদম ভাল লাগে না। বৃদ্ধ কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নেমে চলে যায়। তবু মুখ ফুটে বলতে পারি না যে, অপমানটাই আপনার প্রাপ্য। বিপথগামী মানুষের বিজ্ঞ হওয়াটা বড় মর্মান্তিক।

তাড়াহুড়ো করে যখন কোর্টে পেঁৗছলাম, তখন বেশ দেরী হয়ে গেছে। বিচার শুরু হয়েছে। আসামীর কাঠগড়ায় রায়হান। চারদিকে লোক গিজ-গিজ করছে। আমি কোনরকমে ঠেলে-ঠুলে সামনে গেলাম। প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই রায়হানের সঙ্গে চোখাচোখি হলো। ও বোধহয় আমাকেই খুঁজছিলো। অন্তত ওর দৃষ্টি দেখে তাই মনে হলো। একমাথা ঝাকড়া চুল ঘাড় বেয়ে নেমেছে। একমুখ দাড়িতে বেশ দেখাচ্ছিলো ওকে। এ যেনো অন্য রায়হান। একে আমি কোনদিন দেখিনি। কায়দা করে আমাকে বুড়ো আঙুল দেখালো। অর্থাৎ কিছু হবে না। সব কাঁচকলা। ওর বিশ্বাসে উত্তেজিত বোধ করি।

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এখনো ও অন্য কিছু ভাবতে পারছে। এতোটুকু মনের জোর ওর আছে বলে খুশী হলাম। রায়হানের পক্ষের উকিল জোরালো ভাষায় আরগুমেন্ট করছে। কিছুই আমার কানে যায় না। আমি দেখতে পাচ্ছি বেশ অনেকদিন আগের সেই ছবিটা। আমার ঘরে রায়হান পায়চারী করছে। আমি হাঁটুতে থুতনী রেখে বসে আছি খাটের ওপর। তোর এই ডেনটা চমৎকার জামেরী। হিংস্র জন্তুর লুকিয়ে থাকার জন্যে নিরাপদ জায়গা। ও কিছুতেই আমার ঘরটাকে ঘর বলতোনা। তারপর কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে চুমু দিয়েছিলো। জানিস জানেরী, এর ভেতর চমৎকার ক্যাপসুল রাখি মাত্র। একটা ক্যাপসুলই ওর জন্যে যথেষ্ট, কি বলিস ? এ ক্যাপসুল মানে জীবন নয় মৃত্যু ? হো হো করে হেসেছিলো রায়হান। বেশ অনেকক্ষণ জেগেছিলো ওর হাসির রেশ। তবে মৃত্যু, ক্যাপসুল শব্দ দুটো আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো অনেকদিন। আমার মনে হতো, গলার কাছে যেনো ঐ একটা বড়ি আটকে আছে। আজো যেনো রায়হান তেমন একটা ক্যাপসুল ছুঁড়বে বলে ট্রিগারে হাত রেখে বসে আছে। একমনে প্রদীপ্ত দৃষ্টি মেলে আরগুমেন্ট শুনছে। ভাবলেশহীন মুখমণ্ডলে কোন প্রতিক্রিয়া নেই।

সেদিনের মতো আদালত মুলতবী হয়ে যাবার পর আমি অনেকক্ষণ কাঠের বেঞ্চে বসে থাকি। আমার সামনে দিয়ে রায়হানকে নিয়ে যায়। কথা বলতে পারি না। ও তাকিয়ে হাসে। বাঁক নেবার আগেই পেছন ফিরে আবার বুড়ো আঙুল দেখায়। আমার কিছুই ভাল লাগে না। শূন্য ঘরটা মাথার মধ্যে বন্ বন্ করে। অবসাদ পেয়ে বসে। ইদানীং এ জিনিসটা আমাকে চট্ করে আক্রান্ত করে। জিভ তেতো ঠেকে। বুকটা বিরান জনপদ হয়ে যায়। তখন আমার কেবলই কান্না পায়।

গুলিস্তানে এসে কাফে রেস্তোঁরায় ভাত খেলাম। ঝাল তরকারিতে জিভ যেনো পুড়ে যাচ্ছে। চোখে জল এসে যায়। কয়েক গ্লাস পানি খেয়েও কিছু হয় না। পরক্ষণে মনে হলো, না, জিভ জ্বলুক। জ্বলাটা হজম করতে আমার বেশকিছু সময় কেটে যাবে। একটা মৌরি দাঁতের নীচে ফেলি। মনে হয়, এখানে না এলে ভাল হতো। এখানেই সাইকির সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এখানেই মিতুলের সঙ্গে শেষ দেখা। দূর ছাই, ঘুরে ফিরে এই কথাগুলো ফুটকি কাটে। সচেতনভাবে তাড়াতে চাই।

কিন্তু ডুব সাঁতারে আবার অবচেতনে ভেসে ওঠে। পালাবার উপায় নেই। শুধু লেখার সময়টা সবকিছু ভুলে থাকি। ঐ এক জায়গাতেই সব শান্তি। কতোক্ষণ বসেছিলাম জানি না। বেয়ারা এসে ডাকে।

উঠবেন না স্যার? কেবিন আর খালি নেই।

দেখলাম, বাইরে লোক দাঁড়িয়ে আছে। কখন লোকে ভরে গেছে টের পাইনি। রেঁস্তোরা গম গম করছে। অথচ কোন শব্দ এতোক্ষণ আমার মাথায় ঢোকেনি। বেয়ারাকে কিছু বখশিশ দিয়ে বেরিয়ে আসি।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে বুঝি, আমার কোন ঘর নেই। ওটা আসলে একটা গুহা। আদিম। হিম ঝরঝর। আমি কোনদিন আগুন জ্বালাতে শিখিনি। শুধু ঐ শীতল দেয়ালে বসে আঁকিবুকি কাটি। কোনদিন হয়তো প্রাচীন দেয়ালচিত্র হিসেবে আবিস্কৃত হবে। সেই সঙ্গে পাওয়া যাবে আমার মাথার খুলি, দাঁত, হাড়গোড়। হয়তো আস্ত কঙ্কাল। আমি ঐ গুহায় ঢুকলেই কেউ হয়তো মুখে পাথর চাপা দেবে। কারা যেনো সেই চেস্টা করছে। বড় একটা পাথর নিয়ে কাছে ধারে ওঁত পেতে আছে। শুধু সুযোগের অপেক্ষা। না, আমি কিছুতেই যাবো না। না—। ক্যাঁচ করে পাশে একটা গাড়ি থামে। ড্রাইভার খিস্তি ছাড়ে। অল্পের জন্যে বেঁচে গেছি। গাড়িটা হজম করে ফুটপাথে উঠে আসি। নিজেকে মিতুলের ভঙ্গিতে শাসাই, তুমি এতো মবিভ হয়ে যাচ্ছো কেন জামী? তোমার কাছ থেকে এমনটি আশা করিনি। ঘরে যাও। রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা ভাল না। প্লীজ জামী, ঘরে ফিরে বিশ্রাম নাও। মাথা ঠাণ্ডা করো। নইলে তোমার সঙ্গে আমার কথা বন্ধ।

রিকশা নিয়ে বাসায় ফিরি।

পরদিন কাগজে আমার বইটার লম্বা এক সমালোচনা বের হয়। তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছে। শেষের লাইনে এসে চমকে উঠি। বইটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করার দাবী জানিয়েছে। আমার মনে হলো, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ পরিকল্পিত। গত সপ্তাহে শরাফীর আলোচনা বেরিয়েছিলো। শরাফী বইটাকে বাংলা ভাষার এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলে দাবী করেছিলো। বলেছিলো, ব্যতিক্রমী রচনা। এর আগে এমন হয়নি। এ সমালোচনায় তার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করে শরাফীর বক্তব্য নাকচ করে দেয়া হয়েছে। আমি কিছুই ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারি না। বিকেলে

শরাফী আসে।

সমালোচনাটা দেখেছিস জামেরী?

হ্যাঁ। সবটাই পরিকল্পিত। ষড়যন্ত্রমূলক। আমাকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা।

আমারও সেই মত। নইলে বন্ধু-বান্ধব, পরিচিত মহল সবাই তোর বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছে। যে যে পয়েন্টে আলোচনা করেছে, তার সবটাই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

ওটাই তো দুঃখ। নইলে সব বই সবার কাছে সমান ভাল লাগবে, এটা আমরা কেউই আশা করি না। ভাল না লাগা থেকে সমালোচনা হলে আমার খারাপ লাগতো না। কিন্তু এখানে ওরা জোর করে প্রমাণ করবে যে, আমি জল ঘোলা করেছি।

ঠিকই।

যাকগে। বোস, চা বানাই। এসব ব্যাপার উপেক্ষা করাই ভাল। গায়ে মাখলেই বেশি জড়াতে হবে।

আমি কাঁচা মরিচ, পেঁয়াজ দিয়ে মুড়ি ভাজি। চা বানাই। শরাফী খুঁটিয়ে সমালোচনাটা আবার পড়ে। আগুনের ধারে বসে থেকে হঠাৎ করে সবকিছু আমার অর্থহীন মনে হয়। এই লেখালেখি, বাদ প্রতিবাদ, বাঁচার জন্যে প্রতি পদক্ষেপে কাঁকর বাছাই। কাঁকর বাছাটা যেনো এখন আমার বড় কাজ হয়ে উঠেছে। নইলে দাঁতের তলে পড়ে সমস্ত মুখ বিস্বাদ করে দেয়। খাবার স্বাদ নষ্ট করে দেয়। চিড়চিড়িয়ে ওঠে মেজাজ। এই মুহূর্তে আমার এই গুহাটা বড় আরামদায়ক মনে হয়। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এ গুহায় কাটিয়ে দেয়াই ভাল। মগ্ন চৈতন্যে সমস্ত প্রাণ শিসের মতো বাজাতে পারি। কি দরকার আলো, বাতাস, বাইরে। সেই অতলে ডুবে যাই, যেখানে কুঁকড়ি মেরে পড়ে থাকাটাই সত্য।

এই, কি ভাবছিস? তোর চায়ের পানি ফুটছে? তাড়াতাড়ি পানি নামিয়ে পাতা দিয়ে ঢেকে রাখি। শরাফীর দিকে এক বাটি মুড়ি এগিয়ে দেই।

কি ভাবছিলি রে?

ভাবছিলাম নিজের কাছ থেকে পালিয়ে যাওয়ার কথা।

পারবি ?

চেষ্টা করলেই কি আর পালানো যায় ? ঝড় এলে বুক কাঁপে ঠিকই, কিন্তু মোকাবিলার সময় সাহস বেড়ে যায়।

তোর সাহসটা আবার একটু বেশি বেয়াড়া। আমি ভাবছি, কয়েকদিনের জন্যে তুই অন্য কোথাও থেকে ঘুরে আয়।

অর্থাৎ গা ঢাকা দিতে বলছিস ?

অনেকটা তাই।

তাহলে তুই আমাকে চিনতে ভুল করেছিস ?

ভুল করিনি। বেশি চিনি বলেই বলছি।

না, শরাফীর উপদেশে আমার রাগ হয় না। আমাকে নিয়ে ওর এই ভাবনাটা এই মুহূর্তে বড় আরামদায়ক। যখন পাশে কেউ থাকে না, নিঃসঙ্গতা ডুক্‌রে কাঁদায়, তখন ঠিক এ ধরনের উষ্ণ সান্নিধ্য টনিকের মতো কাজ করে। এতোক্ষণ যেসব আবোল তাবোল চিন্তার তুষারপাতে ক্রমাগত তলিয়ে যাচ্ছিলাম, শরাফীর প্রিয়জনের ভূমিকায় আবার মাথা জাগিয়ে উঠি। ওকে আমার ভীষণ ভাল লাগে।

চা খেয়ে যাবার সময় শরাফী আবার অনুরোধ করে, চল, আমার বাসায় কয়েকটা দিন থাকবি। ইদানীং মেয়েটা তোর কথা খুব বলে।

আমি মাথা নাড়ি।

এক সময় গিয়ে ঘুরে আসবো।

এই ঘরটায় তোর যে কিসের আকর্ষণ বুঝি না। একদম ছাড়তে চাস না। একটা হারাই হারাই ভাব।

আকর্ষণ আর কৈ, মাথা গোঁজার জন্যে থাকা।

মানুষ এভাবে এমন করে মাথা গোঁজে না। নিশ্চয় আরো বেশি কিছু আছে।

হয়েছে, আর গবেষণা করতে হবে না।

আচ্ছা বাপু, চলি।

সারারাত ঘর অন্ধকার করে বসে থাকি আমি। দু'প্যাকেট সিগারেট ধোঁয়ার মতো নিঃশেষ হয়ে যায়। স্যুটকেস হাতড়ে আরো এক প্যাকেট পেয়ে যাই। মাঝে মাঝে একগাদা সিগারেট কিনে রাখা অভ্যেস। নইলে কখন হয়তো মাঝরাতে দেখবো নেই। তখন মাথার চুল ছিঁড়তে হবে।

বিকেলে প্রকাশক আসে। মুখ শুকনো। আমার প্রতি একটা বিশেষ শ্রদ্ধাবোধ আছে বলে মেজাজ খারাপ করে না। বয়স্ক ভদ্রলোক। বোঝে অনেক। আমি অপরাধীর মতো মুখ নীচু করে থাকি। আমার কিছু করার নেই।

চা খাওয়ার পর বিনীত মুখে বললেন, কি করবো এখন? ব্যাপার তো সুবিধে মনে হচ্ছে না।

কিছু বই সরিয়ে রাখুন।

হ্যাঁ, সেটা আমি আগেই করেছি। বুঝতে পারছি ছাড়বে না।

আমারও তাই মনে হয়।

ভদ্রলোক আর কথা খুঁজে পান না। কিছুক্ষণ আনমনে সিগারেট টানেন। দু-একটা এলোমেলো কথা বলে উঠে চলে যান। উনি চলে যেতেই মনটা দমে গেলো। এমনিতে কেউ বই বের করতে চায় না। খরচ কুলিয়ে উঠতে পারেনা। বিক্রি কম। তার ওপর এরকম হাঙ্গামা পোয়াতে হলে এ শিল্প বন্ধ হয়ে যাবারই যোগাড় হবে। কে আর স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে?

গালে হাত দিয়ে বসে থাকি। অকস্মাৎ মনে হয় সব কাজ ফুরিয়ে গেছে। কোনকিছুই করার নেই। কোনকালে কোন কিছু করার ছিলো না এমনি করেই কতোকাল ধরে যেনো বসে আছি। কেউ আমাকে হাঁটতে দেখেনি, ঘুমোতে দেখেনি, খেতে দেখেনি, লিখতে দেখেনি। মাথাটা কেমন করে। মনে হয় বাইরে অসংখ্য ঘোড়া দৌড়চ্ছে। ঘোড়ার মিছিল আমার দিকেই দৌড়ে আসছে।

আবার দরজায় শব্দ। আদালতের পিয়ন এসেছে।

আমেরী আহমদ কে?

আমি।

এটা নিন। এখানে সই করুন।

সই করে কাগজটা নিয়েও অনেকক্ষণ পড়তে পারি না। সব কেমন ঝাপসা ঠেকে। মাথায় ঝিমঝিমানি। ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগলো অনেক। আজী আহমদ সাহেবের কেস। আমিও একজন আসামী। ইচ্ছে হলো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলি। পরক্ষণে মাথা ঠাণ্ডা রেখে সযত্নে তুলে রাখলাম কাগজটা। একটা কাজ বাড়লো। উকিল, আদালত, কাঠগড়া, সাক্ষী সাবুদ, বাদী, বিবাদী ইত্যাদি আরো অনেক শব্দের সঙ্গে

প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হবে এবার। আহা শব্দের সঙ্গে আমার কি ভালবাসা। আমি তো শব্দের প্রেমিক। একটি নতুন শব্দের জন্যে আমার বুকে আজন্মের পিপাসা। চারদিকে আমি কেবল শব্দই চাই। বিপুল বিপুল শব্দ। শব্দের জন্যে আমার হাসি, আমার কান্না, আমার প্রেম, আমর চরিত্র হনন। শব্দ আমার আদি পিতা। আমি শব্দের স্রষ্টা। বিধাতার মতো। এখন শব্দ আমার বৌ। শরীরে কাতুকুতু দেয়। তার সঙ্গে আমার প্রতিরাতের বাসর। মন থেকে সব গ্লানি মুছে গেলো। উঠে চা বানিয়ে খেলাম।

কয়েকদিন একটানা বইটা নিয়ে কাগজে হৈ চৈ হলো। বাদ-প্রতিবাদের তুমুল ঝড়। আমি নির্বিকার দর্শক। একদিন খুব ভোরে প্রকাশক এসে বিমর্ষ মুখে দাঁড়ালো।

গতরাতে পুলিশ সব বই সিজ করে নিয়ে গেছে।

আমি কি করবো। তাকে সিগারেট দিলাম। চা খাওয়ালাম। শান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার নেই। ওটা বড় বাজে লাগে। আমার কথায় তার বিন্দুমাত্র কিছু যায় আসবে না। কেন না অর্থনৈতিক ক্ষতিটা তার। আমি সে দায়ভাগ নিতে পারি না। তবুও যাবার আগে মুখে হাসি টানলেন। কিছু না এমন ভাব করলেন। অমায়িক স্বরে উপদেশ দিলেন।

আপনি একটু সাবধানে থাকবেন।

মানে পালিয়ে যাবো?

কয়দিনের জন্যে।

আমি হাসলাম। সাবধানে থাকার আগ্রহ আমার নেই। যা আমি লিখেছি তার মোকাবিলা আমি নিজেই করবো। তাকে ছেড়ে পালাবো না। পালিয়ে যাওয়ার অর্থ নিজেকে প্রতারিত করা। আমার বক্তব্যের প্রতিষ্ঠা যদি না হয়, তাহলে আমি লিখলাম কেন? কার ভরসা করে শব্দগুলো আমার প্রেমে পড়েছিলো? তাদের একলা ফেলে এখন আমার পালিয়ে যাওয়ার কোন মানেই হয় না।

কেবল খেয়ে উঠেছি। সিগারেটটা তখনো জ্বালাইনি। হাতে নিয়ে দিয়াশলাইর সঙ্গে ঠোকাঠুকি করছিলাম। বাইরে ভর দুপুর। তখন ওরা এলো। খাকী পোশাক পরা চারজন। বললো, যেতে হবে।

বললাম, চলুন।

সিগারেটটা আর জ্বালানো হলো না। পকেটে পুরে নিলাম। বুকে ফুরফুরে বাতাসের জোয়ার। নিজেকে ভয়ানক হালকা মনে হচ্ছে। মাথার ওপর, কাঁধে, হাতে কোথাও কোন দায়ভারের বোঝা নেই। সব নামানো হয়ে গেছে। এখন আমি অনায়াসে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে পারি। একজন ভাল মানুষের মতো প্রশ্ন করলো, কি বই লিখেছেন স্যার যে ওরা একদম কুকুরের মতো ক্ষেপে উঠেছে?

আমি চমকে ওর মুখের দিকে তাকালাম। নিজের কানকে অবিশ্বাস করলাম। ভুলেই গেলাম যে, আমি মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি। হাসি ছাড়া তাকে আর কোন জবাব দিতে পারলাম না। দরজায় তালা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হলো, পাঠক আমাকে ক্ষমা করবেন। বড় অসময়ে আমাকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। কেননা এখনো আমার যোগ্যতা অর্জন হয়নি। সামান্য সৃষ্টি নিয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়াতে অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে।

সাত

এখন একটা ভীষণ অন্ধকার ডেনে আমরা অবস্থান। জায়গাটাকে ডেন বলা ঠিক হবে না জানি। তবু ডেন ছাড়া অন্যকিছু বলতে আমার ভাল লাগছে না। অন্ধকার ভেতরের এবং বাইরের। মিশমিশে কালো আকার-হীন বস্তুটা আমার স্মৃতির মাথায় নীলবাতি। প্রবল ঢেউয়ের আকারে লালদিয়ার চর আছড়ে পড়ছে। যেনো পটুয়াখালীর দক্ষিণের শেষ সীমানা। যৌবনের শুরুতে একবার সে চরে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখেছিলাম। মনে হয়েছিলো, উপলব্ধ চেতনায় ঘোলাজল বড় একপেশে বুনোমি। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দগ্‌দগিয়ে তোলে। থক্ থক্ করে থেঁতলে যাওয়া রক্তমাংস। দৃষ্টির প্রশান্তির আশায় ভিন্ন প্রেক্ষিত খুঁজতে গিয়ে পেয়েছিলাম আদিম ছবি। রমণরত কাঁকড়ার বিচিত্র উল্লাস। লাফিয়ে উঠেছিলাম। আঃ হিসেবের বাইরে জীবনের কতো বিচিত্র ছনছনানি। অন্ধকারের প্রেক্ষাপটে রক্তাভ উন্মোচন। আমি দিশেহারা হয়েছিলাম। একটানা চার ঘন্টা দেখেছিলাম সে চিত্র। মনে হয়েছিলো, এই মুহূর্তে নতুন চিত্রকল্পে কবিতার

শরীর গড়তে পারি। যে-কোন সৃষ্টি সম্ভব। জানতাম, রমণকালে স্ত্রী কাঁকড়ার শরীর থাকে নরম। তখন ত্বকের নির্মোচন ঘটে। কিন্তু এতো তুলতুলে ভাবিনি। সক্রিয় অবস্থায় পুরুষ কাঁকড়া সাঁড়াশি পা দিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী তাড়ায়। যুদ্ধে হেরে গেলে সাথীকে পায়ে বেঁধে সমুদ্রে পালিয়ে যায়। এমন বন্ধনে দুই তিন দিন পার করে দেয়। কখনো প্রায়ই স্ত্রী কাঁকড়ার অধিকার নিয়ে একাধিক পুরুষ কাঁকড়ার যুদ্ধ বেধে যায়। সকলেই তাকে ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে চায়। কখনো টানাটানিতে স্ত্রী-কাঁকড়ার তুলতুলে শরীর টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ঘুরেফিরে এইসব দৃশ্যে জীবনের যৌগফল আমাকে উত্তেজিত করেছিলো। আমি সে মত্ততায় রাতদিনের হিসেব ভুলতে বসেছিলাম। এখন এই ডেনে বসে আমি প্রতিদিন জোয়ারের জলে লালদিয়া যাই। মাথা থেকে অন্ধকার মুছে যায়। ঘোলাজল ভাটিতে নামতে থাকে। আমি অনায়াসে সব ব্যর্থতা বালুচরে পুঁতে রাখি। ছলছল শব্দ অজস্র কিলবিলে কাঁকড়ার অব্যক্ত ধ্বনি। আমি যেনো রমণরত কাঁকড়ার বিচিত্র উল্লাস।

নিজের সপক্ষে বক্তব্য রাখার জন্যে আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমি কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলেছি। আমি কোন নির্দেশের তোয়াক্কা করিনা। ওরা যা খুশী করতে পারে। কেননা ওরা ক্ষমতায়। তবে আমিও আমার পয়েন্ট থেকে নড়বোনা। জোর করে কোনকিছু ওরা আমাকে দিয়ে করাতে পারবে না। 'মগ্ন চৈতন্যে শিস' আমার কথা, মিতুলের কথা, রায়হানের কথা। যেমন করে বলতে চেয়েছিলাম, তেমন করে বলা হয়নি। সমাজ, পরিবেশ, ব্যক্তির সমন্বয়ে যে শব্দাশ্রিত শিল্প তার প্রকরণগত শুদ্ধতা আমার কাম্য। যারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে, তারা সবটা দেখেনি। প্রকরণের বাইরে বক্তব্যের খোলস নিয়ে টানাটানি করেছে। তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে ঠিকই। তাতে আমার দুঃখ নেই। আমি কখনো শিল্পের পিঁড়ি থেকে সরে বসবার চেষ্টা করিনি যতো কষ্টই হোক না কেন। লক্ষ্য একটাই। ব্যক্তিকে তার পারিপার্শ্বিকে স্থাপন করার পদ্ধতি অর্জন করা। সে পদ্ধতি যে কোন লেখকের বিন্যাসগত কৌশল। আমি সব সময় এটাকে ধ্রুব বলে মানি।

আসলে বক্তব্য একই, সময়বিধৃত মানুষ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমি কেমন করে বলছি। এই বলাটা ঘোলাজলে ডুব সাঁতারে কাদা নিয়ে

ওষ্ঠ। দম রাখতে পারাটাই সিদ্ধির দীর্ঘায়ণ। সাহিত্য হলো বক্তব্যের পরিসরে রীতির পায়ে পা জড়িয়ে সমুদ্রে পালিয়ে যাওয়া। এ বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিবিশেষের নিজস্ব। কেউ তাতে তুলতুলে শরীর জড়ায়। কেউ হুকের আবরণে ঘাম মেখে থাকে। তবে পা জড়িয়ে দিন কাটানোটাই শেষ কথা। এখন আমি সাঁড়াশী পায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী তাড়ানোয় ব্যস্ত। নইলে ওরা শরীর ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। জীবনের যে কোন মূল্যের বিনিময়ে আমি শিল্পের পায়ে মাথা ঠুকি। শিল্প, তোর সৌন্দর্যে আমার অন্তরাত্মা [illegible]। তোর শরীর আমার ললাটে করাঘাত। তোর সাধনা আমার ব্যস্ত জীবনের আত্মকেন্দ্রিক প্রকাশ। আমার কর্তব্যে তোর সৌন্দর্যে একরকম ধুলো। তাকে মুছে ফেলিস। কিন্তু তোর অসম্মান আমি করি না। বক্তব্যের খাঁচাতে তোকে ঠুকে মারার সাধ আমার নেই। দুজনের সমান্তরাল অবস্থান আমার কাম্য। শিল্প, তুই আমার মিত্র। তোর সঙ্গে এখন আমার প্রতিদিনের পায়ে হুকুম। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে কোন জিনিসই বিকৃত করা যায়। কিন্তু তার ধার নষ্ট করার জন্যে আরো ধারালো বস্তু চাই। সে অস্ত্র ওদের হাতে নেই। ওদের অক্ষম আস্ফালন কি আমার অভিজ্ঞতার শেকড়। সে গ্লানি। ওদের পাতকের কোটায় জমা হবে মাত্র। আমাকে স্পর্শ করবে না। আমি শেকড় চারিয়ে যাবো গভীর থেকে গভীরে। কামড়ে ধরে নেবো পর্যবেক্ষণের অণু-পরমাণু। আমাকে হেয় করে পরোক্ষভাবে ওরা আমার মূল্য বাড়িয়েছে অনেক। শিল্পের জন্যে যে-কোনো মুহূর্তে আমি হুকের নির্বাসন ঘটাতে রাজী। তার জন্যে কোন বিশেষ সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে না।

ওরা এখানে আমাকে কোন কিছু পড়তে দেয় না। বই চেয়ে হার মেনেছি। শুধু দৈনিক কাগজটা আসে। সারাদিন ওটাতে চোখ বুলিয়ে সময় কাটাই। তারপর ফিরে যাই আবর্জনার ঘরে। ঘোলাজল, কাঁকড়া, মাকড়শা, কানামাছি, শাদা বক কতো কি সব দেয়। আসলে নস্টালজিয়া একটা চমৎকার পথ্য। নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলোর পরিপাটি ভরে দেয়। জমাট করে তোলে। সে মুহূর্তও যখন ফুরোয় তখন মনে মনে লেখা সাজাই। ছবি বানাই। ভাবি। আবার পড়ি। সব সাধনাই বড় নিষ্ঠুর। সারাক্ষণ অদৃশ্য এক শীতল ছুরির মুখোমুখি সংগ্রাম করতে হয়। মেরে মেরে পায়ের নীচের মাটি যে কখন সরে যায়, টেরই পাওয়া যায় না। প্রকাশের

উপন্যাসে চরিত্রের যে বিস্তার তাই দিয়েই তো লেখকেদের জগৎটা ভরে রাখি। নইলে বার্ধক্য জীবনকালেই মৃত্যুর অন্ধকার। জানালার দিকে মাথা রেখে ঘাড় কাত করে আকাশ দেখতে দেখতে আমি সেইসব রুক্ষ শব্দ নিয়ে মেতে উঠি, যাদের নতুন প্রাণে টাট্কা করে তোলা যায়। কারো কারো শৈশব ঘুচিয়ে সতেজ কৈশোরের দ্বারে টেনে আনি। কাউকে টগবগে ঘোড়ার উত্তেজনায় জওয়ানকী দেই। কারো পোশাক খুলে ন্যাংটো করে রাস্তায় বের করে দেই। কতো ওলোট—পালোট, উথাল-পাথাল ঢেউয়ের মাথায় ভাসা। শব্দের খেলাটা আমার ভারি ভাল লাগে। নির্জনতা কাবু করতে পারে না॥

একদিন সকালবেলা কাগজ হাতে নেবার পর কালো কালো অক্ষরগুলো আমার চোখে কাফ্রীর নাচিয়ে শরীর হয়ে গেলো। আমি যেনো নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। রায়হান বেকসুর খালাস। সাইকি বলেছে, রায়হানকে ও চিনতে ভুল করেছিলো। রায়হান সেই খুনী ব্যক্তি নয়। তাতেই বিচারের মোড় ঘুরে গেছে। তাছাড়া রায়হানের বিরুদ্ধে তেমন কোন জোরালো যুক্তিও ছিলো না। সাইকির মোমবাতির মতো শাদা মুখটা আমার বুকের কাছে অনুভব করলাম। পরক্ষণে মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেলো। রায়হান ফিরে গিয়ে দেখবে আমার দরজায় তালা ঝুলছে। আমি আর ওর জন্যে বসে নেই।

কিন্তু তাতে কি! আমার খুশী নৈর্ব্যক্তিক। আমি দেখতে পাচ্ছি দশ বছরের রক্তাক্ত যুদ্ধের পর হেলেন আবার ম্যানিলাসের কাছে ফিরে যাবে। খট্ করে কে যেনো দরজা বন্ধ করলো। যাবে তো? সাইকি কি সব ভুলতে পারবে? না কি রায়হানকে দয়া দেখিয়ে আরো গভীর যন্ত্রণায় ওকে ধাক্কা দিলো? কি আছে ওর মনে? আমি তো কখনো সাইকিকে বুঝতে পারিনি। তবুও এই মুহূর্তে মিলনটাই আমার ভাল লাগছে। আমি ঐ একটি শব্দের ওপর পুরো ছবিটা সাজিয়ে ফেলি। শুধু মাত্র ভালবাসার জন্যে নিজেকে অনেক বদলেছে রায়হান। অনেক ভেঙেছে। এবার ওর জীবনে স্থিতি আসুক। সাইকি ওর হোক। এর বিপরীত কোন চিন্তা আমার মনেই এলো না।

উপন্যাসে আমি রায়হানকে মেরে ফেলেছিলাম। ভুল। সাইকি আমার চাইতে অনেক বেশি জীবনবাদী। শেষ মুহূর্তে জীবনকে পরিবর্তন